বর্ণানুক্রমিক সূচী

(অষ্টাদশ বর্ষে প্রকাশিত লেখাগুলির)

আদর্শ শিক্ষা	ভট্টাচার্যকল্যাণী মল্লিক	১৬৫
আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশে	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	৭৭, ৮৭,
আলোচনা		১, ১৭, ৩৩, ৪৯, ৬৫, ৮১, ৯৭, ১১৩, ১২৯, ১৪৫, ১৬১
ইতিহাসে কি বিজ্ঞান, না কলা-বিদ্যা ?	ইতিহাস রসিক	৫৬
উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকা	বিভূলাল চট্টোপাধ্যায়	৩৫
এক শিক্ষক পরিবার	গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৫১
"ওঁর চরণ-ধূলি আমার মাথায়"	বিভূলাল চট্টোপাধ্যায়	৮৩
কলা-শিক্ষা কেন ?	দেবীপ্রসাদ (ওয়ার্দা)	২৭, ৪৩, ৫০
কলা-শিক্ষা : শিশুর দৃষ্টিতে	ঐ	৭২
ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা	বীরেন্দু সাঁতরা	১১৫
ছেলেবেলার কথা	সেনান	১২৭
জলছবি	মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য	১০৭
ডিসিপ্লিন		১৪
নয়ী তালিমের নূতন সৃষ্টি এলী		৪
নয়ী তালিম কোন পথে	অধ্যাপক সত্যমূর্তি	
পরিদর্শনে বিভ্রাট	শ্রীআদিনাথ সেন	৬২
পরীক্ষা সংস্কার	শ্রীঅনাথনাথ বসু	২, ২১
পরীক্ষার পরীক্ষা	শ্রীনীরেন্দু সাঁতরা	
পুস্তক সমালোচনা	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৬৪
পুস্তক পরিচয়		৪৭, ১৬০, ১৭৪
পাঠ্যক্রমনির্ণয় সমস্যা	শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার বিশ্বাস	১১
প্রাথমিক শিক্ষক	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৮৪
প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা	ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৯৯
ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৯১, ১০৫, ১২০, ১৩৫
মহাভারতে স্ত্রী শিক্ষা	শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য	১১৭
মহাভারতের চিত্রিত তিনটি বিদ্যাপীঠ	শ্রীসুধাময় ভট্টাচার্য	১৯
মেয়েদের শিক্ষা	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	১৪৮
যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা	শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৬২
বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা	যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি	১৪৭
শিক্ষার আদর্শ	কুমুদবন্ধু সেন	৭

শিক্ষক ও গুরু	রবীন্দ্রনাথ	৪১
ঐ	প্রমথ চৌধুরী	১৭৬
শিক্ষা ও শাসন	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৫৪
শিক্ষা-বিভাগের ও শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা	মমতা রায়	৬৭
শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি	ঐ	২৩
শিক্ষা ও যুবসেবা	লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১২৪
শিক্ষা সংস্কারে গান্ধীজী	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	
শিশু ও জীবনের আত্ম-বিকাশ	নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৮
শ্রীঅরবিন্দ ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা	শ্রীবকুলমালা সেন	১৩১
শ্রীঅরবিন্দ ও মানসিক শিক্ষা	শ্রীবকুলমালা সেন	৩৮
সহজ ও সরল	ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিদ্যালয়	জ্ঞানাম্বেষী	১৪১, ১৫৪, ১৬৯

I = 586

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

পুনর্দর্শনায়

গত সংখ্যায় আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম যে পুনরায় পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব কি না। বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছেন, শিক্ষাবিষয়ে যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা হইলে এখনই তো বলা উচিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রস্তুতি চলিতেছে, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাজ হাতে লওয়া হইবে, কত কোটি টাকা কোন বিষয়ে বরাদ্দ হইবে ইত্যাদি। আমাদের এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই—কৃষি শিল্প বাণিজ্য নানা বিষয়ে কাজ করিবে ও কৃতিত্ব দেখাইবে যে মানুষ, সেই মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির শিক্ষা ও দায়ভাগের কথাও ভাবিতে হইবে। সেই জন্যই কি 'শিক্ষা'র পুনর্দর্শন চাই? কিন্তু 'শিক্ষা'র সাফল্য নির্ভর করিবে তাহার পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকার উপর। যাঁহারা শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদের প্রবন্ধও চাই—নতুবা চিন্তার আদান-প্রদান কি করিয়া হইবে।

ভারতবাসীর জীবনে দুঃখদুর্দশার অবসান

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ভাষণ দিতে গিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলিয়াছেন, আমাদের দুঃখ-দুর্দশার মূলে রহিয়াছে অধিকাংশ দেশবাসীর অশিক্ষা বা শিক্ষার অভাব। অতীতে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা জগতে সত্যতার ভাণ্ডারে যাহা কিছু দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা ভাল ছাত্র তাঁরা জগতের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রদের সমতুল হইলেও সাধারণ ছাত্রদের সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করা যায় না। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল —নিরক্ষরতা দূর করা। দেশের সকলের লিখিতে পড়িতে পারা চাই—তাহা হইলে জাতীয় জীবনে দুঃখ দুর্দশার অবসান হইবে।

অবশ্য নিরক্ষরতা দূর করা প্রাথমিক সোপান মাত্র। এবং এই প্রাথমিক সোপানে উঠিবার কথাই অধ্যাপক কবির বলিয়াছেন। নিরক্ষরতা দূর করার অর্থ আজ-

কাল দাঁড়াইয়াছে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার। ইহার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এমন কি একথা বলিলেও চলে যে ইহার সুযোগ অফুরন্ত। সেই কথা মনে করিয়া আমাদের অগ্রগতি বাড়াইতে হইবে।

খেলাধুলোর স্থান

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষায় খেলাধুলার স্থানের উপর গুরুত্ব স্থাপন করা হইবে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু কয়টি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ বা জায়গা আছে? কলিকাতার কথা না হয় নাই বলিলাম, সেখানে মুক্তাকাশের নীচে স্থান পাওয়া বড় কঠিন। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে গ্রামে মাঠ ও ধানক্ষেত থাকিলেও খেলার মাঠ কই? খেলার বন্দোবস্ত কই? খেলার জন্য পরিমিত অর্থের মঞ্জুরী কই? "যে সকল স্থানে খেলার মাঠ নাই সেখানে মাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে"—এরূপ কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া অদ্ভুত লাগে। কলিকাতার সহরের মধ্যে স্থানাভাব। ছেলেরা ফুটপাথে খেলার মাঠ করিয়া লইয়াছে। ক্রিকেট খেলার কয়েকখানা ইট তাহাদের উইকেট, তাহা কাঠ তাহাদের ব্যাট। বালকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দই তাহাদের মূলধন। সহরে ছোট ছোট পার্কের ব্যবস্থা যে নাই, তাহা নয়, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেদিকে আছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কত সামান্য।

প্রচলিত শিক্ষায় ব্যর্থতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যর্থতার কথা বলিতে গিয়া উপাচার্য শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, ভাল শিক্ষকের একান্ত অভাব, কারণ ভাল ছাত্রেরা সরকারি চাকুরি বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অনেক উচ্চ বেতনে কাজ পাইয়া যান। এদিকে বিপদ এই যে, যতক্ষণ ভাল শিক্ষক না পাওয়া যায় ততক্ষণ শিক্ষা সংস্কার কাজে পরিণত করা যাইবে না। তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স উপযুক্ত শিক্ষক বিনা কে পড়াইবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, শারীরিক শিক্ষা না হইলে বৌদ্ধিক শিক্ষাও অসম্পূর্ণ, সুতরাং ছেলেদের জন্য খেলার জায়গা অবশ্যই চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যাহা আবশ্যক, গ্রামের বিদ্যালয়ের পক্ষেও তাহা আবশ্যক, পরিমাণে অবশ্য বিভেদ, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও খেলার জায়গার সংস্থান না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। উপরের দিকের পরিকল্পনা নিশ্চয় তাহার নীচের সার্থকতার উপর নির্ভর করিবে।

পরীক্ষা সংস্কার

অধ্যাপক অনাথনাথ বসু

এককালে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষার কোন বালাই ছিল না, আর আজকাল পরীক্ষার ভূত এমন করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে যে আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই ব্যর্থপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আজকাল তো পরীক্ষায় পাশ করাটাকেই আমরা সকলে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। মত প্রচলিত হইয়াছে এই 'একমাত্র' বলিয়া মনে করাতেই। পরীক্ষায় ফেল করাটা কোনো দিনই পরীক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না; পাশ তো নিশ্চয় করিতেই হইবে, কিন্তু শুধু পাশ করিলেই চলিবে না, আরও অনেক কিছু করিতে হইবে। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী এবং অনেক দিকে বিস্তৃত। তর্কের মুখে একথা আমরা শিক্ষক ও অভিভাবকেরা সকলেই স্বীকার করি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা এমন ব্যবস্থা করি যে পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া আর কোন লক্ষ্যই শিক্ষার্থীর চোখে পড়ে না। সুতরাং সে দুর্ভাগ্য যদি ভুল করিয়া মনে করে

যে যেন তেন প্রকারেণ পরীক্ষাসূত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে সে বেচারীকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এই যে কথাগুলি বলিলাম এগুলি ইদানীং অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনাও চলিতেছে। বর্তমানে যে ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে ব্যবস্থার খুব বড় রকমের পরিবর্তন না করিলে আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইবে এ সম্বন্ধে আমরা অনেকেই এখন একমত। তবে সংস্কার কোন্ পথে হইবে এখন তাহাই লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এজন্য দেশের নানাস্থানে সভাসমিতি, কমিশন ও কমিটি, সেমিনার ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে; এবিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বিদেশ হইতে পরীক্ষাভিজ্ঞ শিক্ষাবিৎকে আনান হইয়াছে; কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষাসংস্কারের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খুলিয়াছেন, প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগগুলি অনুরূপ চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে নানারকম চেষ্টা শুরু হইয়া গিয়াছে একথা আজ স্বীকার করিতে হইবে। তবে এরূপ চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে এখনও সময় লাগিবে এবং তাহার আগে সংস্কারের ধারাগুলি আলাপ আলোচনা ও প্রয়োগসিদ্ধ পরীক্ষার দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষা ব্যাপারে যাহারা সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সকলকেই এক জোটে লাগিতে হইবে এবং সেরূপ না করিলে কোন ফলই পাওয়া যাইবে না।

পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে শিক্ষার গোড়াকার কয়েকটা কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেমন ধরা যাক শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্র। শিক্ষার ক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত, কিন্তু পরীক্ষার, বিশেষ করিয়া বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ। প্রকৃত শিক্ষার ফলে শুধু যে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে তাহা নহে সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রয়োগ করিবার অর্থাৎ আচারের তারতম্যও ঘটে, ও ঘটা উচিত। আচার সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনের গড়ন বা প্রতিষ্ঠাসেরও রূপান্তর ঘটে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুত শিক্ষার ফলে ছাত্রের সমগ্র চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হইবে। ধরা যাক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়ান হইল। তাহার ফলে শুধু যে ছাত্র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিল তাহা নহে, তাহার আচারেরও পরিবর্তন ঘটন অবশ্যম্ভাবী হইল; যেমন, এখন আর সে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোন আচার করিবে না, করিতে বিধাবোধ করিবে ও মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। কিন্তু ছাত্রমনের পরিবর্তনের এইখানেই শেষ নহে; স্বাস্থ্যবিদ্যা পাঠের ফলে পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাহার মনোভাবের রূপান্তর ঘটে—সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে খানিকটা ভালবাসিতে শেখে। নোংরামি সম্বন্ধে তাহার মনের গড়নের কিছু পরিবর্তনও ঘটে। এইভাবে শিক্ষার ফলে জ্ঞান (knowledge) কর্ম (skill) ও মনের প্রতিভাস (attitude) এই তিনেরই রূপান্তর সাধিত হয়। সকল শিক্ষাব্যাপারেই যে এই তিনদিকে সমপরিমাণ বিকাশ ঘটিবে এমন নহে, ক্ষেত্রভেদে সেবিষয়ে ইতরবিশেষ হইবে। কিন্তু মোটের উপর সর্বত্রই এই তিন ধরণেরই রূপান্তর হইবে। তাহা না ঘটিলে তাহাকে শিক্ষা বলিব কি? যে ছেলে স্বাস্থ্যবিদ্যা পড়ে অথচ স্বাস্থ্যের নিয়মপালন করে না ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তাহার অনুরাগ থাকে না, তাহাকে কি স্বাস্থ্যবিদ্যায় শিক্ষিত বলিতে পারা যায়?

যদি প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য এইভাবে বহু বিস্তৃত হয় তাহা হইলে যে সকল উপায়ে আমরা এই শিক্ষার ফলাফল যাচাই করি তাহার উদ্দেশ্য ও অনুরূপ ভাবে ব্যাপক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় শুধু জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয়, তাহার সাহায্যে কর্ম অর্থাৎ আচারের এবং মনের রুচিবিকাশের বা প্রতিভাসের ও অন্যান্য বিকাশের বিচার করা যায় না। পরীক্ষার খাতায় তো এগুলি ধরা পড়ে না। অথচ আমরা ধরিয়া লই, পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ

মনোবিকাশের অর্থাৎ তাহার সমগ্র চরিত্রের যাচাই। পরীক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যাহা হয় তাহা হইল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুধু জ্ঞানের যাচাই; তিন ঘণ্টা সময়ে কয়েকটা ঘুরিয়ের প্রশ্নপত্রের সাহায্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা ছাত্রকে ঠিকমত যাচাই করিবার পক্ষে কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

এখানে আমি বাহিরের পরীক্ষার (যাহাকে ইংরেজীতে external examination বলা হয় তাহার) কথাই বলিতেছি। ইহা ছাড়াও বিদ্যালয়ে আন্তর পরীক্ষার (internal examinationএর) ব্যবস্থাও থাকে। বাহ্য পরীক্ষার যে ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, আন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা যদি ভাল হয় তাহা হইলে তাহার সাহায্যে সেই ত্রুটিগুলির খানিকটা নিরাকরণ হইতে পারে। কারণ আন্তর পরীক্ষা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ; তাঁহারা প্রতিনিয়ত ছাত্রগণকে দেখিতেছেন, শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীর বাহিরে তাহাদের সহিত শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং এইজন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিলে ছাত্রগণের সামগ্রিক মনোবিকাশের ছবি পাইতে পারেন ও তাহার সাহায্যে ছাত্রগণের ভালরকমের যাচাই করিতে পারেন।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে আন্তর পরীক্ষার ছাঁচ হুবহু বাহ্য পরীক্ষার ছাঁচের অনুকরণে তৈয়ারি। তাহার প্রধান কারণ যে শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ের উদ্দেশ্যই অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই মূল কারণের জন্যই আমাদের বাহ্য পরীক্ষা ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইয়াছে আন্তর পরীক্ষা ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইতেছে। এই ব্যর্থতা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে এই উভয় প্রকারের পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিতে হইবে এবং সে কাজে পরীক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সকলকেই একজোট হইয়া কাজ করিতে হইবে। কিভাবে তাহা করা যাইতে পারে বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

নয়ী তালিমের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

১। সমাজের গঠন ও সরকারের পরিকল্পনার জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে নয়ী তালিমের প্রেরণা শিক্ষা এখন আর গ্রামে সম্ভব নয়। বর্তমান দূষিত শিক্ষাপদ্ধতি লোকের মনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপে নয়ী তালিমের আকাঙ্ক্ষা অবশ্য সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু উহা দৃঢ় ও আবশ্যকরূপে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে নাই। তাই প্রথম কাজ হইল যে জনসাধারণকে নয়ী তালিমের আবশ্যিকতা অনুভব করানো।

২। এজন্য সুচিন্তিতভাবে আলোচনা করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আলোচনা শিক্ষা বা 'বিচার-শিক্ষণ'-এর অর্থ হইল, গ্রামের সামগ্রিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যার অনুভূতিতে লোকের মধ্যে সামূহিক গ্রাম-চেতনার ভাব জাগানো। আলোচনার বিষয়গুলি এইরূপ হইবে, যেমন—

(১) দরিদ্র ও মালিকের অবস্থার মধ্যে সম্বন্ধ।
(২) 'আচরণ' বা নিঃস্বামিত্ব ও অধিকারীর ভাব।
(৩) পারিবারিক ভিত্তিতে চেষ্টার বিফলতা।
(৪) নির্বাচনমূলক রাজনীতি ও উহার কুফল।
(৫) পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উহার কুফল।
(৬) পুঞ্জকগত অর্থনীতি ও উহার কুফল।
(৭) শাসনযন্ত্র সমাজ।

এই সব আলোচনায় নয়ী তালিমের লক্ষণ, পুষ্টি ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ বুঝাইতে হইবে।

আলোচনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে নগ্নী তালিমের প্রথম ধাপ, ইহা গ্রাম-চেতনা জাগাইতে সাহায্য করিতে পারে, এবিষয়ে মাধ্যমরূপে গৃহীত হইতে পারে।

৩। গ্রাম-চেতনার ভিত্তিতে গ্রামে এমন কয়েকজন লোক বাহির হইবে, যাহাদের মধ্যে সেবার ভাবনা সৃষ্টি হইবে। এই গ্রাম-ভাবনার ভিত্তিতে গ্রামে সেবা সেনার সংগঠন হইতে পারে, যাহা গ্রামে নগ্নী তালিমের কার্যের বাহক হইবে।

৪। সেবা-সেনা হইবে গ্রামশক্তির প্রতীক। তাহার সদস্যেরা নিজের নিজের ঘরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সেবা ও সংগঠনের কাজে শক্তি ও সময় দিবে।

৫। যে গ্রামে অন্তত পাঁচজন সদস্য হইবে, সেখানে সেবা-সেনার বুনিয়াদি একক (unit) গড়িয়া উঠিয়াছে মনে করিতে হইবে। গ্রামের উপর ক্ষেত্র, অঞ্চল, মহকুমা, ও সকলের উপর জেলায় সেবা-সেনা থাকিবে। ইহাদের রচনা নীচের এককগুলির দল-নায়কের দ্বারা হইবে।

৬। (ক) প্রথমটায় সেবা-সেনার সদস্যসংখ্যা হইবে কম। গ্রামের সেবা করিয়া সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে তাহাদের সময় লাগিবে। তাই সর্বপ্রথমে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার অভ্যাসক্রম তৈরি করিতে হইবে। এই অভ্যাসক্রমের পরেই সেবা-সেনাকে সমস্ত গ্রামের সেবা কার্যের ভার লইতে হইবে।

(খ) অভ্যাসক্রমের আরম্ভ এইভাবে হওয়া চাই যে প্রত্যেক সেবা-সৈনিক তাহার বাড়িতে "সর্বোদয়-পাত্র" রাখিবে ও সপ্তাহে অন্তত চার ঘণ্টা শ্রমদান করিবে।

(গ) দ্বিতীয় ধাপ হওয়া উচিত পঞ্চবিধ সহযোগিতার মধ্য দিয়া :—

শ্রম-সহযোগিতা—চাষের কাজে সদস্যগণ পরস্পরের খেতে কাজ করিবে।

শিক্ষা-সহযোগিতা—যে লেখাপড়া জানে সে যে জানে না তাহাকে শিখাইবে।

উদ্যোগ-সহযোগিতা—যে সূতা কাটিতে জানে সে যে কাটিতে জানে না তাহাকে শিখাইবে, এবং নিজ নিজ পরিবারে স্বাবলম্বী খাদি প্রচার করিবে।

বিচার-সহযোগিতা—পরস্পরের বিবাদ-বিসংবাদ নিজেদের মধ্যে মিটাইয়া নিতে হইবে, ইহা যেন গ্রামের পঞ্চায়তী আদালত অথবা সরকারি কাছারিতে আইনের ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

মন্ত্রণা-সহযোগিতা—সাপ্তাহিক বৈঠকে সেবা-সৈনিক নিজেদের ও গ্রামের সমস্যা লইয়া যেন আলোচনা করে।

(ঘ) শ্রম সহযোগিতা হইতে ধীরে ধীরে সমবায়-নীতিতে চাষ ও পরে মালিকানা ত্যাগের ভিত্তিতে স্থায়ী শ্রমিক হইয়া চাষ করিবার অবস্থার উদ্ভব হইবে। ইহা হইবে সবচেয়ে অধিক প্রভাবশালী ধাপ

৭। গ্রামের সুগঠিত সেবা সেনা চারদলে বিভক্ত হইবে - বালকদল, বৃদ্ধদল, যুবকদল, নারীদল। প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নায়ক থাকিবে। গ্রামের সমগ্র সেনার নায়ক হইবে পৃথক। গ্রামের গ্রাম-স্বরাজ সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন সেবা-সেনার সংরক্ষক।

৮। সেবা-সেনার প্রত্যেক দলের কাজের ভাগ থাকিবে। কিছু কিছু কাজ এই ধরণের হইতে পারে—

যুবক দল (১৬—৪৫ বৎসর) : (ক) রক্ষণ—ফসল রক্ষা, গ্রামের পাহারা, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ইত্যাদি আকস্মিক সংকটে সেবা।

(খ) পোষণ—উত্তম কৃষিকার্য, সমবায়ে চাষের পরীক্ষা, সার (কম্পোষ্ট), খাদি ও অন্য শিল্প, সাফাই, খেলা ও অন্য ক্রীড়াকৌতুক, শ্রমদান সাহায্যে আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ, বৃদ্ধাদী কৃষকের শ্রমে সহায়তা। ধর্মগোলা, কো-অপারেটিভ, গ্রামের দোকান ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষাদান প্রাতঃকালের অথবা রাত্রির

গ্রামের বিদ্যালয়, সকালে প্রার্থনা, একঘণ্টার জন্য মহাবিদ্যালয়, রোগী-সেবা, পুস্তকালয়।

নারী-দল—সূত্রদান সংগ্রহ, সর্বোদয়পাত্র, মেয়েদের মধ্যে খাদি শিক্ষা দান, রোগীর সেবা, সাফাই, শ্রমদান, শিশুবিহার, বালমন্দির, মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার দূরীকরণ, সাপ্তাহিক 'গোষ্ঠি' বা সভাসমিতি।

বৃদ্ধ-দল—(৪৫ বৎসরের বেশী) অন্তরের শান্তি বৃদ্ধি, সালিশী, গ্রামের উন্নতি পরিকল্পনা।

বালক-দল—(৫ হইতে ১৫ বৎসর) পয়স্পরের খেতে চাষের প্রধান প্রধান কাজে শ্রম, কিছু কিছু জমিতে শাকসব্জী উৎপাদন, গঠনকার্যে শ্রমদান, উৎসব ও সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা, গ্রামে বিবাহাদি উপলক্ষে খাদ্য পরিবেশন।

৯। সেবা-সেনার কিছু কাজ যদি গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে আর যদি গ্রামে বিশ্বাস ও সমাদর লাভ করা যায়, তাহা হইলে গ্রামের অধিকাংশ ঘরে সর্বোদয়-পাত্র রাখা যাইবে। গ্রামে সকল প্রাপ্ত বয়স্কের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাম-স্বরাজ-সমিতির সংগঠন করা যাইতে পারে। এই সমিতি ছাড়া পাঁচটি উপসমিতি হইবে, তাহা গঠিত হইবে সেবায় আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে। উপসমিতিগুলি এইরূপ : (১) চাষ, সেচ, ভূমি-সংস্কার ; (২) খাদি ও অন্য শিল্প, গ্রামের দোকান ও বাণিজ্য ; (৩) শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন ; (৪) স্বাস্থ্য ও সাফাই ; (৫) ন্যায়, (৬) শেবরক্ষা, (৭) গ্রামের বাহিরের সহিত সম্বন্ধ।

গ্রাম-স্বরাজ-সমিতিতে থাকিবেন ৭ জন সদস্য, ইহাদের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও উপসমিতির সদস্য হইবেন। সম্পাদক ছাড়া প্রত্যেক উপসমিতিতে গ্রাম-সভার মধ্য হইতে আর দুইজন সদস্য থাকিবেন।

১০। গ্রাম-স্বরাজ সমিতি প্রদানত গ্রামের আর্থিক উন্নতি ও ভয় হইতে মুক্তি (social security) লাভের চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা দুই দিকে প্রকাশ পাওয়া উচিত। একে তো ভূমিহীনদের ভূমিহীনতা ও আয়-হীনতা দূর হইবে, তাহার উপর গ্রামের ধনীদের গ্রাম-সমবায়ের পরিধির মধ্যে আসার সম্বন্ধে ভয় দূর হইবে। মালিকদের সামনে ট্রাস্টিশিপের কথাটা রাখা হউক। তাহাদের কমিশন, শিশুদের-শিক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া হউক। লাভ-বণ্টন হইতেই পাঁচ লাভ বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে এভাবে অগ্রসর হউক, যাহাতে মালিক বিভেদের মধ্যে স্থিরীকৃত পারিশ্রমিক লইয়া গ্রামের সেবা সমর্থনে উৎসাহ পায়।

১১। শিক্ষাদান, রক্ষার ব্যবস্থা ও সমবায়ের মিলিত কার্যক্রমের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রাম অনেকটা দূর অগ্রসর হইবে, গ্রাম-চেতনা, ক্রমে গ্রাম-ভাবনা, গ্রাম-শক্তি ও গ্রাম সংগঠনের ক্রমে গ্রাম-তারণীর দিকে। বিকাশের ক্রমে এমন এক অবস্থা আসিবে যখন গ্রামবাসীরা নিজেরা বসিয়া নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রাম-পরিবার স্থাপনা করিবে।

১২। এরূপ না হইলে উৎপীড়িত মানব তাহার নিজের হাতে যে হিংসার পথ আছে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস আছে, তাহাকে 'না' বলিতে পারিবে না। কি করিয়া মানুষের মধ্যে 'না' বলিবার শক্তি জন্মে তাহা নয়ী তালিমের চিন্তন ও অভ্যাসের প্রধান বিষয়। উহাই তাহার বৈপ্লবিক চিন্তার কষ্টিপাথর। 'না' কথাটার মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা বিকৃতিকে অস্বীকার করে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিকে স্বীকারও করে। গ্রামের স্তরে বিকৃতিকে অস্বীকারের মধ্যে গ্রাম-স্বরাজের, এবং সংস্কৃতিকে স্বীকারের মধ্যে গ্রাম-তারণীর মন্ত্র লুকানো আছে।

১৩। এইভাবে নয়ী তালিমের অভ্যাস বাহুবল ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংঘর্ষের স্থানে গ্রাম-পরিবারের স্থাপনারই চেষ্টা।*

---

* ২৭শে জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখের 'ভূদান-যজ্ঞ' শ্রীরামমূর্তির লেখা হইতে অনূদিত।

শিক্ষার আদর্শ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বর্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কি ধর্মক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমাজ জীবনে—এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা বিপ্লব এবং ভাবের আদর্শে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এসে আমাদের বর্তমান যুগকে সমস্যা সঙ্কটের সম্মুখীন করেছে। আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা না করে শুধু শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখি যে সমস্ত ক্ষেত্রই পরস্পরে সংলগ্ন ও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। মার্কস্ বলেছিলেন যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাই অপর ক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবান্বিত করছে, সংস্কার বিস্তার করছে। এই আমাদের ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করে থাকে। আবার আমাদের দেশের মনীষীরা ধর্ম ও নীতিকে মানব জীবনের মূল স্তম্ভ বলে নির্দেশ করে থাকেন। এইসব মতবাদ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নানা বিপ্লবের অন্তরালে বিভিন্ন আদর্শের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা মনাস্তত্ত্বপন্থী, আজকাল তাঁদের স্থান কোথায়? জগৎ পরিবর্তনশীল, যুগে যুগে নানা প্রতিভাবান পুরুষ, মহামনীষী মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়; তাঁরাই এইরূপ সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পথ নির্দেশ করে কতকটা মানবের চিন্তাধারাকে প্রগতিশীল পথে পরিচালিত করেন। পাশ্চাত্য জগতে আমরা দেখতে পাই অতীতকালের শিক্ষার আদর্শ কালপ্রভাবে নূতন নূতন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজ জাতির শিক্ষাবিদ্‌গণ যে সব নূতন নূতন শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং কিভাবে মানুষের ভিতরে, বালক-বালিকার ভিতরে জ্ঞানের বীজ উপ্ত করতে হবে সে বিষয়ে তাঁরা নানা প্রকার চেষ্টা করেছেন, তাও জানতে পারি। মানুষের চিন্তক্ষেত্রে, তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের শিক্ষার প্রসার করতে যত প্রতিষ্ঠান হয়েছিল তা আমরা পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা আলোচনা করলে দেখতে পাই। অবশেষে কিণ্ডারগার্টেন ও মন্টেসরি প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত ও বিস্তৃত হয়েছে। সে প্রভাব বর্তমান যুগেও আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়েছিল ও হচ্ছে।

এইবার ভারতবর্ষের কথা বলি। বৈদিক যুগে কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষ বড় সেখানে দেখতে পাওয়া যেত না। এই শিক্ষা শুধু পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না—নারী জাতিরও সমান অধিকার ছিল।

বৈদিক মুনিদের মধ্যে আমরা স্ত্রী-পুরুষ দুজনকেই দ্রষ্টা ও সূক্তকাররূপে দেখতে পাই। বেদে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখ দেখতে পাই। যাঁরা বেদ, উপনিষদ আলোচনা করেছেন তাঁরা অন্ততঃ পক্ষে সাতাশটি নারী মন্ত্রদ্রষ্টার নাম দেখতে পাবেন। এঁদের শিক্ষা আচার্যগৃহে হত। পৌরাণিক যুগে আমরা রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদিতে দেখতে পাই যে এক একটি তপোবন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন, এবং সেখানে হাজার হাজার বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের জন্য বাস করতেন। কণ্ব মুনির তপোবনে প্রবেশ করে দুষ্মন্ত এই তপোবন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নানা বিষয়ের গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে দেখতে পেয়েছিলেন। এই পৌরাণিক যুগে আমরা দেখতে পাই শিক্ষা আর শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—তা নানাজাতির ছাত্রছাত্রীকে আকর্ষণ করছে। তারপর বৌদ্ধযুগে নালন্দা তক্ষশীলা পৌরাণিক যুগের তপোবনেরই মত বড় বড় শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে শুধু ভারতবর্ষ নয়—ভারতের বহির্ভূত দেশ হতেও শিক্ষালাভের জন্য লোকে আসত। অনেক প্রতিভাবান পুরুষ

এবং প্রতিভাশালী মহীয়সী নারীর নাম আমরা দেখতে পাই। তাঁরা শুধু ধর্মক্ষেত্রে নয়—সাধারণের ভিতরে তৎকালীন প্রচলিত কথা ভাষায় শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষা তখন সংস্কৃতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এই যুগের পরে আমরা দেখতে পাই আচার্য শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতির সময়ে প্রতিভাশালিনী বিদুষী নারীরও নাম উল্লিখিত রয়েছে। এই সব সন্ধিক্ষণে আমাদের ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রারম্ভেও আমরা খনা, লীলাবতী প্রমুখ বিদুষী নারীর কথা শুনতে পাই। তখন বড় বড় বিদ্যাকেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায় নাই—নানা স্থানে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল এবং মিথিলা ও নবদ্বীপ বাংলা দেশে শিক্ষার উচ্চতম কেন্দ্র ছিল।

কিন্তু দিন দিন পরাধীনতার ফলে সমাজ জীবনে ও নরনারীর স্বাধীন চিন্তাক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সঙ্কট ও প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত করেছিল। ধনী এবং জমিদারের ঔদার্যে ও রাজানুগ্রহে চতুষ্পাঠীগুলির ব্যয় নির্বাহ হতো। বিদ্যা দানে অধ্যাপকমণ্ডলী এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। তাঁরা ছাত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান প্রভৃতির ব্যয় বৃত্তি সংগ্রহ করেই চালাতেন। গ্রামে তাও হ্রাস পেতে লাগল। আমরা পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে ইংরাজ অধিকারে আমাদের প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ ও প্রথা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেললাম। স্বদেশীয় মাতৃভাষা ও ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীর্ণ কঙ্কাল ভূমিসাৎ হল। নূতন ভাব, নূতন আদর্শ ভাবে আমরা শিক্ষিত হতে লাগলাম।

এই যুগে রাজা রামমোহন রায় এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং অন্যান্য মনীষীদের প্রচেষ্টায় এক নবযুগের সূচনা হয়। সে ইতিহাস অনেকেই জানেন। সুতরাং তা এখানে আলোচনা করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা।

এই শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় বিজাতীয় ভাব দেখে স্বামী বিবেকানন্দ নারী-শিক্ষার জন্য প্রাচীন ও বর্তমানের সম্মিলিত আদর্শের প্রবর্তন করতে ভগিনী নিবেদিতাকে বাংলাদেশে কাজ করতে প্রণোদিত করেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে নিবেদিতা শিক্ষা সম্বন্ধে এবং আমাদের প্রাচীন ব্রতচর্য ও খেলাধূলার মধ্যে কিণ্ডারগার্টেনের বীজ দেখতে এবং সেইটিই বালকবালিকার শিক্ষায় আদর্শ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তৎকালে নারী শিক্ষা প্রায় ঘুমাবী জীবনে আবদ্ধ ছিল, এবং ডিগ্রিধারী শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে আমরা দেখতে পাই আমাদের হিন্দুসমাজের মেয়েরাও শুধু কলেজের ডিগ্রিধারী নয়—অনেক উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন এবং এখনও করছেন। শিক্ষিত ভারতীয় মহিলার সংখ্যা বর্তমান যুগে ভারতের নানা প্রদেশে ক্রমবর্ধমান ভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান যুগের যে শিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রচলিত—তা শুধু ইংরাজী আমলের শিক্ষা প্রথাকেই অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠেছে এই শিক্ষার আদর্শ ই কি আমরা অনুসরণ করব। এতে মনুষ্য চরিত্রের উন্নত ভাব, আদর্শ সংযত জীবন ও প্রকৃত চিন্তাশীল মনিষীর আবির্ভাব সংখ্যা হিসাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে নগণ্য। একেবারে নাই বলি না। কিন্তু বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থী-দের মধ্যে অধ্যাপকদের প্রতি সে ভক্তি শ্রদ্ধা নাই এবং গুরুশিষ্যের যে মধুর সম্বন্ধ পূর্বে দেখা যেত তার অনেকটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ও ডিগ্রী সম্মান লাভ করাই কি শিক্ষার আদর্শ? প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্যাগব্রতী শিক্ষক ও শিক্ষণের অভাব। আমরা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রবর্তিত টিচার ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান-আদির কার্য কলাপ দেখে বিশেষ আশান্বিত হতে পারিনি। শিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ দার্শনিক এবং বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় আলোচিত প্রণালীর শিক্ষা দিলেও তবে কলেজী শিক্ষার মত কোনরূপে ডিগ্রীলাভ বা পাশ করাই যেন লক্ষ্য। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী নিয়ে চাকুরীর উন্নতির জন্যই লালায়িত হন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে। অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীকে কোনরূপে

পাশ করাতে পারলেই যেন তাঁদের শ্রম সার্থক হলো বলে মনে করেন। যাঁরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যাপনা করেন তাঁরা যে সমাজজীবনে দেশের কল্যাণার্থে মানুষ গড়বার মহৎ কাজ হাতে নিয়েছেন—সেদিকে তাঁদের কোন চিন্তা বা লক্ষ্য নাই। মানুষ গড়তে হলে যে আদর্শ জীবন যাপন করতে হবে যে সংযম ও পবিত্রতা নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে হবে—দেশ ও জাতির হিতার্থে যে স্বার্থীন চিন্তার, সংযত দৃঢ় চিত্তের যে ত্যাগ মন্ত্রের অনুপ্রাণিত করতে হবে সে আদর্শ অধ্যাপকের জীবনে না থাকাতে, ছাত্রছাত্রীদের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। প্রতিষ্ঠান আছে—কিন্তু তা প্রাণহীন। শিক্ষার অপেক্ষা চাকরীর উন্নতির, অর্থের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য। কিন্তু এর উপায় কী? অনেকে বলেন বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্বাচন করলে বালকবালিকাদের চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম ও নীতির বীজ উপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ আস্থা রাখতে পারা যায় না। কেননা খৃষ্টান মিশনারীদের স্কুল কলেজে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ও বৃত্তি প্রভৃতির পুরস্কার থাকলেও কয়জন নীতিবিদ বাইবেল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি উত্তীর্ণ হয়েছেন? অর্থলাভে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভের আশায় প্রাণহীন ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন ফল আশা করা যেতে পারে না। তবে এই সব শিক্ষা ধর্ম বা নীতি শিক্ষায় যিনি অধ্যাপক হবেন—তাঁর যদি জীবন পবিত্র উচ্চ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, প্রেম, সহৃদয়তা, উদারতার প্রভাবে ছাত্রছাত্রীদের হৃদয় এক গৌরবোজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারেন—তবে কিছু সুফল লাভের প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগ-শিক্ষায় এইরূপ ভাবের অধ্যাপক দুর্লভ।

বর্তমান যুগে হরিদ্বারে গুরুকুল এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের সহজ স্থাপন করবার প্রয়াস দেখা গেছে। তারপর আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী বিদ্যাপীঠ, বেলুড়ের মাদ্রাসা-ছাত্র ও অধ্যাপকের একত্র বাস আলোচনা চর্চার মাধ্যমে গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করবার যে উদ্যম ও চেষ্টা করছেন তাও অন্যান্য বিদ্যামন্দির অপেক্ষা বিশেষ সুফলদায়িনী। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যে ছাত্রাবাসগুলি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেও ত্যাগব্রতী শিক্ষিত সাধুদের সংস্পর্শে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হচ্ছে দেখা যায়। আজকাল স্থানে স্থানে এই ভাবের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—কয়েক জন উদ্যমশীল ত্যাগীর উদ্যম ও উৎসাহে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই সব দেখে মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের মত অধ্যাপক-ছাত্র অধ্যাপিকা-ছাত্রী একত্র বাস, পারস্পরিক আলোচনা এবং হৃদয়গত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—তাহলে বর্তমান যুগের শিক্ষায় যে ঘোর ত্রুটি দেখা যায়—তাহার কতকটা সংস্কার হতে পারে। কিন্তু মনে হয় সর্বোপরি প্রতি শহরে এমন কি সমৃদ্ধিশালী পল্লীতে যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ত্যাগী ধর্মনিষ্ঠ, উদ্যত, পবিত্র যুবক ও যুবতীর দল প্রকৃত শিক্ষাকার্য উদ্বুদ্ধ হন তাঁরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকের অভাব পূর্ণ করতে পারেন এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন।

উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করে আমরা দেখছি যে আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। শতবর্ষের কিছু পূর্বে নানারূপ ধর্ম, সমাজ, নৈতিক ভাবের যে বিপ্লব এসেছিল পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবনে শিক্ষিত যুবকদের চিত্তে যে বিপ্লব ও উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল আমাদের যে সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা এসেছিল সেই বিপ্লবের ও ভাবরাশির সংঘর্ষ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির আবির্ভাব হয়েছে।

তাঁরা তাঁদের জীবন স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বহুনির্যোগে

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীমার আদর্শ প্রচারিত করেছিলেন তা যদি আলোচনা করে দেখা যায় তাহলে জানতে পারা যায় প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে। শিক্ষা শুধু বই মুখস্থ নয়, বড় বড় লেখকের লেখা আবৃত্তি করা নয়। শিক্ষা শুধু পাশ করা নয়। এই মহামানব ও মহামানবী দেখিয়েছেন যে অক্ষর মাত্র পরিচয়েও তাঁরা কিভাবে শিক্ষা লাভ করে দেখিয়ে গেছেন তাঁদের অপূর্ব জীবন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎই প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁদের বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করেন প্রকৃতির অপার রহস্য ভেদ করে। জগতের জীবজন্তুর চরিত্র অধ্যয়ন করে, তাঁদের স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাঁদের মনস্তত্ত্বের কত নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করছেন। কত নূতন নূতন ভাবধারায় জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করছেন—কত বৈজ্ঞানিক, কত রাসায়নিক, কত সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক থেকে নয়, তাঁরা আহরণ করেন সম্মুখে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সামনে রয়েছে, যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সম্পদ নিয়ে প্রকৃতি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার থেকে—অর্থ অর্জনের দেখার—প্রকৃতি দর্শনের সে দৃষ্টি আমরা হারিয়ে ফেলি। এই দুই মহাজীবন দেখিয়ে গেলেন যে গ্রন্থাদি না পাঠ করেও এই বিশ্ব জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করা যায়, গভীর তত্ত্ব আহরণ করা যায়, এবং প্রকৃত ব্রহ্মদৃষ্টিতে যে সৌম্য, শান্তরস হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে তাতে জগৎ আপন হয়ে যায়, প্রেমের তরঙ্গে সব ভেদ দৃষ্টি ধুয়ে চলে যায় এবং জগতের কল্যাণ মানব জীবনের উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সুপ্ত আত্ম চেতনাকে জাগ্রত করতে জীব সেবায় তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই উচ্চ আদর্শ আমাদের মনে রাখতে হবে। এইসব যুগদেবতারা, যুগমানব ও যুগমানবীরা সাধারণ জীবনে সম্ভব হতে পারে না—ইহা সত্য বটে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"আমি ষোলটাং করছি—তোমরা একটাং কর।" এই কথা বলেছেন তিনি তাঁর সন্তানদের যাঁরা এক একজন বিদ্যাসাগর। এক্ষেত্রে আমরা যদি তাঁর সন্তানেরা যে একটাং দেখিয়েছেন—সেটাকে ষোল আনা করে একটাং করবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। স্বামিজী বলতেন শ্রীশ্রীমা এসেছেন নারী জাগরণের জন্য; এঁর আবির্ভাবে ভারতে আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে, তার চেয়েও ঢের বেশী মহীয়সী নারীদের আবির্ভাব হবে। নিবেদিতা যাতে শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে শিক্ষা পান সেজন্য স্বামিজীর ইচ্ছায়-শ্রীশ্রীমার সাথে ভগিনী নিবেদিতা বাস করেছিলেন। কেন?-সেটা কি আমরা ভেবে দেখি? প্রকৃত শিক্ষা, মনুষ্যত্বের বিকাশ, আত্মচৈতন্যের বিকাশ, আত্মজ্ঞানের বিকাশ। এর ভিত্তির উপর আমাদের মূল শিক্ষার সৌধ নির্মাণ করতে হবে। সেইদিন আসবেই আসবে।

পাঠক্রম নির্ণয় সমস্যা

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

উনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে এটা কখনও কখনও সত্যি বলা চল্‌তো যে আমেরিকান উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র, ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে দেখতো যে তা তার প্রায় সবই পড়া ; কেননা (Elementary) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক একই ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হতে উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত আমেরিকান ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক তৈরী হল। কিন্তু একথা বলা শক্ত যে উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক আর Elementary বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চস্তর স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সত্যিই কোন পার্থক্য আছে। যে কোন বিষয়েই, কতকটা পুনরাবৃত্তি অবশ্যই সমর্থন করা যায়। ইতিহাসে যদি এমন কোন ঘটনা থাকে যা স্থায়ী ভাবে মনে করে রাখা দরকার তা হলে পুনরাবৃত্তিরও দরকার। আবার ঘটনাগুলি যদি এমনি স্থায়ীভাবেই স্মরণীয় হয় যে তাদের উপর ছাত্রের একটা আধিপত্য জন্মে যাবে, তবে সেরূপ পুনরাবৃত্তিতেও একটা নির্দিষ্ট আনন্দও থাকে। যে বিষয়ে পুনরাবৃত্তি-জাত কখন কখন পুনঃ পুনরাবৃত্তিই তার ঔষধ বা প্রতিষেধক। এতে অবশ্য মেসুইটদের (moto) বা আদর্শ Repetitio mater studiorum খর্ব হয় না। এর অর্থ এই যে, ইতিহাসের বলয় তা বৃত্ত হতে যে পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য এবং উদ্দেশ্যের সারাংশ বিশেষ, অপরিত্যাজ্য মন্দ অপেক্ষা তা নিশ্চয়ই ভাল।

ইতিহাস পাঠের সমকেন্দ্রিক বলয় পদ্ধতির বিরুদ্ধ সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাঠকে Pestalozzi কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত শিশুমানস এবং শিশুপাঠক্রম অনুসারে বিভিন্ন সোপানে বিন্যস্ত করার প্রস্তাবও দেখা দিয়েছিল। রুশোর "স্বভাবে প্রত্যাবর্তন" (Return to nature) আদর্শ অনুসরণ করে, অপর কোন পুস্তক পাঠ না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে Pestalozzi নয়ন জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। যে সকল পুস্তক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি ভস্মীভূত করা হ'ল। তারপর তাঁর জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডে একটি খামার বাড়ী কিনে তিনি কৃষকের কর্ম আরম্ভ করিলেন। রুশোরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আবার কয়েক বৎসর পরেই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হতে নিজের সাড়ে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে তিনি শিশু শিক্ষার গবেষণা আরম্ভ করলেন। এরই ফলে এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা ক্রমশঃ সারা শিক্ষাজগতে ছড়িয়ে পড়েছে। Pestolozzi পাঠক্রম নির্ধারণকেই মৌলিক প্রয়োজন বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবং তার জন্য নানা বিধির নির্দেশও দিলেন। তিনি সুদৃঢ়-ভাবে ঘোষণা করলেন যে সকল শিক্ষাকেই শিশুর ক্রম বিকাশকে অনুসরণ করে চল্‌তে হবে। তিনি বললেন— "প্রতিটি শিশুকে তাই শেখান উচিত, যা তাকে শিখতেই হবে সেই সময়ে, তার স্বভাব যা চাইছে।" অন্য কোন ক্রম শুধু ব্যর্থ নয়, ক্ষতিকরও হতে পারে। এই আদর্শ রুশোর। Pestolozzi তাকে বাস্তবানুগ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। কী শেখাতে হবে, এবং কখন শেখাতে হবে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তা নির্ধারণ করতে হবে। এই নির্ধারণ স্পষ্টতঃ জাতির ইতিহাসের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে। কারণ Pestolozzi-র বিশ্বাস শিশুর ক্রম বিকাশ জাতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (the culture

epoch theory) ইহাই "সংস্কৃতি যুগ" বিধি। কোন কিছু শিক্ষা দেওয়ার উপায় হচ্ছে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে, সরল থেকে জটিলে, নিকট হতে দূরে ; বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়ে নয়। ইতিহাসের পাঠক্রম নির্ধারণের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই এক বা একাধিক শিক্ষা-বিধির উপরে—কখনও Pestolozzi-র ঋণ স্বীকার করে, কখনও রুশো থেকে 'ডিউই'র মধ্যে কার ও না কারও নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে—সর্বত্রই নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে—ইতিহাসের প্রকৃতি বা স্বভাবের দিকে না তাকিয়েই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজের মাধ্যমে শিক্ষা, জীবনীর মাধ্যমে শিক্ষা, নির্বাচিত প্রসঙ্গের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি যুগের মাধ্যমে শিক্ষা, শিশুর রুচি এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে ইতিহাস শিক্ষা-দানের এমনি নানা পদ্ধতি।

Satzmanএর সাময়িক মাধ্যমের ধারণা প্রকাশিত হয় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। Wilhelm Harusch ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Welkunde গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তের স্বতঃসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করেন জার্মানিতে। প্রায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এই সিদ্ধান্ত কাজে লাগান হয়েছে—ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ দানের সামঞ্জস্য সাধনে। আমাদের দিক থেকে এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছে সাধারণতঃ স্থানীয় সমাজের একটা মোটামুটি বিবরণ, এর শিল্প, সামাজিক প্রথা, তার সঙ্গে কিছু স্থানীয় ইতিহাসের গল্প প্রভৃতি দিয়ে একটা পৃথক প্রসঙ্গ বা Topic তৈরী করে, যার নাম Local History বা স্থানীয় ইতিহাস বিধি। এই শিক্ষাদান জনসাধারণের নিজস্ব সমাজ হতে নিকটবর্তী সমাজ, তারপর দূরবর্তী সমাজের দিকে পাঠ এগিয়ে যাবে এবং এমনি করে একটা পূর্ণাঙ্গ আমেরিকার ইতিহাস বা পৃথিবীর ইতিহাস গড়ে উঠবে। 'নিকট হতে দূরে' এই সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় ইতিহাস প্রায়ই দেখান হচ্ছে পেছনের দিকে অগ্রসর হয়ে, এবং আমেরিকার সাধারণ ইতিহাস আরম্ভ হচ্ছে অন্ততঃ বর্তমানের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে।

ইতিহাস পঠনে ছাত্রের পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার যে সুবিবেচনা প্রসূত তা অনস্বীকার্য। কারণ এই পারিপার্শ্বিকতা থেকেই ছাত্রের অভিজ্ঞতা জন্মায়, এবং অভিজ্ঞতাই ইতিহাসকে বোধগম্য করিয়ে দেবার প্রধান চাবীকাঠি।

একটা বিশেষ অর্থে বলতে গেলে ইতিহাস 'সমাজ' নিয়ে আরম্ভ করে 'সমাজ' নিয়েই শেষ হওয়া উচিত—এবং ইতিহাসের পাঠও তাই 'সমাজ' নিয়ে আরম্ভ করে 'সমাজ' নিয়েই শেষ হওয়া উচিত। পাঠ শুধু 'নিকট থেকে দূরে' নয় দূর থেকে নিকটেও গড়ানো উচিত। সিদ্ধান্তটি বা বিধিটি মৌলিক কিন্তু এটি পাঠক্রম নির্ণয়ের সিদ্ধান্তই নয়। বছরের গণ্ডি বা মাইলের গণ্ডি নিয়ে আমরা যদি ব্যস্ত না হই তাহলে নৈকট্য বা দূরত্বের পরিমাণ নিয়ে মুস্কিল আসান হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যায় সক্রেটিস কিংবা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন—শিশুদের পাঠের পক্ষে কার জীবনী বেশি উপযোগী তা নিশ্চয়ই নির্ণীত হবে না, এঁদের মধ্যে কে আমাদের চেয়ে কত বছর আগে বা কত মাইল দূরে ছিলেন তারই হিসাব নিয়ে।

Topical বা প্রসঙ্গানুযায়ী ইতিহাসের বিন্যাস, একটা বছরেরও বেশি কাল পরীক্ষিত হয়েছে প্রধানতঃ পাঠক্রম নির্ণয়ের জন্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনা বিন্যাসের সুবিধার জন্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৮৩১ সালে Hanpl কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা Pestolozzi কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত সমূহকে কাজে লাগাবার সচেতন প্রচেষ্টা মাত্র। এই পরিকল্পনানুসারে বিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ইতিহাস শেখান হবে গার্হস্থ্যজীবন নিয়ে—দৃষ্টান্ত : রোবিন্সন্স্, সাইরাস্, আলেকজাণ্ডার, গর্থ হেনরী প্রভৃতির গার্হস্থ্য

জীবন ; দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষা হবে সমাজ জীবন নিয়ে— দৃষ্টান্ত নেওয়া হবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের সামাজিক আচরণ, তৃতীয় বর্ষে ইতিহাস শেখান হবে রাজনৈতিক জীবন নিয়ে - দৃষ্টান্ত নেওয়া হবে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী ; চতুর্থ বর্ষে ধর্মজীবন নিয়ে ইতিহাস শেখান হবে দৃষ্টান্ত হবে প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের জীবন, এবং ষষ্ঠ বর্ষে হবে সাধারণ ধারাবাহিক ইতিহাস। Great Didactic প্রকাশিত হবার সময় Haupt প্রসঙ্গানুযায়ী বিন্যাসের অনুসারী কালানুক্রমিক বিন্যাসের স্বপক্ষে Comeniusএর নাম করতে পারতেন। ঘটনাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করবার পদ্ধতি হিসাবে প্রসঙ্গ বিন্যাসযুক্ত রাষ্ট্রে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মূল-পাঠ্য পুস্তকে বিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতিতে, এবং সমাজ বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক সাহিত্যে 'ইউনিট' নামে এই পদ্ধতির সহিতই আমরা সুপরিচিত হই। ইতিহাসের 'ইউনিটে' কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বাদ দেওয়া যায় না। ইউনিটগুলির মধ্যে ধারাবাহিক সংযোগ অনুসৃত থাকতে পারে। একথা সেই 'ইউনিট'গুলির পক্ষে বিশেষ করে সত্য, যেগুলি নির্ধারিত হয় পলায়মান বর্তমানের চিন্তা-কর্ষক বা প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করে। এর একটি চমৎকার অথচ একান্ত একক নমুনা এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছে একটি জুনিয়ার হাইস্কুল। "যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আস্তি কেন" নামক একটি ইউনিটের পরেই "গ্রীক ভাস্কর্য" সম্পর্কে অপর একটি 'ইউনিট' যোগ করেছে। এর পরের ইউনিট বিশ্বযুদ্ধের সেনানীগণের 'বোনাস' সম্পর্কে এবং তারপরের ইউনিটে একটি প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র হতে যথেচ্ছ সংগৃহীত চল্লিশটি লোকের জীবনী যাঁরা আজও বেঁচে রয়েছেন তাঁদের থেকে আরম্ভ করে নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, মার্টিন লুথার এমন কি জুলিয়াস সীজার পর্যন্ত। এই পাঠ-প্রণালীর উৎকর্ষ এই যে (যদি একে উৎকর্ষই ধরা যায়) এই প্রণালী বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনেরই মত করে তোলে।

পাঠক্রম নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত বা চিঠি হিসাবে জীবনীর মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা ধরে নেয় যে কোন সামাজিক দলভুক্ত একটি ব্যক্তি সেই সামাজিক দল অপেক্ষা কম জটিল। ব্যক্তিকে শুধু ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য এরূপ ধারণা নির্ভুলই হয়। কিন্তু জীবনীর মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষার ধারণা এত ব্যাপক যে এখানে ব্যক্তির জীবন শুধু ব্যক্তির জীবন বলেই গৃহীত হয় না তা একটি সামাজিক দলের বিবরণী হয়ে ওঠে। সুতরাং এসম্পর্কে এত বিচিত্র প্রশ্ন ওঠে যে একটি পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করাই সুবিধাজনক। "সংস্কৃতি যুগ" নামক চিঠি প্রাচীন। প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে। শিক্ষা ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত নূতন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর প্রারম্ভ। কিন্তু শিক্ষণ-ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ উপযোগীতা Tuiskon Ziller (১৮১৭-১৮৮২) কর্তৃক ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়। Ziller Herbarh এর (concentration) একীকরণ বিধির পক্ষপাতী। এর অর্থ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের চতুর্দিকে শিক্ষণ সংক্রান্ত সামগ্রীর সমাবেশ। Ziller ইতিহাসকেই এই কেন্দ্রীয় বিষয় বলে বিবেচনা করে নিলেন। সংস্কৃতি যুগ বিধিকেই সমস্ত পাঠক্রমের ভিত্তি করে তিনি লিপজিগের শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারের সহিত সংশ্লিষ্ট আট বছরের 'Practice' স্কুলের জন্য সম্পূর্ণ একটি পাঠক্রম প্রস্তাব করলেন। তাঁর এই গবেষণা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধানতঃ এটা একটা একাগ্রীকরণ (concentration বা co-relation) পারস্পরিক সম্বন্ধ বিধি যুক্তরাষ্ট্রেও সাধারণতঃ একে তাই বলা হয়ে। এবং এই চিঠি শিক্ষা জগতের চিত্ত এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে, এই সম্পর্কে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তাই আলোচনা করেই একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাগ্রীকরণ বিধির সমর্থকেরা কেউ ইতিহাস, কেউ ভূগোল, কেউ বিজ্ঞান, কেউ স্কুলের সমাজ জীবন আবার কেউ আধুনিক ঘটনাসমূহকে কেন্দ্রীয় বিষয় বলে গ্রহণ করে। পাঠ্য বিষয় সমূহের (Fusion) মিশ্রণ বা (Integration) একীকরণ যাকে বলে

একাগ্রীকরণ (বা concentration) তাহাই কিন্ডি অগ্রবর্তীকরণ।

'সংস্কৃতি-যুগ' বিধিকে বাদ দিলেও concentration বা একাগ্রীকরণ নীতি, কিন্তু উপকরণ সমূহের ক্রম নির্ণয়ে এই চিন্তার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ প্রয়োজন। সংস্কৃতিযুগবিধি ও concentration বা একাগ্রীকরণ নিদ্ধান্ত ছাড়াও প্রযুক্ত হতে পারে এবং ইতিহাসের বেলায় হয়েছেও তাই। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিদ্ধান্তের অর্থ অধ্যাপক S. S. Laurie কর্তৃক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছেন "শিশুর পক্ষে ইতিহাসের শৈশব, কিশোরের পক্ষে ইতিহাসের কৈশোর, যুবকের পক্ষে ইতিহাসের যৌবন, এবং প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ইতিহাসের প্রৌঢ়ত্বই শ্রেয়।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারণার দুটি বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে ঘটনাসমূহ এমন ভাবে নির্বাচিত এবং বিন্যস্ত হবে যে শিশু তার জীবনের যে সংস্কৃতি-স্তরে উপনীত হয়েছে, সেই সংস্কৃতি স্তরের সঙ্গে তার পঠিত জাতীয় সংস্কৃতি স্তরের যেন সঙ্গতি থাকে। শৈশবের তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে শিশুরা থাকে সংস্কৃতির আদিম যুগে, পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্তরে সংস্কৃতির মধ্য যুগে, সপ্তম এবং অষ্টম স্তরে তারা হয়ে আসে আধুনিক। পাঠ্যসূচীকারও তাই আদিম অবস্থার ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করেন সংস্কৃতির আদিম যুগ, মধ্য যুগের ছাত্রদের জন্য সংস্কৃতির মধ্যযুগ, আবার আধুনিক যুগাবস্থার ছাত্রের জন্য আধুনিক যুগ। সংখ্যানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বা ভৌগোলিক ঐক্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হতে পারে। যে সব ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, তারাও পাশাপাশি স্থানলাভ করতে পারে। ১৯১১ সালে প্রকাশিত আমেরিকার পাঠশালাতে দ্বিতীয় স্তরের পাঠক্রম ছিল নিম্নলিখিতরূপ—প্রাচীন আর্যগণ, প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা, ইহুদির জীবনযাত্রা, বাবিলবাসীর জীবনযাত্রা, পশুচারক বিশেষতঃ ইহুদিদের কাল, প্রাচীন কোরেনিসিয়নগণ, আধুনিক আফ্রিকানদের আদিম-জীবন, সুমের উত্তর দেশের জীবনযাত্রা, জাপানের ফিলিপাইন এবং ভারতবর্ষের আদিম জীবন উত্তর আমেরিকার ভারতীয়দের আদিম জীবন।

ডিসিপ্লিন

ডিসিপ্লিন শব্দের প্রকৃত অর্থবোধক কোন বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ আছে কি না জানি না। সেজন্য ইংরাজি শব্দটিই নিরোনামা হিসাবে ব্যবহার করিলাম।

আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ডিসিপ্লিন এতই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে কোন শব্দের সাহায্যে উহার উল্লেখ করা বা ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন হইত না। যে ব্যক্তির শরীর চিরজীবন সম্পূর্ণ নীরোগ তাহার মনে স্বাস্থ্য নামক একটি বস্তুর অস্তিত্বের কথা উদিত হয় না। বস্তুতঃ শরীরের সম্পূর্ণ নীরোগ অবস্থা এবং স্বাস্থ্য একই বস্তু। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সহিত ও ডিসিপ্লিনের একাত্মতা ছিল। সেজন্য ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রে ডিসিপ্লিনের আলোচনার মূল্য। কারণ আধুনিক কালে স্বতঃস্ফূর্ত ডিসিপ্লিনের অভাব ঘটিয়াছে। ঠিক যেন চিরনীরোগ ব্যক্তি, যিনি কখনও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তাও করেন নাই—তিনি পানভোজনাদির অসংযমবশতঃ

খাইয়া হারাইয়া স্বাস্থ্যদায়ক ঔষধ খুঁজিতেছেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, পত্রিকা প্রভৃতি পড়িতেছেন।

আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ডিসিপ্লিন পরব্রহ্মের মতই অগম্য, অস্পর্শ ও অরূপ। কারণ উহা পরব্রহ্মের মতই স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতঃপূর্ণ, সর্বত্র অনুস্যূত ও অকৃত্রিম ছিল। এমন শুনা যায় অমুক শিক্ষক ভাল ডিসিপ্লিনারিয়ান, অমুক ডিসিপ্লিন রক্ষা করিতে পারেন না—ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের চাপে বা শাসনের ভয় দেখাইয়া যে ডিসিপ্লিন রক্ষা করা যায় তাহা কৃত্রিম। বস্তুতঃ শিক্ষাদান ও ডিসিপ্লিন রক্ষা একসঙ্গে চলার জিনিস নহে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসার পূর্বে ডিসিপ্লিত হইতে হইবে। প্রয়োপবিষ্টের ঋষি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণকে এক বৎসরকাল স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যথার্থ ডিসিপ্লিত কি না। তৎপরে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য কলা-কৌশল অবলম্বন করেন নাই, ডিসিপ্লিন বাহির হইতে ছাত্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবার মত কোন জিনিস নহে। ডিসিপ্লিন এন্‌ফোর্স করার কথাটা বিচারসহ নহে। শিক্ষার্থীর মনই শিক্ষাশিল্পীর পটভূমিকা। এই পটভূমিকা নির্মল, শান্ত ও অচঞ্চল না হইলে শিল্পীর চিত্রাঙ্কন কার্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঝড়ের মধ্যে খোলা জায়গায় পর্দা টাঙাইয়া নিপুণ চিত্রশিল্পীও ছবি আঁকিতে পারেন না। শিক্ষার্থীর চিত্তের এই নির্মলতা, শান্তভাব ও অচঞ্চলতার নামই ডিসিপ্লিন। ইহাই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের গোড়ার কথা—সমগ্র শিক্ষা-সৌধের বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের দুর্বলতাবশতঃ শিক্ষাসৌধ টলমল করিতেছে, কখন ভাঙিয়া পড়িবে বলা যায় না।

নিছক আদর্শবাদের উচ্চশিখরে বসিয়া চিরাভ্যস্ত মুখস্থ করা কথা লইয়া আলোচনা করিলে আমাদের চলিবে না। ধূলার ধরণীতে নামিয়া আসিয়া সাহসের সহিত বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে—সে বাস্তব অবস্থা যতই নৈরাশ্যজনক হউক না কেন। প্রকৃত অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ না করিয়া অথবা বুঝিতে পারিয়াও পলায়নী মনোবৃত্তির প্রেরণায় গুরুতর অবস্থাকে লঘু করিয়া দেখিয়া শিক্ষাদান হইতে মুখস্থ করা বক্তৃতা দিলে হাততালি পাওয়া যাইতে পারে, চাকুরি রক্ষাও হইতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইবে না। নৈরাশ্যবাদ ভাল জিনিস নহে। কিন্তু যেখানে নিরাশ হওয়ার যথার্থ কারণ ঘটিয়াছে, সেখানে চক্ষু নিমীলিত করিয়া আশাবাদী হইতে চেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নহে। তীরে দাঁড়াইয়া সন্তরণ-শিক্ষার উপকারিতা ও সন্তরণের বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির কোন উপকার করা যায় না। একজন লোকের ডুবিয়া মরার গুরুতর বাস্তব ঘটনাকে লঘু করিয়া না দেখিলে এরূপ বক্তৃতাও করা যায় না। আমাদের শিক্ষার্থীরাও ডিসিপ্লিনের সাঁতার না জানার ফলে ডুবিতে বসিয়াছে। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে কোমর বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। কালক্ষয়ের অবসর নাই। ঝড় উঠিয়াছে। শিক্ষার্থীদের মনের পর্দা ধূলায় ধূসর—বায়ুবেগে দোদুল্যমান। ইহার উপর আঁকিতে গেলে ছবি আঁকিতে বসিয়া কেলাই স্বাভাবিক। হইতেছেও তাহাই। আমাদের দেখাপড়া শেখা ছেলেগুলি হইতেছে চিনির বলদের মত। তাহার অনুভূতি আছে, মাধুর্যের আস্বাদন নাই। অধীত বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক না হয়, তাহা হইলে ঐ বোঝা বহিয়া বেড়ান বিড়ম্বনা মাত্র।

কেন এরূপ হইল? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই ব্যর্থতা ও অসাফল্যের কারণ কি? উত্তর—ডিসিপ্লিনের অভাব। ডিসিপ্লিনের অভাবের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইবে না। উত্তর সম্ভবতঃ এইরূপ। ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের লোককে—বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজকে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা, স্বৈরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক

পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। লোকের ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক, সুরুচি কুরুচি, প্রভৃতি জ্ঞান লোপ পাওয়ার ফলে অবাধ ও অসহনীয় দুর্নীতি দেখা দিয়াছে। বিধান সভায় জুতা ছোড়া হইতেছে, মাননীয় মন্ত্রী মুরগী খাওয়ার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, রেল লাইনের উপর ধরনা দিয়া রেল চলা বন্ধ করা হইতেছে, টিকিট কালেক্টার টিকিট চাহিলে তাহাকে প্রহার করা হইতেছে, শিক্ষকের গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হইতেছে, শিক্ষককে প্রহারকারী ছাত্র পণ্যমান্য লোকের সহানুভূতি পাইতেছে, বাপদের সাহেবী করার জন্য ছেলেরা সমিতি স্থাপন করিয়া সংঘবদ্ধ হইতেছে, কারণে অকারণে সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা ও ধর্মঘটের অন্ত নাই। খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দিয়া, চোরাকারবারী করিয়া, সাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া লোকে বিনা শাস্তিতে বা অতি অল্প শাস্তিতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। যৌন আবেদনমূলক কুৎসিত সাহিত্য ও সিনেমা অবাধে ছেলেদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাইতেছে। যে সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদের মদ্যপানাদি দোষ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয় না, সময়ে সময়ে তাঁহারা বীরপূজাও পাইয়া থাকেন।

ইহাই ছেলের বর্তমান আবহাওয়ার আংশিক বিবরণ। ছেলেরা এই আবহাওয়ারই ফসল। এই আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও ছেলেরা ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না—এরূপ আশা করা অসঙ্গত। এই আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া আর যাহাই হউক ডিসিপ্লিণ্ড হইয়া মানুষ হওয়া যায় না। স্কুলে, কলেজে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের যে সমস্ত ডিসিপ্লিন-বিরোধী কার্য দেখা যাইতেছে তাহা রোগ নহে, উপসর্গ মাত্র। রোগের জড় অন্যত্র—বর্তমান কদর্য সমাজ-ব্যবস্থায়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ্‌ও আছেন—এই উপসর্গ-গুলিকেই রোগ মনে করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতেছেন। এ চিকিৎসা ফলপ্রসূ হইবে না। রক্তদূষিত ফলে দেহে ক্ষত দেখা দিলে মলম লাগাইয়া উহা ভাল করিবার চেষ্টা করা ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষকদের নিন্দা করিয়া, স্কুল কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস করিয়া, জাতীয় সমর শিক্ষাবাহিনী গঠন করিয়া এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি স্থাপন করিয়া এ রোগের জড় নষ্ট করা যাইবে না। এ রোগের জড় নষ্ট করিতে হইলে চাই উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। এই কার্য শিক্ষকদের ক্ষমতার বহির্ভূত। কারণ শিক্ষকদের কোন সামাজিক মর্যাদা নাই। আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত বলিষ্ঠ রাজশক্তিই এই পরিবর্তন সম্ভটিত করিতে পারে।

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৬৬ | ২য় সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আলোচনা

ভারতবর্ষে আরও বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা, বিশ্বভারতী, যাদবপুর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বর্ধমান, কল্যাণী ও বরাহনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে আসিতেছে বা আসিয়াছে। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কার্যের ক্ষেত্র ও সাধনোপায় ভিন্ন ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে এক শত বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলেই এই অগ্রগতির পটভূমিকা বোঝা যায়। বিহারে পাটনা ও বিহার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আরও চারিটি খোলার প্রস্তাব শোনা যাইতেছে। মধ্যপ্রদেশে এখন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, বিক্রম (উজ্জয়িনীতে), সাগর ও জবলপুর, কিন্তু আরও দুইটি চাই বলিয়া ধ্বনি উঠিয়াছে—একটি গোয়ালিয়রে, অন্যটি রায়পুরে। বিরাট্ মধ্য প্রদেশের ভূভাগ, সুতরাং এই চাহিদা অশোভন নয়। সংযুক্ত প্রদেশে যদি আটটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকে, তবে মধ্যপ্রদেশে পাঁচটি হইলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। আর যদিই জনসংখ্যা হিসাবে আপত্তি হয়, তবে তাহার উত্তরও আছে। জনসংখ্যা ৬ কোটি হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় নিকটে হইলে স্বল্পতম জনগণের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ বাড়িবে। আজ যাহা স্কুল, কাল তাহা কলেজ, দেখিতে দেখিতে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে দেখা দিতেছে। এইভাবে আজ সম্ভব হইতেছে। ইহা ভাল না মন্দ, চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেরা তাহা বিচার করুন।

শরীরচর্চায় গোয়ালিয়রের অধ্যক্ষ

গোয়ালিয়রের লক্ষ্মীবাই শরীরচর্চা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ যাহাতে জনগণের মন শরীরচর্চার অনুকূল হয় সেজন্য ভারত সরকারের শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষার পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শরীরচর্চার কতকগুলি বিষয় নির্বাচন করিয়া সেগুলিতে দক্ষতার মান স্থির করা হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের বেশি এবং পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম, বড়দের এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ছোটদের জন্য পৃথক ভাগ আছে। মান স্থির করা হইয়াছে তিন স্তরে—অতিশয় সহজ, সামান্য চেষ্টা করিলেই অধিকাংশ লোক যেখানে পৌঁছিতে পারিবেন;

অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাহা শিখিতে চেষ্টা ও অভ্যাসের প্রয়োজন, ও শেষ স্তর—তাহা অবশ্যই কঠিন ও সাধনা সাপেক্ষ। সাফল্য অর্জন করিতে পারিলে তাহাকে চিহ্নিত 'ব্যাজ' দেওয়া হইবে।

আমাদের পল্লীগ্রামে এই পরিকল্পনার উৎসাহ এখনও সঞ্চারিত হয় নাই। অবশ্য পুঁথিকর গাত্র জোটানো আমাদের একটা প্রধান সমস্যা, প্রতিকূল সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশও উড়াইয়া দেওয়া যায় না; তথাপি কোনও এক দিক দিয়াও শেষে উৎসাহের সঞ্চার হওয়া চাই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। এই তিনটিই ন্যায়সঙ্গত দাবি—ইহা কার্যত কতদূর পূরণ হইল, তাহা জানিতে আগ্রহ জন্মে। মার্চ মাসেই এ বিষয়ে জানিতে পারা উচিত; আশা করি অন্য দাবি উত্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও শিক্ষকসমিতি অবহিত হইবেন।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্র

"কলম্বো প্ল্যানের কারিগরী সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের জন্য গত বৎসর সর্বশুদ্ধ ২৭১ জন ভারতীয় যুক্তরাজ্যে গমন করেন। ইহাদের মধ্যে ১৪ জন হইলেন তত্ত্বাবধায়ক ও কারিগর, যাঁহারা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ট্রেনিং লাভের জন্য ব্রিটেনে আগমন করেন।

ভারতীয় শিক্ষার্থিগণ ব্রিটেনে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতেছেন তাহাদের মধ্যে আছে কৃষি, ব্যাংকিং, কয়লা খনির কাজ, অর্থনীতি, ইঞ্জিনীয়ারিং, মৎস্যবিদ্যা, গ্রামপ্রশাসন, চিকিৎসা বিদ্যা, নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, কীটপতঙ্গ দমন, জন্তুপাল কর্ম, ও টেলি-কম্যুনিকেশন।

১৯৫৮ সালে সর্বশুদ্ধ চল্লিশ ভারতীয় কলম্বো প্ল্যানের ব্যবস্থাধীনে শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে গমন করেন; ইহাদের মধ্যে দুর্গাপুর ইস্পাত কর্মীর সংখ্যা ৬১ জন।

'ব্রিটিশ ইমফরমেশন সার্ভিসেস্ হইতে উপরি-লিখিত বিবরণ পাইয়াছি। দেখা যাইতেছে, শুধু কলম্বো প্ল্যানের হিসাবেও ব্রিটেনে ভারতীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়। কতজন ভারতীয় আমেরিকায় এই সব বিদ্যা শিখিবার জন্য যাইতেছেন তাহার একটা হিসাব পাইলে ভাল হইত, তুলনা করিয়া বোঝা যাইত। বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের গতি কোন দেশে বেশি—ইংলণ্ডে না আমেরিকায়?

কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কুবেরচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' প্রবন্ধটি আমরা 'নিবেদিতা' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম, অবশ্য পত্রিকা পরিচালিকার সম্মতিক্রমে। গত সংখ্যায় সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নাই, তাই এখন কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানাইতেছি।

পরীক্ষা সংস্কার

আসন্ন পরীক্ষাসংকটে ছাত্রদের কি অবস্থা হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রই নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন। অধ্যাপক অমাধনাথ বসু মহাশয়ের এ বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রবন্ধাকারে গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার বক্তব্য শেষ হয় নাই, বর্তমান সংখ্যায় তাহার অনুবৃত্তি হইতেছে, এবং আশা করি আগামী মাঘ মাসেও তাঁহার নিকটে এ বিষয়ে আমরা আরও কিছু শুনিব। 'পরীক্ষাই শিক্ষা' স্থির করিয়া আমরা যে কি ভুলই করিয়াছি, তাহার ভোগ আমাদের এখনও অনেক দিন সহ্য করিতে হইবে; আপাতত শোধন বা সংস্কারের অতি প্রয়োজন। আশা করি পাঠক-পাঠিকারাও এ বিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত লইয়া আলোচনা করিবেন।

মহাভারতে চিত্রিত তিনটি বিদ্যাপীঠ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

মহাভারত আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। নিঃস্বার্থ অধ্যাপনার আদর্শ সেই যুগের অধ্যাপক-সমাজে বিশেষভাবে অনুসৃত হইত। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীর ভরণপোষণের দায় ছিল সমাজের। এই কারণে দরিদ্র-সন্তানও উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেন না।

এক শ্রেণীর পর্যটক অধ্যাপক শিষ্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের বর্ণিত উপাখ্যানগুলি তৎকালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায়ক ছিল। বনপর্বে মুনিঋষিগণের তীর্থযাত্রার বর্ণনা পাঠ করিলে আমাদের বিস্ময় জাগে। যেন চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তাঁহারা বিদ্যাদান করিতে করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে জনসমাজে শিক্ষাবিস্তার করিতেন, তাঁহারা 'পঙ্‌ক্তিপাবন' নামে পূজিত হইতেন।

নিরক্ষর-সমাজে মুখে মুখেই বিদ্যার চর্চা হইত। পুরাণ-পাঠক এবং অন্যান্য উচ্চাঙ্গের উপদেষ্টা এক শ্রেণীর বিদ্বান্ রাজসভায় সম্মানিক প্রভৃতির আসন পাইতেন। সেই সময়ে ভারতে অনেকগুলি ছোট-বড় রাজ্য ছিল। সভাপর্বের দিগ্বিজয় বর্ণনে সেইগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। নারদ, ব্যাস, লোমশ, বৃহদ্রথ, দুর্বাসা প্রমুখ মুনিঋষি ও মনীষিগণের সেই সকল রাজ্যে যাতায়াত ছিল এবং তাঁহারা বিবিধ বিদ্যার আলোচনা দ্বারা সকলেরই উপকার করিতেন।

যজ্ঞসভার শাস্ত্রচর্চা ও পুরাণপাঠ এবং তীর্থ-ক্ষেত্রের ধর্মসম্মেলন, স্নান পূজা প্রভৃতি সদাচার ও বিদ্যা বিস্তৃতির পরম সহায়ক ছিল।

শিক্ষা সম্বন্ধে এইসকল তথ্যপূর্ণ আলোচনা ছাড়াও মহাভারতে তিনটি প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনটিই ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১। মিথিলা বিদ্যাপীঠ—মিথিলানগরী তৎকালে ভারতের বিদ্যাচর্চার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। বনপর্বে পাওয়া যায়, মিথিলার বাজারে বসিয়া মাংস বিক্রয় করেন, এরূপ একজন ব্যাধও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আচার্য পঞ্চশিখ চারি বৎসরেরও অধিককাল মিথিলায় অবস্থান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সনকাদি সাংখ্যাচার্যের গোষ্ঠীতে তাঁহার স্থান সপ্তম। প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যহ তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকেন। রাজর্ষি জনক আচার্য পঞ্চশিখের শিষ্য। তাঁহার পদসেবা করিয়াই সাংখ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই রাজর্ষিকে উপলক্ষ্য করিয়া সেখানকার বিদ্যাপীঠ ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রে রাজর্ষির পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি শুনিয়াই অদ্বিতীয়া বিদুষী ব্রহ্মচারিণী সুলভা রাজর্ষির সহিত দেখা করিতে মিথিলায় গিয়াছিলেন।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর অধ্যাত্ম-বিচারও এই রাজর্ষির সভাতেই ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ প্রায় সকল আচার্যকেই অন্ততঃ একবার মিথিলায় যাইতে হইত। মাণ্ডব্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র প্রমুখ ঋষিগণকে রাজর্ষির সহিত শাস্ত্রচর্চায় ব্যাপৃত

দেখা যায়। স্বয়ং ব্যাসদেবও তাঁহার পুত্র শুকদেবকে বিদ্যালাভের নিমিত্ত মিথিলায় পাঠাইয়াছিলেন, ইহাও শান্তিপর্বে বর্ণিত রহিয়াছে।

রাজর্ষি জনকের সভায় 'বন্দী' নামে খুব বড় একজন দার্শনিক অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারও পাণ্ডিত্যের প্রচুর খ্যাতি ছিল। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্যে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ মিথিলায় সমবেত হইতেন। বর্ণিত আছে—মহর্ষি অষ্টাবক্র বার বৎসর বয়সে তাঁহার মাতুল শ্বেতকেতুর সহিত মিথিলায় গমন করেন। রাজর্ষির সভাকক্ষের প্রবেশদ্বারে দারোয়ানই তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রবিচার আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া পরে দ্বার খুলিয়া দিল। অষ্টাবক্রের সহিত পণ্ডিত বন্দীর বিচার হইয়াছিল। বিচার্য বিষয়—আত্মতত্ত্ব। বালক অষ্টাবক্রের সহিত শাস্ত্র বিচারে বৃদ্ধ পণ্ডিত বন্দী পরাজিত হইলেন।

মিথিলার এই রাজর্ষি বংশ বিশেষ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের বংশীয় উপাধি ছিল 'জনক'। তাঁহাকে আমরা শুধু 'রাজর্ষি জনক' নামে জানি, তাঁহার নাম ছিল—'ধর্মধ্বজ'। এই বংশে করাল জনক, বসুমান্ জনক এবং দৈবরাতি জনক সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্যাপ্তনামা গুণী জ্ঞানী অধ্যাপক-গণকে সসম্মানে মিথিলাতে স্থান দিয়া দীর্ঘকাল মিথিলার বিদ্যাগৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই রাজর্ষিবংশের মত পূতচরিত শাস্ত্রনিষ্ঠ যৌগিবংশ আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় না। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় নৃপতিগণের কীর্তিগাথা তাঁহার অমর লেখনীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অপর কোন মহাকবি এই পবিত্র বংশটিকে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা না করিলেও মহাভারতের অধিকবি এই রাজর্ষি-বংশের বৈরাগ্য, বিদ্যাবত্তা এবং বিদ্যাচর্চার উৎসাহ-দান সম্বন্ধে যে মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই বংশকে কেন্দ্র করিয়াই মিথিলাতে সেই যুগে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

২। বদরিকাশ্রম বিদ্যাপীঠ—মহর্ষি বেদব্যাসের (শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন) আশ্রম ছিল বদরীতে। সেখানেও বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম হইত। দেবর্ষি নারদ সেই আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। ব্যাসদেবের মাত্র পাঁচজন অন্তেবাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহারা হইতেছেন—সুমন্ত, পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন এবং শুকদেব (ব্যাসদেবের পুত্র)। জৈমিনি পূর্বমীমাংসা দর্শনের সূত্রপ্রণেতা, বৈশম্পায়ন মহাভারতের প্রচারক এবং শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা। অপর দুইজনের কোন কৃতিত্বের কথা জানা যায় না। যে বিদ্যাপীঠ হইতে জৈমিনি ও শুকদেবের ন্যায় চিরস্মরণীয় মনীষী বাহির হইয়াছেন, সেই বিদ্যাপীঠের সহিত আধুনিক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা চলে না। জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গুরু ব্যাসদেবের মতবাদকেও মধ্যে মধ্যে স্থান দিয়াছেন, ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির মতবাদকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুশিষ্যের পরস্পরের উপর এরূপ শ্রদ্ধা ও আস্থা একান্ত দুর্লভ। বিদ্যাপীঠের গৌরব অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীর সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু বিদ্যাচর্চার গভীরতার দ্বারাই বিদ্যা-পীঠের সার্থকতা বিচার করা হয়।

৩। মৈত্রিবারণ্য বিদ্যাপীঠ—মহাভারতের প্রারম্ভেই আমরা একটি আশ্রমের পরিচয় পাই, তাহার নাম মৈত্রিবারণ্য। সেখানে শৌনক নামে এক কুলপতি বারো বর্ষকাল ব্যাপিয়া এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 'কুলপতি' শব্দের সাধারণ অর্থ —কুলের মধ্যে যিনি প্রধান। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়ম আছে, শব্দের যদি অন্য কোন রূঢ় (সর্বজন-প্রসিদ্ধ) অর্থ থাকে, তবে যৌগিক (সাধারণ, ধাতু-প্রত্যয়লভ্য) অর্থটি দুর্বল হইয়া পড়ে। যিনি দশ হাজার শিষ্যকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিয়া থাকেন,

তিনিই মূলপতি। এই অর্থটি রূঢ়। টীকাকার নীলকণ্ঠ রূঢ় অর্থেরই আদর করিয়াছেন। রূঢ় অর্থটি গ্রহণের পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। শিষ্য-সম্পদ্ খুব বেশী না থাকিলে বার বৎসরকাল ব্যাপিয়া একটি মহাযজ্ঞ পরিচালনা সম্ভবপর হইত না। (মহর্ষি দুর্বাসা যখন বনবাসী পাণ্ডবদের নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার সঙ্গেও দশ হাজার শিষ্য ছিলেন।) 'যহ' অর্থেও সহস্র, অযুত প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় (মীমাংসা দর্শন সূত্র ৬।৩।৩১)। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি শৌনক বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে অন্ন এবং বিদ্যা দান করিতেন। তাঁহার এই যজ্ঞ-সত্রেই মহাভারত তৃতীয়বার প্রচারিত হয়। (প্রথম প্রচার সরিৎসাগরে,—বক্তা ব্যাসদেব, শ্রোতা শুকদেবাদি শিষ্যাধীনস্থ। দ্বিতীয় প্রচার—তক্ষশিলায়, জনমেজয়ের সর্পসত্রে, বক্তা বৈশম্পায়ন, শ্রোতা উপস্থিত যাজ্ঞিক, যজমান ও যজ্ঞ দর্শকগণ।) লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ অনেক তীর্থ পর্যটনের পর নৈমিষারণ্যে মূলপতি শৌনকের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত-কথা শুনিয়াছিলেন। মূলপতির যজ্ঞে উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীর অনুরোধে তিনি মহাভারত প্রচার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিদ্যাপীঠটিও বিদ্যা-চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

পরীক্ষা সংস্কার

২

অধ্যাপক অনাথনাথ বসু

বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার একটা মস্ত বড় গলদ হইল যে, ইহা অনেকখানি পরিমাণে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে। অথচ যে পরীক্ষার উপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতামত নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে একই খাতায় একজন পরীক্ষক হয়তো দিলেন ২০ আর একজন দিলেন ৪০। এরূপ যে হয় তাহা কাল্পনিক নহে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বিচার সমিতি এবিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ও তাহার ফলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

পরীক্ষায় এই ধরণের গণ্ডগোল আরও বেশী হয় যদি পরীক্ষায় বহুতর প্রবন্ধাকারে উত্তর দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রশ্নগুলি যদি এমন হয় যে তাহাদের উত্তরে ছোটবড় নানা আকারের প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এখন একটি প্রবন্ধে বিষয়বস্তু ছাড়াও বিষয়-বিন্যাস, বাক্-ভঙ্গী ইত্যাদি নানা জিনিস থাকে। হয়তো বিষয়-বিন্যাসের ধারা আমার ভাল লাগিল, কিন্তু আর একজনের ভাল লাগিল না। আর বাক্‌ভঙ্গী ভাল লাগা না-লাগাতো ব্যক্তিগত রুচির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

এই সকল নানা কারণে একজন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের সঙ্গে আর একজন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের পার্থক্য ঘটা অনিবার্য হইয়া পড়ে। অবশ্য

প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া আর্দশ প্রণালীর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া নূতন বিধির ব্যবস্থা করিয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির এই ত্রুটি নিরাকরণ করার চেষ্টা অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দিনের পর দিন সর্বত্র শিক্ষকসমাজ বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে আরও সংস্কার করা প্রয়োজন এবিষয়ে একমত হইতেছেন।

এইখানে আজকাল পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন করা হয় তাহারও সমালোচনা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উত্তরটা যদি সীমাবদ্ধ করিয়া ঠিক কি উত্তর চাই তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া যাইত তাহা হইলে সে উত্তরের বিচার বেশ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারিত। যেমন অঙ্কের ক্ষেত্রে হয়; দুই আর দুইয়ের যোগফল আমি লিখিলেও চার হয়, তুমি লিখিলেও চার হয়। অতএব ইহার উত্তরে তুমি পাঁচ লিখিলে আমি সেটা অশুদ্ধ বলিয়া সহজেই ধরিয়া লইতে পারি।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে অঙ্কশাস্ত্রের উদাহরণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় পড়ানো ও পরীক্ষা করা হয় সেগুলির বেলায় এ উদাহরণ অনেকখানি অচল। সে সকল ক্ষেত্রে কি করা যাইবে?

আর একটা কথা, বলিবার লিখিবার ধরনটাও তো শিক্ষণীয় ব্যাপার। নিছক জ্ঞানের যাচাই না হয় ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন দিয়া করা গেল (এগুলিকে ইংরেজীতে objective test অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাপ্রশ্ন বলা হয়), কিন্তু বলিবার লিখিবার ধরনটা তো এভাবে যাচাই করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে কি করা যাইবে?

একটা কথা এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার, বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু সেখানে মানুষকে লইয়া কারবার সেখানে কোন পরীক্ষাই একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে না। তবে যদি পরীক্ষা-ব্যবস্থায় নানাদিক দিয়া নানাভাবে ছাত্রের বিকাশের যাচাই করিবার চেষ্টা হয় তবে তাহার ফল অনেক-খানি পরিমাণে নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। বস্তুত পরীক্ষা-সংস্কারের যে নানা চেষ্টা আজকাল হইতেছে তাহার অন্যতম লক্ষ্য পরীক্ষাকে বহুমুখী করিয়া তাহার পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর নির্ভরশীলতা যতটা সম্ভব কম করিয়া দেওয়া। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার বিধান যতখানি করা সম্ভব ততখানি করাও এই কর্মধারার অন্যতম।

এই সকল উপায়ে প্রচলিত বাহিরের ও ভিতরের পরীক্ষাবিধির যতটা সম্ভব সংস্কার করিলেও কিন্তু চলিবে না। পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পরীক্ষার বিস্তৃতি শিক্ষার সামগ্রিক বিস্তৃতির যতখানি সম্ভব অনুরূপ না করিলে চলিবে না; অর্থাৎ শিক্ষার ফলে যে বহুমুখীন বিকাশ আমরা ছাত্রদের মধ্যে পাইতে চাই সেই সকল প্রকারের বিচার পরীক্ষার দ্বারা করা পড়ে, তাহা না হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সমস্তটা সিদ্ধ হইবে না। শিক্ষার ফলে ছাত্রের জ্ঞানের বিকাশ হয়, মনের প্রতিভাসের পরিবর্তন ঘটে, কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় শুধু জ্ঞানের যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না, মনের প্রতিভাসের এবং কর্মকুশলতার, এক কথায় শিক্ষার্থীর সমগ্র চরিত্রেরও বিচার এই সঙ্গে চাই।

কিন্তু বাহিরের পরীক্ষক যিনি হয়তো বিদ্যার্থীর সাক্ষাৎ পরিচয় কোনদিনই পান না, তিনি কেমন করিয়া সে ধরনের বিচার করিবেন? সে বিচার করিতে পারেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ; তাঁহারা কাজেকর্মে আনন্দে উৎসবে ছাত্রকে লক্ষ্য করেন। খেলার মাঠে, শ্রেণীকক্ষে ও পরীক্ষার হলে বিদ্যালয়ের সর্বত্র তাহাকে খুব কাছে দেখিতে পান ও ফলে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। তাঁহারা যদি প্রতি ছাত্রের এই বিচিত্রমুখী বিকাশের হিসাব রাখেন ও নিজের কৃত যাচাই অন্য শিক্ষকের কৃত যাচাইয়ের সহিত মিলাইয়া সে যাচাই যতটা সম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে

বাহিরের ও ভিতরের এই দুই রকমের পরীক্ষার ফল মিলাইয়া আমরা হয়তো ছাত্রের যাচাই অনেক পরিমাণে ঠিক করিতে পারি।

এইজন্যই আজকাল বিদ্যালয়ে মূল রেকর্ড (school record) নামে এক নূতন ভাবের ছাত্রের বিকাশ নির্দেশ ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছে এবং এইজন্য নির্দেশপত্র বা কর্মও তৈয়ারি হইয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এগুলির ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দেশ ঠিকমত পালন করিলে যে বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থায় বড়রকম একটা সংস্কার হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ চেষ্টায় সকলে মিলিয়া ব্রতী হইতে হইবে, নতুবা কোন ফল হইবে না।

ছাত্রগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নির্দেশ করিয়া শিক্ষার যাচাই করিতে গেলে প্রথমটা হয়তো শিক্ষকদের কাজ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে শেষ পর্যন্ত তাহাদের কাজের ভার হয়তো কম হইবে না কিন্তু শিক্ষাদান ব্যবস্থা অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহাতে সমগ্র ব্যবস্থাই আনন্দময় হইয়া উঠিবে। আজ তো বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের পক্ষেই অর্থহীন বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে পেটও ভরে না মনও ভরে না। সুতরাং এই নূতন পথে অন্তত সেই চরম ব্যর্থতা হইতে খানিকটা মুক্তি পাওয়া যাইতেও পারে এইটাই কথা।

শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি

শ্রীঅমলা রায়

ভারতবর্ষ এখন নতুন সমাজ-রূপ নিতে চলেছে। শিল্পোন্নত গণতন্ত্র সমাজ। এই সমাজের শিক্ষা অনুরূপ চরিত্রেরই হবে তারই প্রত্যাশায়।

পৃথিবীতে শিল্পোন্নত দেশও আছে, গণতন্ত্র-পরিচালিত দেশও আছে। অতএব তাকে আর নতুন পথে পা বাড়াতে হবে না, অভিজ্ঞতা আহরণ করবে সে সেই সব দেশ থেকেই।

কিন্তু অভিজ্ঞতা পুঁথি পড়ে বা দেশ ঘুরে যদি নিই তবে অনুকরণ করাই হবে মাত্র। বিচার করে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করলেই সে অভিজ্ঞতা কল্যাণপ্রদ হয়।

মুসলিম-আমোদে সেই অভিজ্ঞতা লওয়ার চেষ্টা আছে। সেই আমোদে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের দুইজন শিক্ষাবিদ্ ও সভ্য ছিলেন। আর সভ্য ছিলেন, দিল্লী-হরিয়ানার রেখায় পশ্চিম ভারতের শিক্ষাব্রতী, অর্থাৎ ভারতের যে অঞ্চলটি শিল্পে উন্নত বলে দাবী করা হয়। এই আমোদের সভ্য নির্বাচন থেকেই মনে হয়, ভারতের শিক্ষা শিল্পোন্নত গণতন্ত্র সমাজ হিসাবে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকাকে আদর্শ করেছে।

প্রশ্ন হল, ভারতের সমাজ গঠনের সঙ্গে কি এই দেশ দুটির সমাজ-রূপের কোন মিল আছে? নতুন ভারতের আছে, পুরনো ভারতের নেই। কিন্তু পুরনো ভারতকে উপেক্ষা তো করাই যায় না, অধিকন্তু প্রাচীন ভারত অধিকাংশ ভারত-পল্লীতে এবং ভারতবাসীর অন্তরে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এ অবস্থায় নতুনের সমুখীন হতে যদি সামাজিক বিধা জন্মে তবে মুস্কিল সে বিধাকে কাটানো সহজ হত। কিন্তু এটি বিধা নয়, একটি প্রচণ্ড শক্তি নতুনকে নতুন হতেই দেবে না এমনি অবস্থা হবে।

স্বাধীন ভারতে যে দুটি প্রধান শিক্ষা-আয়োগ বসেছিল, তাতে এই দিকটি সম্পর্কে কোন দৃষ্টি দেখতে পাইনি, সমাজদৃষ্টি তো নয়ই। আয়োগগুলি গায়ের জোরে, প্রমাণের কসরতে আর শুভেচ্ছার শপথে নতুনকে ঘোষণা করেছেন মাত্র। এ শুধু ঘোষণা বলেই আজও সেই শুভেচ্ছা দ্বারে-দ্বারে ঘোষণা করতে হচ্ছে, কিন্তু দেশের লোকের অনাস্থা কাটানো গেল না, কেউ বলতে চায় না এটি নতুন উহা। এ বিপদ ঘটল কেন?

ঘটল তার প্রধান কারণ, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নতুন সমাজকে দেখা হয়নি। যদি দেখা হত তা হলে সঙ্কটে পড়ত।

শিল্পোন্নত গণতন্ত্র দেশ জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা আর জাপান; শিল্পোন্নত দেশ রাশিয়া এবং ডেনমার্ক। জার্মানীতে শিল্পোন্নতি ঘটেছে ইংল্যাণ্ডেরও আগে, কারিগরি শিক্ষায় সে হচ্ছে ইয়োরোপের শিক্ষাগুরু। ইংল্যাণ্ড আর জাপান শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশোপযোগী শিক্ষাবিধান নির্ণয় করেছে প্রায় একই সময়ে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। জাপানে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রায় ঐ সময় থেকেই আছে। আমেরিকা গণতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা করে তার শিল্পকারখানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে শিক্ষা প্রবর্তন করেছে দূরভিসারী ব্যক্তিকে অন্বেষণ করতে।

এই সব দেশের গণতন্ত্রের মূল সূত্রটি সেই প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে এক। বার্কার তাই বলেছিলেন, গ্রীসের গণতন্ত্র অর্থ সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়া, যাদের থেকে চাষী মজুর এবং মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয়, নতুন গণতন্ত্রে মেয়েদেরও গ্রহণ করা হয়েছে, অবজ্ঞাতদেরও চার পাঁচ বছরে একবার করে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, গণতন্ত্র দার্শনিক চিন্তা বা মন থেকে আসেনি, এসেছে রাজনীতি থেকে। রাজনীতি অর্থনীতির সঙ্গে কতখানি জড়িত জানিনা, তবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনায় যে নীতি নিয়ে রাজনীতি কাজ করে তা খুবই অধিকের। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সঙ্গে মনের প্রত্যয়ে যে পার্থক্য, রাজনীতির সমাজ-শাস্ত্রের সঙ্গে দর্শনের সমাজ-দৃষ্টির সেই তফাৎ। তাই ঐ দেশে শিল্পোন্নতি ঘটেছে, কিন্তু গণতন্ত্র ভেঙে গেছে। গণতন্ত্রের সমাজনীতি দার্শনিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্য কিছুতে নয়।

গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলেই, ঐ সব দেশে শিক্ষায় আজ নতুন সন্ধান এসেছে, কি করে ছাত্রদের সমাজী-করণ করা যায়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভাগ ক'রে কক্ষ-পাঠনায় বোধ হয় হবে; বোধ হয় রচনাগত পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে সুবিধা হয়; বোধ হয় উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে মননশক্তির বৈশদ্য দূর করতে পারলে হয়; বোধ হয় মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হয়; এমনি সব সন্ধান চলছে। ১৮৮১ সালের হাণ্টার পরিচালিত আয়োগ থেকে ১৯৫২-র আয়োগ শুধু এই একটি মাত্র দিকে নতুন সংযোজনা করলেন, তা হচ্ছে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার অসমাপ্ত সন্ধানকার্যকে নিশ্চিত রূপে সর্বসাধারণ পদ্ধতি বা 'ডাইনামিক মেথড' নামে পদ্ধতি-সমূহকে গ্রহণ করা। এতে অত্যন্ত আধুনিকও হওয়া গেল, আবার মনোবিজ্ঞানের সূত্রকেও উপস্থাপিত করা হল।

পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকই বেশি অপকার করেছে বলে জোয়াড্ সাহেব একবার উল্লেখ করেছিলেন। কি ভাবে অপকার তারা করে সে সম্পর্কে দার্শনিকোচিত অস্পষ্টতা ছিল। ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা স্পষ্ট করে

বলতে পারি, তারা অপকার করে প্রধানত নামকে 'বদনাম' দিয়ে। এই বদনাম দিয়েছে তারা 'ধর্ম'কে 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম' (Scientific Religion) বলে, ঈশ্বরকে 'ফোর্স' বলে 'দুর্নীতি'কে 'পলিটিকস' বলে। এবারও বদনাম দিল সম্পূর্ণ অব্যবহার্য একটি প্রক্রিয়াকে 'ডাইনামিক' বলে। অথচ কেনা স্বীকার করবে যে, পরিবর্তনশীল সমাজ আর পরিবর্তনশীল ছাত্রসমন এই দুটিকে নিয়ে কাজ করতে গেলে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ?

শিল্পোন্নত গণতন্ত্রের অগ্রগামী দেশ স্বার্থপরতা আর সমাজের ক্ষতিকর নীতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আজ শিক্ষায় আনতে চায় সহযোগিতা Cooperative spirit, পারস্পরিক সম্প্রীতি ; আর তার পদ্ধতি হল 'ওয়ার্কসপ মেথড'। যেন ওয়ার্কশপ বা কারখানায় কাজ করতে করতে মানুষ সহযোগী বা সহকর্মী হয়ে পড়ে, সম্প্রীতি বাড়ে। তা যদি বাড়ত তবে 'ট্রেড ইউনিয়ান' 'লেবার ইউনিয়ান' সেখানে গড়ত না যে সঙ্ঘের আদর্শ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করে তার সঙ্গে লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চয় করা, যে সঙ্ঘের আদর্শ নিজকে অর্থাৎ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্ঘের আদর্শ শিক্ষায় আনতে পারলেই ন্যাশানালস বাঁচবে বলে ধারণা বিকৃত সমাজসেবীর পক্ষেই সম্ভব।

এই বিকৃত সমাজ ভারতের পল্লীতে এখন এসে গেছে। সেইজন্য আমাদের নয়া ইস্কুলে ছাত্র একটি উত্তর-জীবনের যন্ত্র হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে, যাতে প্রাসাচ্ছাদন চলতে পারে। শিক্ষক এই যন্ত্রনির্মাণে শ্রমিক, আর রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিপতি বা মালিক। খাবী-খাওয়া তাই সুপ্রচুর, গন্ডগোল বাধছে অহরহ অর্থাৎ 'ডিসিপ্লিনের অভাব। কারণ শিক্ষা-আয়োগ ঘোষণা করলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে নতুন ভারতের উপযুক্ত নাগরিক করাতে, জীবন যাত্রার উপযোগী করায়।

নতুন ভারত দাঁড়িয়ে নেই, জীবনযাত্রা দাঁড়িয়ে থাকে না। গতিশীল শিক্ষা-আয়োগের ধৈর্য দেখে অবাক হতে হয়, বিস্ময়ে নয়, উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না বলেই। কল-দর্বস্ব মানুষের মন তৈরীর এ এক দর্শন হতে পারে, কিন্তু তেমন মানুষ কোনকালেও ভারতে অন্তত তৈরী করা যাবে না। ভারত কখনও 'লগ-কেবিনে' বাস করেছে কিনা তার সন্ধান সে নেয়নি। তবু যদি সেই রকমই তৈরী করবার উগ্র বাসনা থাকে তবে সে গরল পান করবার সাধ্য আজ আর নীলকণ্ঠের নেই, তা চারদিকের উৎপীড়ন-মূলক বিধানসভার সভ্যদের নীতি মালা পেতে নেওয়া থেকেই বোঝা যায়, একটা প্রচণ্ড অস্বাভাবিক এবং অশুভ দিন আসছে।

অশুভ দিক ওদেশে এসেছে। তাই ইংল্যাণ্ডে 'ইণ্ডিয়ান' বিতাড়ন পর্ব, অন্যত্র 'ভূ' বিদ্বেষ, আমেরিকায় নিগ্রো পীড়ন, চীনের অন্তর্যুদ্ধ সম্প্রদারণ, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাজার চাই, সেই বাজার পেতে হলে 'পৃথিবীর জাতিকে একমনা, (Worldmindedness) হলে চলবে না। বাজার চায় আজ রাশিয়াও। অর্থনীতিতে বলে, শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা কমে, রাজনীতিতে বলে, বেকার সমস্যা কমে রাষ্ট্র সম্প্রসারণের ফলে, মনোবিজ্ঞান আর সমাজদর্শন বলে বেকার সমস্যার সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের অঙ্গাঙ্গী যোগ। কোনটা ঠিক আমরা জানি না, তবে এটুকু জানি যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেই। কাজেই আয়োগ যদি ভেবে থাকেন, বেকার সমস্যার সমাধান হলেই, কাজকর্ম করতে পারলেই শিক্ষা সার্থক হল, জীবনের উপযোগী হল তা হলে সেই মতবাদকে কলুর বলদের মতবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

অর্থের উপর সমাজ বেশি নির্ভর করবে, অথচ অর্থ রোজগার করা অন্যায় বলা হবে, এমন ধার্মিকতা আধুনিক যুগে অচল। সেই কারণেই শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে গণতন্ত্রের দর্শনসম্মত শিক্ষা

অচল, এবং বুদ্ধিমান ও নিরক্ষর লোক এই ব্রহ্ম উপাসনায় বসতে চায়না। সে 'সোঽহং ব্রহ্ম' সাধনা করে গণতন্ত্রকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেবে।

এই সমস্যার মধ্য দিয়ে কি ভাবে শিক্ষা এগিয়ে নেওয়া যায়, জাতির চরিত্র গঠন করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে যাতে সমাজে কোন অশুভ দিক দেখা না দেয় তার প্রতিকার কে করতে পারে জানি না, তবে শিক্ষকেরা যে পারেন না একথা নিশ্চয়। কারণ, শিক্ষক ছাত্র আর অভিভাবক এখন আর কেবল ঐ মর্যাদাতেই নেই; তাঁরা যেমন আবেন, বাড়ী ভাড়ার দেনার ঘটনায় বসেন, পারমিটের জন্য ছুটাছুটি করেন, অর্থাৎ তাঁরা ভবিষ্যতের বিপথগামী বিপ্লবী। এই ভারতের কোথায় সেই মহাজীবন যা এই অশুভ দিক থেকে দেশকে টেনে টুলতে পারে? কার্লাইল সাহেব অনেক বীরের কথা বলেছিলেন কিন্তু একটি বীরের কথা উল্লেখ করেন নি: তা হচ্ছে 'তদ্‌বীর'। সবচেয়ে বড় বীর আজ তদ্‌বীর। এই তদ্‌বির আছে ইস্কুলের দালান তোলায়, তদ্‌বির আছে পুস্তক অনুমোদন করায়, তদ্‌বীর আছে পরীক্ষার নম্বর, বাড়াতে, তদ্‌বির আছে প্রশ্নপত্র কঠিন হলে 'হল থেকে না উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে আবেদন পেশ করায়। অর্থাৎ ইস্কুল বা বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপকারিতা আছে আর তা নির্ভর করছে তদ্বিরের উপর, টাকার উপর, পুস্তক ভালো কিনা নির্ভর করে তদ্‌বিরের উপর, শিক্ষক ভালো কিনা নির্ভর করে তদ্‌বির করার উপর, প্রশ্নপত্র ঠিক হয়েছে কিনা নির্ভর করে পরীক্ষার্থীদের অনুমোদনের উপর।

বিশ্লেষিত গণতন্ত্র সমাজের গোড়ীতে এই দুর্লক্ষণ অনেক আগে এসে গেছে, আমাদের এখন আসছে। হয়ত এখনও সময় আছে সমাধান করার, এর পর কিন্তু থাকবে না। তবে সেদিন আমরা অনেকেই হয়ত থাকব না, এই যা বাঁচোয়া।

কলা-শিক্ষা কেন ?

(শ্রীদেবী প্রসাদের হিন্দী পুস্তক 'বচ্চে' কী
কলা ঔর শিক্ষা' হইতে)

"অনুরাগ চাই, ধৈর্যও চাই, সাধনায় সিদ্ধিও চাই। কলা-চর্চা হইল সাধনা, সখ নয়।"—
আচার্য নন্দলাল বসু

শিক্ষার পরিকল্পনা অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া করিতে হয়। তাহার ভিত্তি প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর থাকা চাই। মানব সমাজের যে আদর্শ প্রস্তুত আছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিকে ঐ আদর্শের দিকে অগ্রসর করা, মানুষ সংস্কৃতির যে প্যাটার্ণ তৈয়ার করিতে চায়। শিক্ষা সেই পাটার্ণ নির্মাণ করে। আর ভিত্তি হইল, ব্যক্তি ও সমাজের গুণ-ধর্ম। আদর্শ যতই উচ্চ হউক, শিক্ষার প্রকার এই গুণ-ধর্মকে সামনে রাখিয়াই গড়িতে হইবে। ব্যক্তির গুণ-ধর্ম ভুলিয়া যদি তাহার শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করা হয়, তাহা হইলে উহা কাজের হইবে না ; কোনও মূর্তি যদি গড়িতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে যে মাধ্যমে গড়িতে হইবে তাহার চরিত্র বুঝিতে হইবে। যদি কাঠের মাধ্যম হয় তবে খোদাই দ্বারা, আর কাঁসার হইলে ঢালাইয়ের দ্বারা হইবে। এইভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ও মনুষ্য স্বভাব, দুই মিলাইয়াই করিতে হইবে।

আজ যেন একটা সাধারণ রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে. শিক্ষা লইয়া যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা বলেন, বালকের 'পূর্ণ বিকাশের' জন্য কলা শিক্ষা আবশ্যক। এরূপ শিক্ষাক্রমে আরও বিষয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু খুব অল্প শিক্ষকই ভাবিয়া দেখেন, কোন বিষয় দ্বারা কি কারণে বিকাশ হয়। যদি ভাবিয়াও দেখেন, তাহা হইলেও ভাসা-ভাসা করে দৃষ্টি দেন। ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, যখন হইতে শিক্ষার পরিকল্পনা বুঝিয়া সুঝিয়া করা হইতে লাগিল, তখন হইতে ঋষিগণ ও চিন্তাশীল লোকেরা শিক্ষার বিষয়, তাহা হইতে যাহা বিকাশ হইবে তাহার কথা ভাবিয়াই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। গণিত শিখাইবার অর্থ নয় যে তাহাতে ব্যবহারিক জীবনে লাভ হইবে, কারণ বেশির ভাগ লোকের ব্যবহারিক জীবনে উচ্চ গণিতের সিদ্ধান্ত হইতে কোনও কিছু কাজ হইবে না, তথাপি উহা ভাল শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ গণিত শিক্ষা হইতে এক বিশেষ মানসিক বিকাশ হয়, যাহা অন্য কোনও বিষয় শিখাইলে হয় না। কিন্তু যদি গণিত শিখাইলেও সে লাভ না হয় তাহা হইলে গণিতকে শিক্ষার স্থান দিবার কোনও অর্থ থাকে না। তাই শিক্ষককে ব্যবহারিক ও চারিত্রিক দুই দিক হইতেই খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

এইরূপে, কলা শিখাইবার অভিপ্রায় শুধু হাতের কাজে দক্ষতা অর্জন করা নয়, কিছু চিত্র অঙ্কন ও হাতে জিনিস গড়াই উহার দোষ নয়। কলা শিক্ষার পিছনে ব্যক্তির চরিত্র, তাহার সৌন্দর্য বোধ ও সামাজিক বোধ বিকাশ করার উদ্দেশ্য থাকে। কলা-শিক্ষার হাতের কাজ (কলা কৌশল) তো শুধু সাধনমাত্র, সাধ্য হইল গুণ বিকাশ। একথা মনে রাখিয়া আমরা জীবনে কলার মহত্ত্ব কি, ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

লৌকিক জীবনের সৌন্দর্য

সব চেয়ে গোড়ার কথা ও মূল কথা তো সকলেই বলে: 'কলার দ্বারা আমাদের জীবনে সৌন্দর্য নির্মাণ হয়' অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগাইবার জিনিসপত্র সুন্দর হয়, ইহা কলার একটা উদ্দেশ্য বা ধ্যেয়। যখন লোকে কোনও প্রাচীন সংস্কৃতির বিষয়ে কিছু বলে, তখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত বস্তুর ভিত্তিতেই বলে, যে অমুক সংস্কৃতি বা সভ্যতা উচ্চ কোটির ছিল, কি ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল, একথা মোহেঞ্জো-দড়োতে প্রাপ্ত বস্তুগুলির বুনিয়াদের উপরই বলা যাইতে পারে।

আজও বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যে সমস্ত বস্তু নির্মিত হয়, তাহা সুন্দর হউক, এই ভাবনার শিল্পীর সাহায্য লওয়া হয়। ইহার পশ্চাতে এই চেষ্টা থাকে যে আমরা যাহা কিছু গড়ি বা কাজে লাগাই তাহা যেন সুন্দর হয়। ইহা কলার কাজ। তাই যেখানে যেখানে জিনিসপত্র তৈয়ারি হয়, বড় বড় ফ্যাক্টরিতেই হউক আর কারিগরদের কর্মশালাতেই হউক, সেখানে সেখানে কলাকারদের যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই সব কলাকারদের কাজ হইল—কারিগরদের আকার, রং প্রভৃতি বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করা। জীবনে সৌন্দর্যের যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তাহা হইলে কলাশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যিক বা বাধ্যতা-মূলক হইয়া পড়ে।

কিন্তু আজ কি অবস্থা? ঘরে বাহিরে অফিসে কি অন্য কোথাও যে সব জিনিস আমরা ব্যবহার করি সেগুলি কি সুন্দর? দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, যে দেশের পরম্পরায় অত্যন্ত উচ্চস্তরের কলাপ্রবণতা ছিল, আজ সে দেশ একেবারে নীচ রুচির বস্তু দিয়া ছেয়া। যে কাপড় পরি তাহাই ধরা যাক। বস্ত্র-কলার কাহিনী লিখিলে সেখানে পট্টনের পটল, সম্বলপুরী, চন্দেরী, পৈঠনী, বালুচরী প্রভৃতির কথা ওঠে সেখানে আজ মেয়েরা ভয়েল, জর্জেট প্রভৃতি হালকা রুচির শাড়ি পরিয়া গর্ব অনুভব করে। যে দেশে কাঁসার উচ্চ কলার নিদর্শন তাহার বাসনে পাওয়া যাইত এবং এখনও পাওয়া যায়, সেখানে অ্যালুমিনিয়মের বাসনকে মনে করা হয় খুব ফ্যাশনের। কাঁসার বাসন যাহারা তৈয়ারি করে সেই বেচারি কারিগরেরা আধপেটা খাইয়া দিন যাপন করে। খুব ছোট ছোট জিনিস নিন; যেমন শিশুদের খেলনা। এমন দেশ খুব কমই আছে যাহার খেলনার পরম্পরা এত সমৃদ্ধ ও কলা-বিশিষ্ট। কিন্তু অবস্থা এই যে হাটে বাজারে প্লাস্টিকের খেলনার ছড়াছড়ি। যদি দেশী খেলনা বিক্রয়ের জন্য কোনও কারিগর ভুলক্রমে সেখানে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার খেলনার বোঝা আবার তাহাকে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া যাইতেই হয়।

এইরূপ হইয়া গিয়াছে আমাদের সমাজের রুচি। সুন্দর ও কুৎসিত বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখার শক্তি মোটেই পাওয়া যায় না। এমন লোকও আছেন যাঁহারা খুব টাকাকড়ি খরচ করিয়া বাড়িতে প্রাচীন কলার সুন্দর সুন্দর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া সমাজে বেশি সভ্য বলিয়া মনে পাইয়া থাকেন, কলার 'কনয়সিওর' বা অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের পরিচয়। কিন্তু তাই বলিয়া বলা চলে না যে জীবনে তাঁহারা যে সব বস্তু ব্যবহার করেন তাহা সত্যসত্যই সুন্দর; জীবনে লাবণ্য ও লালিত্যের কথা তো ছাড়িয়াই দিই।

কারণ কি? এ কথা আলোচনা করিবার পূর্বে এ বিষয়ে শিল্পগুরু নন্দলাল বসু কি লেখেন তাহা দেখি: "লোকে কলা-চর্চায় বিলাসী ও ধনী ব্যক্তির একমাত্র অধিকার মনে করিয়া উহা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা হইতে অবজ্ঞার সহিত নির্বাসিত করিয়া রাখিতে চায়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে সুন্দরই নিজের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার হইতে পারে না।

গরিব সাঁওতাল তাহার মাটির ঘর লেপিয়া মাটির বাসন আর ছেঁড়া কাপড়চোপড় সামলাইয়া রাখে, আর কলেজে পড়া বহু শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হস্টেল বা মেসের ঘরে দামী কাপড় ও জিনিসপত্র এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া অগোছাল করিয়া রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তাহার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও সজীব, ধনী-সন্তানের সৌন্দর্যবোধ লোক-দেখানো ও নির্জীব। শিল্প-উপাসনার নামে ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের চিত্র ফ্রেমে মুড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির ঘরে সত্যকারের ভালো চিত্রের পাশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাও দেখিতেছি। ছাত্রদের মধ্যে দেখিতেছি যে চিত্রের ফ্রেমের উপর আয়া ঝুলিতেছে, পড়িবার টেবিলে চায়ের পেয়ালা, আয়না, চিরুণী, আর কোকোর টিনে ফুল সাজানো আছে। বেশবিন্যাসে ধুতির উপর গলা-খোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি খুট-তোলা জুতা—সমগ্র সুষমার অভাব। আমাদের কাছে টাকা থাক আর না-ই থাক ইহা সৌন্দর্য-বোধের দৈন্য সূচিত করিতেছে।*

এই দৈন্যের কারণ কি? কারণ এই যে, জীবনের সঙ্গে কলার সমন্বয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সমন্বয় ভাঙিবার প্রধান কারণ আছে যন্ত্র-যুগের ভিতরেই। যন্ত্রযুগকে শুধু দোষ দেওয়ার কথা নয়, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে যন্ত্রযুগকেই কলা ও জীবনের এই বিচ্ছেদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যন্ত্রযুগে বস্তুনির্মাণের সাধন একেবারে বদলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিগত বস্তু কারিগরের নিজের হাতে তৈরি না হইয়া মেশিনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নির্মিত হইতে আরম্ভ করিল। মানুষের হাত লাগাইবার দরকারই থাকিল না; মাপ পরিমাণ প্রভৃতির এক একটি বস্তু অধিক সংখ্যায় গঠন করাই হইল উদ্দেশ্য। কিন্তু কারিগর যখন প্রত্যেক বস্তু নিজের হাতে গড়ে, তখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার সেই ক্ষণিকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এমন কি কুমোরের চাকে যে সব বাসন তৈয়ারি হয়, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে সেগুলি যতই এক রকমের দেখাক, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র।

যন্ত্রযুগ তো আসিল, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য-বোধের মানদণ্ড সেই হাতের কাজের উপরই থাকিয়া গেল। সাধনের হিসাব হইতে বদলাইতে স্বাভাবিক সময় লাগিবে। যন্ত্রযুগের এতখানি অভিজ্ঞতার পর আজ এই মানদণ্ড বদলাইয়া যাইতেছে। যন্ত্র তো বস্তু নির্মাণ করিয়াছে উপযোগিতার দিক দিয়া, কিন্তু হস্তকলার মানদণ্ডে ঐ ধরণকে সুন্দর করিয়া তোলা হইল। অর্থাৎ উপযোগিতা ও সৌন্দর্যের বিচ্ছেদ, যাহা যন্ত্রযুগেরও পূর্বেই জমিদারি ও বিলাস যুগে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা যন্ত্রযুগে আসিয়া একেবারেই স্পষ্ট হইয়া গেল। সমগ্র ইউরোপের এই অবস্থা ঘটিল।

কলার মধ্যে এক নূতন শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল।

কলার যে প্রয়োগে ব্যবহারের উপযোগী জিনিস নির্মাণ করা হয় না, তাহার নাম দেওয়া হইতে লাগিল 'ফাইন-আর্ট' বা ললিত কলা। ইহার মধ্যে চিত্রকলা, মূর্তিকলা, সংগীত, বাস্তুকলা আসে। যে কলার সাহায্যে উপযোগী বস্তু করা যায় তাহার নাম দেওয়া হইল 'অ্যাপ্লাইড আর্ট' বা উপযোগী কলা। ভারতবর্ষে প্রথম হইতেই কলার পৃথক শ্রেণীবিভাগ ছিল না। প্রাচীন শাস্ত্রে কলার কয়েকটি তালিকা পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থে চুরাশি কলার বিবরণ দেওয়া আছে, জৈনগ্রন্থে বাহাত্তরটির, আর বাৎস্যায়নে চৌষট্টি কলা। ইহা হইতে বোঝা যায়, কলার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে পারে না। তার চেয়ে বড় কথা—

* শিল্প-কথা (হিন্দী) ২৮ পৃঃ।

এই সব তালিকায় সঙ্গীত, নৃত্য, অলঙ্করণ, চুলোয়ের কাজ, সেলাই প্রভৃতি সমস্ত কলা একই তালিকায় একই স্তরে দেওয়া হইয়াছে। সেখানে কোনটি উচ্চ আর কোনটি নিম্ন স্থানের বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু মধ্যযুগে কলার যে মাত্র দুই বর্গ ইউরোপে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার কারণ প্রকৃত কলা ও জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ আসিল।

ইউরোপেও মধ্যযুগের পূর্বে কলার উদ্দেশ্য সর্বদা কোন না কোন উপযোগিতার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া ছিল, তা সে উপযোগিতা আধ্যাত্মিক, ধার্মিক অথবা ব্যবহারিক যাহাই হউক না কেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে কলার একমাত্র হেতু হইয়া দাঁড়াইল ধনী লোকদের মনোরঞ্জন। কলাকার শক্তিশালী হইলে তাহার ঝোঁক থাকিত এই কলার উপর, যাহাকে 'শুদ্ধ কলা'ও বলা হইত। যে শক্তি এ পর্যন্ত সর্বপ্রকার নির্মাণাত্মক কাজে লাগিত, তাহা চিত্র অঙ্কনের কাজেই হউক আর ব্যবহারের দ্রব্য গঠনেই হউক, সে শক্তি এখন কেবল ললিত কলায় লাগিয়া রহিল। কারিগরদের মধ্যে যাহাদের সৃজনী শক্তি ছিল, তাহারাও ধীরে ধীরে ললিত কলার দিকে যাইতে লাগিল। আর এই ভাবে নিত্য ব্যবহারের জিনিসেরও কলার স্তর ধীরে ধীরে নীচু হইয়া গেল। 'ফাইন আর্টে'র বিপরীত শব্দ গড়িয়া উঠিল, 'অ্যাপ্লাইড আর্ট'। হিন্দীতে ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে 'উপযোগী কলা' অনুবাদ ঠিক হয় নাই। 'অ্যাপ্লাইড আর্ট' শব্দের অনুবাদ করা কঠিন। যখন কোনও বস্তু সৌন্দর্যাত্মকতার হিসাবে নীচে হইবে, আর তাহা 'কলাত্মক' করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিবে, তখন উপর হইতে উহার উপর কলার প্রলেপ দিতে হইবে, অর্থাৎ 'অ্যাপ্লায়েড আর্ট' হইয়া যাইবে 'আর্ট অ্যাপ্লায়েড।' আজ তাহাই হইতেছে। বাজারে সেই জিনিসই কাটে, যাহা উপর হইতে খুব অলংকৃত; যাহার মধ্যে প্রকৃত কলার স্থানে হাতের কাজের কুশলতা বেশি দেখা যায়। তখন হইতে সেই জিনিসও সুন্দর লাগিতে লাগিল, যাহার শুধু আকার বা অলংকার-বর্জিতরূপ সুন্দর না হউক, যাহা কলার সৃষ্টি না হউক, শুধু অলংকারে ভরা। ইহাতে উভয় প্রকারে ক্ষতি হইতে লাগিল। এক, জীবনে যাহা ব্যবহার করিতে হয় এরূপ জিনিস প্রকৃত অর্থে সুন্দর রহিল না। দ্বিতীয়, উহা হইতেও ক্ষতি হইল এই যে সমাজ প্রকৃত কলাকারের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। কলাকারেরা শুধু ধনিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতে থাকিল।

ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল অন্যরূপ। কারণ এখানে যন্ত্রযুগের প্রভাব পরে আসে এবং ইউরোপকে নকল করিয়া আসে, এজন্য পুরানো ঐতিহ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। আজ তো সে ঐতিহ্য একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বাঁচিয়াছে তাহা দুই কারণে বাঁচিয়াছে। এক, আমাদের দেশ গ্রাম লইয়া; সমস্ত দেশ গরিব, তাই ভিতরে প্রবেশ করিতে যন্ত্রযুগের সময় লাগাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, প্রাচীন ঐতিহ্য এতখানি মজবুৎ ছিল যে তাহা সহজে ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। এদেশের সংস্কৃতির বুনিয়াদ এত গভীর ছিল যে আজকার যুগেও এমন অনেক কিছু আছে যাহা আধুনিকতম শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সময় সময় সঞ্চয় করিয়া রাখার পর অনুভব করে। পুরানো হাতের কাজের এখন অনেক জিনিস আছে যে আধুনিকতম 'ডিজাইনারেরা'ও তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে ইতস্তত করিবে। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক কলাপ্রবণতা এখন অবশেষে ক্ষীণ দশায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চালু শিক্ষাপ্রণালী প্রবল বেগে উহা লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং চেষ্টায় খুব সফলও হইতেছে। শিক্ষার 'প্রসার' যেরূপ গতিতে হইতেছে ও হইবে, সেই গতি অনুসারে আমাদের জীবনের পরম্পরাগত সৌন্দর্য শেষ হইয়া যাইবে—কাজের বস্তু কুৎসিত হইয়া যাইবে। তাজাচোরা

সব কিছু যাহা সংগ্রহালয়ে স্থান পাইতেছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মানুষ যাহা গড়ে তাহা যাহাতে সুন্দর হয়, সে জন্য সর্বপ্রথমে চাই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুন্দর জিনিস বাছিবার বিবেকবুদ্ধি। প্রাচীন যুগে ইহা ছিল সহজ। কারণ পরম্পরার জন্য মানুষ বাছিতে জানিত এবং এই শিক্ষা সমাজের শিক্ষণ পদ্ধতিরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অন্যতম কারণ ছিল যে, যে সব জিনিস পাওয়া যাইত তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্থানীয়। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কারিগরকে ভাল করিয়াই জানিত। কলা, কলাকার ও গ্রাহকের আত্মীয়তার জন্য কলাবোধের শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হইত। কিন্তু আজ যখন কলাবোধে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যেকের সম্মুখে সারা পৃথিবীর জিনিসপত্র উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ঠিক ঠিক বাছিবার শক্তি অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব। ইহা তখনই সম্ভব হইবে, যখন শিক্ষায় সুন্দর অসুন্দর চিনিবার শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা রচিত হইবে।

কলাবোধ কি করিয়া হইবে, একথা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখানে বস্তুর নির্মাণে যাহা প্রথম প্রয়োজন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কোনও কারিগর যখন কিছু গড়িতে চায় তখন হয় তাহা পুরাতন চালের মত করিয়া সে গড়িবে, আর নয় তো যদি নূতন কিছু গড়িতে চায় তো নূতন ধরণে তাহা নির্মাণ করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইল, নূতন ধরণের নির্মাণ লইয়া। প্রত্যেক কারিগর বা কলাকার একেবারে নূতন আকারের কিছু নির্মাণ করিতে পারে না। একেবারে মৌলিক সৃষ্টি দিয়া নবীন ধরনের নির্মাণ করিবে যে কলাকার প্রত্যেক যুগে তেমন এক আধ জনই হয়। কিন্তু মানুষের নবীনতার ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার নূতন নূতন ধরনে গড়িবার শক্তি ভালো রকমের শিক্ষণের দ্বারা অর্জন করা যায়। ইহার একটা উপায় এই যে অন্যান্য দেশ ও প্রদেশের ভাল ভাল বস্তুর বুনিয়াদের উপর শিল্পের নূতন ধরন গড়া। ইহাতে সৌন্দর্য-বোধও জন্মিবে, নবীনতার উন্মেষও হইবে।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে আমাদের পরম্পরা রক্ষার ব্যাপারে যে বারবার ওকালতি করিতেছি তাহাতে কেহ যেন ভুল না বোঝেন। আমরা একথা মোটেই মানি না যে আজও পুরানো আকার ও ধরণ টানিয়া বুনিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, নূতন ডিজাইন তৈরী করিব না। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলার আকার, প্যাটার্ন ইত্যাদিরও পরিবর্তন হইবে। কিন্তু ইহা অতি সাধারণ কথা যে একটা সত্য সত্য সুন্দর বস্তু যাহা যেমন উপযোগী তেমন পুরানো, তাহা পুরানো বলিয়া গ্রহণ করিব না, একথা বলা মূর্খতা। কলাবোধের অভাবেই লোকে এরূপ মনে করে। যদি সত্য সত্য নূতন রূপ আবিষ্কার করিতে হয় তবে কলাকারকে পরম্পরাগত কলা ও প্রকৃতি উভয়ই গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। আজ পর্যন্ত কলাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ কৃতি হইয়াছে, তাহা এই গভীর অধ্যয়নের ফল। তাই সমাজে ব্যক্তিদের সৃজনী শক্তি বিকাশ করিবার জন্য দুইটিরই উপলব্ধি হওয়া চাই—পরম্পরাগত কলা ও প্রকৃতি।

কলাকার সন্তানের পদ্ধতি শেখে পরম্পরা হইতে আর সাধনার বস্তু পায় প্রকৃতি হইতে। প্রকৃতির মধ্যে কলার ব্যাকরণ ও গণিত যাহা কিছু লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধান করা হইল কলাকারের কাজ। এই কাজ জাতশিল্পীই করিতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমরা শিল্পী ও হস্তশিল্পী 'ফাইন আর্ট' ও 'অ্যাপ্লাইড আর্ট' (ললিত কলা ও উপযোগী

করা) এই দুইয়ে প্রভেদ রাখিতে চাই না, তাই প্রত্যেক হস্তশিল্পীকে, তিনি উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর শিল্পী নাই হউন, শিক্ষা শিল্প গঠন করিবার কাজ শিল্পীকেই হইবে।

এরূপ বাস্তবরূপ রচনা করিবার দায়িত্ব শুধু শিক্ষাই গ্রহণ করিতে পারে। এই শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হউক। কলাকার ও হস্তশিল্পী সৃষ্টি করিবার পথের সঙ্গে সকলের পরিচয় থাকুক, প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকুক। এ কাজ শিক্ষাকে করিতে হইবে। কলার এই যে উদ্দেশ্য, জীবনে ব্যবহার করিবার বস্তু সুন্দর হউক, ইহা শুধু শিক্ষার দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে ; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রভার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে ; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয় মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।

—রবীন্দ্রনাথ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্মতিং ভাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৬৬ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

ছাত্রদের অসংযত আচরণ

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির আসন হইতে বলিয়াছেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা সংযত আচরণ করিতে শিখিবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে সমস্যা ও সমাধান হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হইতে ছাত্র-বুদ্ধিনয়ের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটিও নিযুক্ত করিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি আশা করেন যে কমিশন উপযুক্ত প্রতিকারের কথাও নিশ্চয় বলিতে পারিবেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচিত ছাত্রদের পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলা যে, ছাত্রদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয় সহানুভূতির দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাদের অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টাও সঙ্গতভাবে করিবেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয় দেখানো কোনমতেই তাঁহারা সহ্য করিবেন না।"

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে উপাচার্য সিদ্ধান্ত

গত জবলপুর নিখিল ভারত শিক্ষাসম্মেলনে সভাপতির আসন হইতে উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শনের জন্য এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সত্যই তো, যদি আমরা শুধু গান্ধীজীর শিক্ষার কাঠামোটি ধরিয়া থাকি, গতিহীন প্রাণহীন পরিকল্পনাই শিক্ষা-বিস্তারের চরম কথা বলিয়া মনে করি, তাহাতে যে আমাদের মূর্খতা শুধুই প্রকাশ পাইবে তাহা নয়, অগণিত ভবিষ্যজনের সমূহ ক্ষতি করা হইবে।

তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, শিক্ষায় হাতের কাজ কি শুধু সাধন, না সাধ্য? যাহাকে আমরা "অ্যাকাডেমিক" শিক্ষা বলি, তাহা কি গৌণ? হাতের কাজ কি শিক্ষাবৃত্তের কেন্দ্র, না পরিধি? ডিউই-য়ের উদ্ভাবিত শিক্ষা হইতে কি ইহার আমূল পার্থক্য আছে? লক্ষ লক্ষ কারিগর ছুতার তন্তুবায় কৃষক—ইহাদের উপরই কি পূর্বের মত দেশের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করিবে? গান্ধীজী সমাজকে

যে ভাবে গড়িতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরে এই কয় বৎসরের মধ্যেও কি সেই আদর্শ তেমনই আছে? আধুনিক কলকব্জা সম্বন্ধে গণতন্ত্রের ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে হইবে, বিচ্ছিন্ন না হইয়া সমবায় পদ্ধতিতে তাহাকে বাড়িতে দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, পাঠ্যপুস্তক কি বর্জন করিতেই হইবে? সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিয়াছেন, খারাপ পাঠ্যপুস্তক বর্জন করুন কিন্তু ভাল পাঠ্যপুস্তকের গুণের বিষয়ে অন্ধ হইলে চলিবে না। প্রাথমিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা হইতে যুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি বিযুক্ত রাখা কি সমীচীন হইবে? এই আসল উদ্দেশ্য তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষার সাধন করেসগত করা—the ability to use the mother tongue, the ability to measure, to master quantities, the ability to understand the past life in one's own country, the laws and rules of nature, the properties of material objects: মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা, পরিমাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, পরিমাপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা, দেশের অতীত জীবন বুঝিতে পারার ক্ষমতা, প্রকৃতির আইন-কানুন ও জড়বস্তুর গুণাবলীর জ্ঞান। এসব কি শুধু মামুলি বিদ্যালয়ে শেখানো হইবে, যুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নয়?

সিদ্ধান্ত মহাশয় শিক্ষার মূল আদর্শের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যুনিয়াদি বিদ্যালয় এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে চায় কি না সে প্রশ্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কোথায় আজ গান্ধীজী-পরিকল্পিত যুনিয়াদি বিদ্যালয়? তাহার সংখ্যাই বা কত? যাহা হউক, সিদ্ধান্ত মহাশয়ের দৃষ্টিতে যুনিয়াদি শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যই হিতকর হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত পটবর্ধনের সমালোচনা

জবলপুরে নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া মধ্যপ্রদেশের গভর্নর শ্রীযুক্ত পটবর্ধন বলিয়াছেন, আমাদের যুবক ছাত্রেরা তো অনেকটা আমাদেরই ছায়া। Our youngmen to a large extent are our own reflections. সুতরাং যদি আমরা তাহাদের শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকি আর নিজেরা স্বাধীন গণতন্ত্রে যেমন আচরণ করা উচিত তেমন না করি, তাহা হইলে আমাদের উপদেশে তেমন কোনও ফল দিবে না। নীতিবাক্য বলা অপেক্ষা আচরণ দিয়া শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই ভাল। সুতরাং আমাদের জাতীয় স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আমাদের নিত্য কর্ম-পদ্ধতি স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। যদি আমরা চাই যে আমাদের ছাত্রেরা ধর্মঘট না করে, ভিন্ন-মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু না হয়, তাহারা নিজেরা যে সব নিয়ম করিয়াছে তাহা পালন করিয়া চলে, তাহা হইলে আমাদের নিজেদের সকল কাজে কর্মনীতিকে অনুরূপ ভাবে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পটবর্ধনের এই সতর্কবাণী উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিক্ষকের ভূমিকা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সমাজ-জীবনকে চলমান রাখতে হলে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামানবের নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য। শতাব্দীর প্রবিভগণ। ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবী (Arnold J. Toynbee) A Study of History-তে মানবসভ্যতার বিকাশের মূলে Individual initiative-এর এই vital importance-কে স্বীকার করেছেন। বিধাতাপুরুষ যখন একটা জাতির ঝিমিয়ে-পড়া জীবনকে প্রাণ-চঞ্চল করে তুলতে চান তখন সেই জাতির মধ্যে তিনি পাঠিয়ে দেন মহামানবের পর মহামানব। প্রতিভাসম্পন্ন মানবেরা কখনো-সখনো সব জাতির মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এমন অভিশপ্ত ভূমি কোথায় আছে যেখানে কালেভদ্রে কোন না কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি? কিন্তু একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে উদ্যত এবং জাগ্রত করবার জন্যে দরকার মহামানবদের উপর্যুপরি আবির্ভাব। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌সের ভাষায় Blow must follow blow so fast that no cooling can occur in the intervals. কামার তপ্ত লৌহখণ্ডকে একটা বিশেষ রূপ দেবার জন্যে আঘাতের পর আঘাত হানে; লোহাকে জুড়িয়ে যাবার অবকাশই দেয় না। কোন অধঃপতিত জাতির জীর্ণ জীবনে নবজন্মের রঙ ধরানোর জন্যেও বিধাতাপুরুষ কামারেরই মতো তার মধ্যে প্রেরণ করেন একসঙ্গে অনেকগুলি মহামানব। এঁরা যেন পরামর্শ ক'রে দলবেঁধে আসেন। এলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গে নিয়ে এলেন বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দকে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল তাঁর ভাবধারাকে কর্মে রূপ দিতে, বাস্তবে মূর্ত করে তুলতে। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ গান্ধী—এঁরা তিনজনেই রমাঁ রঁলার মতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পতাকাবাহী। বিংশ শতাব্দীর তরুণ ভারতবর্ষের জন্য রামকৃষ্ণের আত্মা থেকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে চলেছে তার চিন্তাধারা এবং কর্মধারা। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিন পাল, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র এদেরই বা ভুললে চলবে কেন? এতগুলি প্রতিভার প্রায় একই সঙ্গে অভ্যুদয় না হলে নতুন ভারতবর্ষের জন্ম কেমন করে সম্ভব হোতো?

জাতির সমস্ত প্রাণ-চঞ্চলতার মূলে স্বজনহারী কতিপয় অভিমানবের গগনস্পর্শী প্রতিভার দান। 'দেবতার দীপ হস্তে' রুদ্র দূতেরা আসেন পৃথিবীতে, কণ্ঠে নবযুগের বাণী নিয়ে। টয়েনবী (Toynbee) এঁদের বলেছেন creative individuals যুগস্থ জনসাধারণকে এঁরা ডাক দিয়ে বলেন,

'তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
শুধু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে সত্যিকা জীবন
জাগোরে সকল দেশ।'

এঁদের গরিমাময় ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক স্পর্শে জড়প্রায় জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে স্বদেশ-প্রেমের আদর্শে। তাদের মধ্যে জেগে ওঠে স্বাধীনতার জন্যে অদম্য স্পৃহা, জেগে ওঠে সুতীব্র মর্যাদাবোধ। এমন কি, যে চাষী বাঁশঝাড়ের ছায়ায় লাঙল-বলদ আর কেত-খামার নিয়ে বিভোর ছিল, সহসা সেও অনুভব করে হৃদয়ের গভীরে একটা বৃহত্তর জগতের ডাক, অনুভব করে সমস্ত জাতির সেও একজন। তখন সুপ্ত-সম্পদ মাধুর্যময়ের

বন্ধন ছিঁড়ে জাতির মুক্তি-সংগ্রামে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অকুণ্ঠচিত্তে মৃত্যুকে করে বরণ, বুকের তাজা রক্তে ভিজিয়ে দেয় দেশের মাটি। সহস্র সহস্র অখ্যাতনামা এইরূপ বীরের মৃত্যু থেকেই তো যুগে যুগে দেশে দেশে এসেছে নবজীবনের প্রবাহ।

শিক্ষকেরা এই Creative minority র পর্যায়ে পড়েন। তাঁদের কাজ, সেরা সেরা মানুষ তৈরী করা। সেরা সেরা মানুষ তৈরী করতে পারলে তবেই তো 'ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' মার্কিন কবি হুইটম্যানের সেই মূল্যবান বাণী ; Produce great persons, the rest follows.

একজন মানুষ মহৎ হবে, না ক্ষুদ্রচেতা হবে, তা মূলত নির্ভর করে, কি রকমের আদর্শকে সে মনের মধ্যে লালন করছে। ছাত্রদের অন্তরের মণিকোঠায় যদি মহান আদর্শগুলির দীপশিখা জালিয়ে রাখতে পারি, তার জীবনও মহৎ হ'য়ে উঠবে। তাই শিক্ষকদের জীবনব্রত হওয়া উচিত ছাত্রদের চিত্ত-ভূমিতে মহান আদর্শের বীজ বপন করে দেওয়া। আর এই বিষয়ে তাঁদের সবচেয়ে বেশী ক'রে সাহায্য করতে পারে সেরা সেরা সাহিত্যিকদের বই। ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিন্সন ক্রুসো' ইংরেজ বালকদের দিগ্বিজয়ের পথে বাহির হতে কি পরিমাণে সাহায্য করেছে তার হিসাব গণিতশাস্ত্রের দ্বারা নির্ধারণ করা কি কোনকালে সম্ভব? ইংরেজ রাস্কিন যখন Unto This Last লিখেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন দক্ষিণ আফ্রিকার এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার রেলগাড়ীতে সারারাত জেগে সেই বই পড়বেন আর সেই অধ্যয়ন তাঁর সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত ক'রে দেবে? আইস্-ডিয়ার অভিযান পাহাড় পর্বত সমুদ্র মরু কোন কিছুরই পরোয়া করে না। মার্কিন দেশের থোরো, রাশিয়ার টলষ্টয় এই দুইজনও গান্ধীর মনের জীবনকে গ'ড়ে তুলতে কম সাহায্য করেননি।

ছাত্রদের মনে একটা বৃহৎ আদর্শের প্রতি অনুরাগ জাগাতে, বোধের, কাব্যের স্থান সকলের উর্ধ্বে। প্লেটোর শিক্ষার আদর্শ মনের জীবনকে গড়ে তোলার কাজে কাব্যকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। কাব্য এবং সঙ্গীত আমাদের চিত্তের এমন সব সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত করে যেখানে আর কারও পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আর যৌবনই কাব্যপাঠের প্রশস্ত সময়। যৌবনে যে কাব্য-লক্ষ্মীকে হৃদয়ে স্থান দিলো না পরবর্তী জীবনে তার পক্ষে কাব্যে অনুরাগী হওয়া সুকঠিন।

কিন্তু যে শিক্ষক মর্মের মধ্যে কখনো অনুভব করেননি একটা বিরাট আদর্শের আহ্বান তিনি কেমন ক'রে ছাত্রদের মনের মধ্যে মহান আদর্শ-গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন?

এই জন্যেই যে-শিক্ষক রক্তের মধ্যে কখনো অনুভব করেননি একটা বৃহৎ আদর্শের বেদীমূলে জীবনকে উজাড় ক'রে সঁপে দেবার প্রেরণা, তাঁর পক্ষে শিক্ষকের কাজ করা একটা বিড়ম্বনা। পাড়াগাঁয়ে আছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা কোন্ পথ ধরে চলছে দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। 'বেসিক' ইস্কুলগুলি নামেই বেসিক। কোথায় চরকার গুঞ্জন? কোথায় উদ্যানরচনার সফল উদ্যম? শিক্ষকদের জীবনে কোথায় ছাত্রদের জন্যে সকল-ভোলানো প্রীতি? বিদ্যালয়ে মাস্টারের কাজ করা যেন দিনগত পাপক্ষয়। মনের মধ্যে একটা নিদারুণ হতাশার ভাব! জীবনটা শিক্ষকতার কাজে বৃথাই গেল! না হোলো বাড়ী, না হোলো গাড়ী, না হোলো অর্থসঞ্চয়!

দেখে শুনে মনে হয়, কোথাও আশার কোন আলো নেই! শিক্ষকের পদপ্রান্তেই তো জ্ঞানের প্রথম আলো। আর জ্ঞানই তো অন্ধকারের গর্ভ থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে আলো-ঝলমলো প্রভাতের গরিমাকে। শিক্ষক যদি আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন, তিনি যদি ভাগ্য-

বেদীদের বলে নাম লেখানে, তবে পড়ুয়াদের কাছ থেকে আমরা কি রকমের জীবন আশা করতে পারি? লবণ যদি তার লবণত্ব হারিয়ে ফেলে, নুন যদি আলুনি হয়ে যায়, তবে আর আশা কোথায়? যীশুখ্রীষ্টের সেই কথা: Salt is good but if the salt have lost its saltness wherewith will ye season it? Have salt in yourselves and have peace one with another. শিক্ষক যদি শিক্ষাব্রতীর ধর্ম হারিয়ে ফেলেন, মনে রাখতে হবে, আর কোন আশা নেই। নরকের দরজায় লেখা আছে: Abandon all hope ye that enter here.

জগতে যত মহৎ আছে,
হইবে সত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
সবার দ্বারে দ্বারে।

শ্রীঅরবিন্দ ও মানসিক শিক্ষা

শ্রীমতী বকুলমালা সেন

ইতিপূর্বে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সম্বন্ধে দুই তিনটেই প্রবন্ধ 'শিক্ষা'য় প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং পূর্ব-পরিচিতির প্রয়োজন আর নাই বলেই আমার মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকে পঞ্চধারায় বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে দেহের ও প্রাণের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আজ তাঁর মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলবার বাসনা।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিগুলিতে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে প্রধান স্থান দেওয়া হয় মানসিক শিক্ষাকে। বস্তুত মানসিক শিক্ষাকেই আমরা সাধারণত প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করি। যেখানে পুঁথিগত জ্ঞানের বিষয় জানানোর সঙ্গে মানসিক গঠনের দিকেও নজর রাখা হয়, সেই শিক্ষাকেই আদর্শ শিক্ষা বলে আমরা মেনে নিই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আদর্শ শিক্ষা অনুসরণকারী শিক্ষকগণও যেভাবে মানসিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তা উপযুক্ত বা যথেষ্ট নয়। শিক্ষার নামে আমরা কতকগুলো বিধি-নিষেধের বোঝা শিশুর মাথায় চাপিয়ে দেই। তার ফলে তাদের পরিস্ফুট হয়ে ওঠার সহায়তা না হয়ে অনেক সময় বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার সুচিন্তিত শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ফলে সুফল লাভ যদি বা ঘটে, তা এইটুকু মাত্র যে শিশুর মস্তিষ্কের এক রকমের ব্যায়াম হয় শুধু, তার নমনীয়তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সে সকল পন্থায় এইটুকু মাত্র সুফল লাভই আমরা করতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ মানসিক শিক্ষাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই শিক্ষাগুলি সাধারণত পর পর দেওয়া চলে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে আগে পরে অথবা এক সঙ্গেও চলতে পারে। কোন্ রীতি গ্রহণীয়—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর তা নির্ভর করে। মানসিক শিক্ষার প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা সর্বপ্রথমে মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টার কথা বলবো। এই শক্তি অর্জন করার দিকেই প্রথম নজর দিতে হবে, কারণ এইটিই সবার আগে দরকার। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীভূত মনকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ক্রমশ বেশী সময় সংযুক্ত রাখার অভ্যাস করানোরও প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি, শিশুর মন এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় সর্বদা। কিন্তু যদি তার মনে কৌতূহল জাগিয়ে দিতে পারা যায় তাহলে তাকে এক বিষয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট করে রাখাও অসম্ভব হয় না। নিবিষ্ট রাখার সময়কে নানা কৌশলে বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পুরস্কার বা প্রশংসা বাক্য ইত্যাদির প্রলোভন এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু সব থেকে যোগ্য পন্থা হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া এবং বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রেরণা দেওয়া। কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে জানার আগ্রহ যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে সে অনিচ্ছা ভাবে যে কোন বিষয়ের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে, তার থেকেই জ্ঞান অর্জন করার প্রেরণা পাবে।

কিন্তু এটুকু হলেই শুধু চলবে না। জ্ঞান অর্জন করার স্পৃহাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্মরণ শক্তি ও নির্ভুল অনুলিখন শক্তিও মার্জিত করে তুলতে হবে। পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়াতে

হলে শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানা দরকার। কিসে তার রুচি, কোন বিষয়ে তার মন আকর্ষিত হয় জেনে নিয়ে সেইরূপ বস্তুর সংস্পর্শে নিয়ে গেলে আগ্রহ তার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাবে, আর এই অনুসন্ধিৎসাই পর্যবেক্ষণের শক্তি বাড়িয়ে তুলবে। স্মরণশক্তি বাড়ানোর এবং সেজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন মেধা, ধারণা শক্তি, বাড়ানো। সবার মূলে থাকা চাই আগ্রহ। আগ্রহ যত তীব্র হবে, জ্ঞানার্জনের শক্তিও তত বাড়বে। শিশুর মনের স্বাভাবিক আগ্রহকে ক্রমশ বেশী উদ্দীপ্ত করে তোলার সর্বাপেক্ষা সহজ ও কার্যকরী পন্থা তার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। শিশুর মনে অবিরাম যে সব প্রশ্ন জাগে, তার প্রত্যেকটির উত্তর যদি না দেওয়া হয়, তার জানার আগ্রহের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় সেখানেই। শিশুর সঙ্গে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সর্বদা এবিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

এর পরে আমাদের চেষ্টা করতে হবে মনকে বিস্তৃত ব্যাপ্ত ও নানা ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলতে। শিশুর অগণিত প্রশ্নের সমাধানের পথ ধরে তার মনকে বিস্তৃততর করে তোলা যেতে পারে। একটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় সম্বন্ধে শিশুর যে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে পরিপুষ্ট করে তার মনকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার একই বিষয়কে কত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, সে বিষয়ে তার চিন্তাকে সঞ্চালিত করতে সাহায্য করে তার মনের ব্যাপ্তি ও প্রসারতাও বাড়িয়ে তোলা চলে। এইভাবে শিক্ষিত যে মন, সেই মন বুঝতে পারে মানসিক সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নয়। জ্ঞানের আলো সে মানস-লোকের উর্ধ্বে তা একটু একটু করে তার কাছে প্রতিভাত হতে সুরু করে এবং তখন সে সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিষয়বৈচিত্র্য-সম্পন্ন পাঠ্যতালিকা গঠনের দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ এই বৈচিত্র্যই মনকে নানা পুষ্পপল্লবে সুশোভিত করে তুলতে সাহায্য করবে।

কিন্তু এসব শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করে প্রয়োগ করার ক্ষমতা না জন্মে। সেজন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

আমাদের জানা থাকা দরকার আমাদের মানসিক ক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। একটি ক্রিয়ায় জ্ঞান অর্জন করা হয়, অপর ক্রিয়ার দ্বারা করা হয় সৃষ্টি। আমরা শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণত জ্ঞান অর্জন ক্রিয়াবলীর সঙ্গেই বেশী পরিচিত হই এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টা সেখানেই কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সৃষ্টিমূলক কার্যাবলী যাকে নিছক বৃত্তি বলা যায়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষিত হয় না। শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যাদের জীবনের লক্ষ্য, তাদের এদিকে তত মনোযোগ না দিলেও চলতে পারে। কিন্তু যারা জ্ঞান অর্জন করে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাদের প্রথমাবধিই মানস ক্রিয়ার এইদিকটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

আমরা যখন শুধু জ্ঞান অর্জন করার জন্যই জ্ঞান অর্জন করি, তখন যত কিছু এবং যা কিছু আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, সে সব নির্বিচারে গ্রহণ করে যাওয়াই হবে শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ, কিন্তু একমাত্র কাজ নয়। কারণ একে একমাত্র কাজ বলে করলে কতকগুলো বিশৃঙ্খল চিন্তার বিচরণ-ক্ষেত্র হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মন ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণান্তে জ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে হবে সর্ব প্রযত্নে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে যে বিষয়গুলিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়, তাদেরও পরস্পরের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। চিন্তার বিস্তৃতি ও উদ্ভাবণের ফলে এই সামঞ্জস্য আনা

অসম্ভব নয়। এই ভাবে মুলমন্ত্রের চিন্তাগুলিকে মূলনক্ষ্য শক্তিতে পরিণত করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হবে একটি সুনির্ধারিত লক্ষ্য। অতি যত্নে এই লক্ষ্য নির্বাচন করতে হবে। চিন্তার—বোধের—সমগ্র ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে অনুধাবন করে আবিষ্কার করতে হবে সেই বস্তু, যা আমাকে সার্থক করে তুলতে পারবে।

এর পর আমরা পরবর্তী স্তরের কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারি। এখন আমাদের কাজ হবে ঐ অর্জিত ও সুনির্বাচিত চিন্তা ও ভাব রাশিকে এই কেন্দ্রস্থিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া, একটি একটি করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা কোনটি তার প্রয়োজন আর কোনটি অনাবশ্যক। দেখতে হবে, যেখানে প্রয়োজনীয় আর যেসব তার সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য অথবা অন্য কোন পূরণের জন্য এই সমার্জিত বস্তুটির কোন আবশ্যকতা আছে কি না। যদি থাকে, সেই ভাব ভাণ্ডারে তার স্থান হবে, যদি না থাকে, তাকে বিসর্জন দিতে হবে। অনাবশ্যক বোঝা দিয়ে মানস-ভাণ্ডার ভারি করলে শুধু কাজে বিঘ্নতাই সৃষ্টি হবে ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না।

সুতরাং শিক্ষাকে সৃষ্টিক্ষম শক্তিতে পরিণত করতে হলে লক্ষ্য স্থির করা আগে প্রয়োজন। তারপর প্রয়োজন, চিন্তা ও ভাব রাশিকে নির্বাচন করতে পারার ক্ষমতা অর্জন। একবার যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে বস্তু তাকে বেছে নিতে এবং অপ্রয়োজনীয়কে বিসর্জন দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করতে পারি, প্রতি কাজের মধ্যেই এর সুফল আমরা অনুভব করতে পারবো। যে কাজে যখন লিপ্ত থাকবো, তখন সেই কাজের জন্য আবশ্যক যে সব চিন্তা, তা ছাড়া অন্য চিন্তা মনের বহিশ্চেতনায় নিজেদের সক্রিয় করে তুলতে পারবে না। এই পথ ধরেই আমরা আরও অগ্রসর হতে পারি এবং মনকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্তও করে তুলতে পারি। সেই স্থির নিস্তব্ধ মনের তখন ঊর্দ্ধতর মানস-লোকের সঙ্গে সংযোগ ঘটে এবং সেখানকার আলোক দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে।

ঊর্দ্ধতর মানস-লোক সম্বন্ধে যদি আমরা কিছু আলোচনা করতে না চাই, তবু এটুকু বলা চলে যে ঐরূপ মানসিক বিস্তব্ধতা লাভ ঘটলে তার ভিতর দিয়েই হয় মানসিক বিশ্রাম। সকল ইন্দ্রিয়ের মত মনেরও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঘুমের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জাগ্রত সচেতনতা হতে মুক্ত হয়ে মন ঘুমের মধ্যে আরও বেশী দাগাবিমুক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মানসিক কাজের বৈচিত্র্য সম্পাদন মনকে বিশ্রাম দেওয়ার একটি বিশেষ পন্থা বটে, কিন্তু মনকে নিস্তব্ধ করতে পারাই সব চেয়ে বেশী কার্যকর ও উপকারী উপায়। অন্য প্রকার পন্থায় দীর্ঘকালে যে বিশ্রাম লাভ হয় না, অত্যল্প কালের নিস্তব্ধতায় তার চেয়ে বেশী ফল সম্ভব হয়। আমরা মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হলেও এর পন্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না অথবা জানি না। তার ফলে অনেক সময় জীবন-যাত্রাতেই আমাদের চিন্তাশক্তি হ্রাস পায় এবং আমরা সকল রকম কাজের ক্ষেত্রেই অচল হয়ে পড়ি।

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলীর ইঙ্গিত মাত্রই দেওয়া গেল। উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য আছে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থাবলী। এই প্রবন্ধে তাঁদের জানার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করতে যদি পেরে থাকি, তা হলেই মনে করবো আমার সকল প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

শিক্ষক ও গুরু

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন—সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন—যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।

—রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা ও শাসন

কেহ কেহ বলেন, একটু কঠোর না হইলে এবং ছাত্রের মনে একটু ভয় না জন্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে না, এবং শিক্ষাকার্যে সুশৃঙ্খলা থাকিবে না। একথাটি ভুল। শিক্ষা ও শাসন যদি একই হইত তাহা হইলে একথা ঠিক হইত। কিন্তু শিক্ষা ও শাসনে অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্য শাসিত ব্যক্তি, তাহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোষ সংশোধিত হইয়া তাহার উৎকর্ষ লাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় দেখাইয়া হইতে পারে। শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কলা-শিক্ষা কেন ?

(শ্রীদেবী প্রসাদের হিন্দী পুস্তক 'বচ্চোঁ কী কলা ঔর শিক্ষা' হইতে)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রকৃতি-পরিচয় : বন্ধুত্ব

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃত কলা শিক্ষার দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি তো হইবেই, কিন্তু তাহার লক্ষ্য শুধু ভৌতিক জীবনে আবদ্ধ নয়, মনুষ্য হৃদয়ের গভীর স্তর পর্যন্ত কলার প্রবেশ।

কলা সাধনার জন্য প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে, তাহার পুরাপুরি অধ্যয়ন করিতে হইবে। শিল্পীর এই অধ্যয়ন ভালোবাসা হয় না। সে উহা হইতে প্রকৃতির গভীর স্তরে নামিয়া যায়। শিল্পী এই অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে এতই একাত্মবোধ অনুভব করে যে ধীরে ধীরে সকলেই তাহার বন্ধু হইয়া যায়। নন্দবাবু একবার এক বিদ্যার্থীকে বলিয়াছিলেন, সে এক বৃক্ষ লইয়া কাজ করিতেছিল, "তুমি আজ যে এই বৃক্ষের আরাধনা করিতেছ, ইহার চিত্র আঁকিতেছ, যদি সত্যই ইহাকে ভাল লাগে, তাহা হইলে মনে রাখিও এ তোমার সমস্ত জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে। জীবনে কখনও হয়তো অশেষ দুঃখ আসিবে, প্রিয়জনকে হারাইতে হইবে, সংসার শূন্য মনে হইবে, তখন পথের ধারে এই বৃক্ষ বলিবে, 'এই যে, আমি এখানেই আছি।' তুমি সান্ত্বনা পাইবে। ইহাই তোমার অক্ষয় সঞ্চয়।"...অন্য সময় একবার বলিয়াছিলেন : "আসল কথা এই যে, যাহার ছবি আঁকিবে তাহা ভালো লাগা চাই। তাহা যেন তোমার মনোহরণ করে। তাহা হইলে সেই ভালো লাগাই তুলিকার মুখে আপনাআপনি বাহির হইয়া আসিবে। তখনই যথার্থ চিত্র হইবে। চিত্র আঁকিবার ইহাই সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে গূঢ় কৌশল।"

কলা-শিক্ষার ইহাও উদ্দেশ্য যে, ব্যক্তি প্রকৃতির সহিত এই বন্ধুত্ব অনুভব করুক। আজ বিশেষ করিয়া এই শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এতই সংকুচিত হইয়া গিয়াছে যে গাছপালার কথা ছাড়িয়া দিই, প্রতিবেশী মানুষের জন্যও প্রকৃত সংবেদনা আর নাই। এই স্বার্থময় যুগে প্রকৃত শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই যে, ছাত্র আর কিছু শিখুক আর নাই শিখুক, সঙ্গী ও সহকর্মীদের প্রতি তাহার গভীর সংবেদনা অনুভব করা অবশ্যই চাই। হৃদয়ে সংবেদনা জাগাইতে গেলে এমন বিষয় ও কর্ম বাছিতে হইবে যাহাতে মানুষের সূক্ষ্মতম সংবেদনা জাগ্রত হয়।

কলা-শিক্ষা এই কাজ করে। শিল্পীর মন এত কোমল হইয়া যায় যে যদি তাহার সামনে কোনও গাছ কাটা হয়, কোন অনুচিত কারণে ফুল তোলা হয়, তবে তাহার মনে দুঃখ হয়। দুঃখ এই জন্য হয় যে সে ফুলের সৌন্দর্যকে চেনে, এবং ফুলের এই সৌন্দর্য তাহার পরিচিত। নিজের পরিচিত বস্তুর ক্ষতি দেখিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। যখন নিজে ফুল তোলে তখন সর্বদাই কোন না কোন উচ্চ উদ্দেশ্যেই তোলে। তাহার উদ্দেশ্য, হয় সৌন্দর্য-সৃষ্টি, নয় তো প্রিয়জনে বা পূজ্যপাত্রে অর্পণ। প্রিয় বস্তুই অর্পণ করা চলে। ফুলও তাহার প্রিয় বস্তুর মধ্যে।

এই প্রকারের শিল্পীর দৃষ্টি, যাহা কিছু না কিছু পরিমাণে কলাবিকাশের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হইতে পারে, নন্দবাবু এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "যে কলাকার বা শিল্পী, সর্বত্র সকলে তাহার বন্ধু। সে কখনও নিঃসঙ্গ হইবে না। তোমাকে ভাল লাগিতেছে। তুমি চলিয়া গেলে, গাছ ভালো লাগিতেছে। গাছও নাই, তাহা হইলে এই ঘরজাই ভালো লাগিতেছে। কেন ভালো লাগিতেছে, সে কথা বলা কঠিন। কিন্তু আবেগের বশে ভাল লাগিলে অথবা নিজের জিনিস বলিয়া ভাল লাগিলে তাহাতে গভীরতা কম থাকে। কুতূহলের জন্য ভাল লাগা চিরস্থায়ী হয় না। আরও এক প্রকারের ভাল লাগা আছে, তাহা হইল—গভীর একাত্মানুভূতি। সকলেই গভীর আশ্বাস দিতেছে। সকলেই মিত্র।"

কলার সাহায্যে প্রকৃতি-পরিচয়ের বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য এক দিকও আছে। তাহা হইল এই যে কলার সহিত প্রকৃতির বাহিরের আকারের সহিত। ইহার দুই প্রকার আছে—আমাদের চারিদিকে যে জিনিসপত্র আছে সে বিষয়ে কলা আমাদিগকে সচেতন করে, আর আমাদের চক্ষুর সহিত যোগ রাখে, চক্ষের শক্তির প্রশ্ন ওঠে।

সচেতনতা

চোখ কোনও বস্তু দেখিল বা না দেখিল, কিন্তু আমি উহার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সচেতন, উহার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই ভাব থাকা চাই। আমাদের চারিদিকে কি আছে কি ভাবের আছে, কি তাহাদের আকার, এসব জানা ইহার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হইল—'কিছু আছে', ইহা অনুভব করা। বস্তুর স্মৃতির প্রতিবিম্ব হইতেও ইহার এতটুকু সাহায্য হয় না, কারণ এই ধারণা অক্ষেরও হওয়া চাই। চক্ষু না থাকিলেও এই সচেতনতা ব্যক্তির মধ্যে হয়, আমার অভিজ্ঞতা হইতে এক উদাহরণ দিতেছি। আমার এক বন্ধু ছিল, জন্ম হইতেই দৃষ্টিহীন। কখনও কখনও আমি তাঁকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে যাইতাম। সর্বদাই দেখিতাম, পথ চলিতে চলিতে কোনও বাড়ী বা গাছ থাকিলে তিনি নিজে অমনি বলিয়া উঠিতেন, "ভাই, এখানে কিছু আছে না?" অথবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখানে কি আছে?" বস্তুর বিদ্যমানতা, বস্তু যে আছে, ইহার অনুভূতি তাঁহার হইত। আমরা এই সচেতনতার বিকাশ সাধন করিতে চাই।

কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য একেবারে বিপরীত উদাহরণ দিতেছি। শিক্ষক-শিক্ষণের এক ঘরে একদিন শিউলি ফুলের কথা ওঠে। শরৎকাল। একজন উঠিয়া বলিল, ঐ গাছ ও ফুল সে ভাল করিয়া চেনে, কারণ তাহার দেশে উহা খুব প্রচুর সংখ্যায় জন্মায়। প্রশ্ন করিলে সে বলিল, "দেখিতেছি, এখানেতো ওগাছ জন্মায় না।" সে একথা জোর করিয়া বলিতে লাগিল যে তালিমি সংঘের হাতায় তো ঐ ফুলের কথা দূরে থাকুক, ওর একটাও গাছ নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজকাল কি আপনি রোজ সকালে ছাত্রালয়ে আসিতে যাইতে পথে বিছানো এই ফুলের এক ইঞ্চি পুরু স্তরের উপর দিয়া চলিয়া আসেন না?" তথাপি তাহার এবিশ্বাস দৃঢ় হইয়া থাকিল। পরের দিন সকালে আমি নিজে তাহার নিকট গেলাম, আসিবার সময় রাস্তায় বিছানো প্রকৃতির এই সুন্দর ছবির সামনে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলাম : "এফুলটি কি?"

"ওহো! আমি কি অন্ধ!" সে সত্য সত্যই ঐ ফুল ও গাছ ভাল করিয়াই চিনিত। তাহার হাতে এই ফুল একটা দিলে তখনই সে চিনিয়া লইত। তবু তাহার এই বস্তুটির সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না।

দুইটি উদাহরণ একেবারে দুই বিপরীত দিক

হইতে লওয়া। একটিতে চোখে না দেখিলেও কোনও বস্তুর অস্তিত্ব, তাহার বিদ্যমানতার বিষয়ে ব্যক্তির পুরাপুরি ধারণা আছে, সচেতনতা আছে। অন্যটিতে বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান আছে, মনে তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্বও গঠিত আছে, তথাপি সেই সচেতনতা নাই। এই সচেতনতার সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মানুভূতি হইতেই হয়। আমার বাহিরে অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্বে ধারণার অর্থ বাহিরের প্রতি সংবেদনা থাকা, ইহা অহংকার নিরাকরণের পথ। সুশিক্ষিত ব্যক্তির ইহা এক লক্ষণ

চোখের শিক্ষা

অন্য যে শক্তি কলা-শিক্ষার দ্বারা বাড়া ফুটিয়া ওঠে তাহা হইল চোখের শক্তি। জীবনে চক্ষু অবশ্যই চাই। সকলেই জানেন, চোখ না থাকিলে বাঁচা কত কঠিন। চোখের শক্তি যত বেশি হইবে, ব্যবহারিক জীবনে উহা হইতে ততই সাহায্য পাওয়া যাইবে।

চোখের শক্তি একে তো মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। তাহার উপর তাহার মনের সমবয়ের উপরও। দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রশ্ন যতদূর, ততদূর হইল শারীরশাস্ত্র ও আরোগ্য-শাস্ত্রের বিষয়। কখনও কখনও কোনও কিছুর অভাব জন্ম হইতে হইয়া থাকে, অথবা রোগের কারণে হয়। যেমন বর্ণান্ধতা, ইহাতে রং-এর ভেদ বোঝার ভুল হয়, কত রং তো দেখাই যায় না। কখনও এমন লোকও দেখা যায় যাহারা সমস্ত কিছুই সাদা কালো দেখে, রঙীন দেখিতে পায় না, অথবা রোগের জন্য ঝোঁয়া ঝোঁয়া অথবা টেরা বেঁকা দেখে। একটা চক্ষু অন্ধ হইতেও পারে; তাহা হইলে স্থানের গভীরতার সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে না। একটা চোখ থাকিলেই কি কাজ চলে? না। কারণ একটা চোখ থাকিলে একটা বস্তু আগে আর একটা পিছনে—স্পর্শ না করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না। একটা বস্তু কতখানি পুরু তাহারও ধারণা উহা হইতে হইবে না। কোনও বস্তু একটা চোখ বন্ধ করিয়া দেখিলে আবার অন্য চোখে অমনই করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে দুই চোখ পৃথক পৃথক ভাবে শুধু লম্বা ও চওড়ায় দিকটাই দেখে। কিন্তু দুইটি দিক দেখিবার তল বা 'প্লেন' পৃথক পৃথক হয়। উভয়ের মিলনে উহাতে গভীরতার ভাবও আসে, এজন্য তৃতীয় 'বিমা'ও (থার্ড ডাইমেনশন) আসিয়া পড়ে।

যখন এক চক্ষু কোনও কারণে বয়স বেশি হইলে নষ্ট হয়, তখন চক্ষু দিয়া গভীরতা দেখা যায় না। কিন্তু পুরাতন অভ্যাস ও মনের যুক্তিশক্তি দিয়া এবিষয়ে অভাব পূরণ হইয়া যায়।

চোখ ও মনের সমবয় শিক্ষার বিষয় শুধু বুদ্ধির বিকাশ হইতে এই সমবয় সিদ্ধ হয় না। সেজন্য চক্ষু ও বুদ্ধি উভয়কেই কোনও কাজের সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকিতে হইবে। আজ বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে একথার মানে বড় কম। বিশ বৎসর ধরিয়া শুধু বুদ্ধির কাজেই শিক্ষার মাধ্যম হইয়া থাকিল, চোখের ট্রেনিং-এর জন্য কিছুই করা হইল না। এজন্য আমাদের মধ্যে চোখ ও মনের সমবয়ের ভয়ানক অভাব। মনোবৈজ্ঞানিক বলেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তনের জন্যও এই সমবয়ের বড় প্রয়োজন। এই কারণেই কি সাধারণভাবে আজ অধিকাংশ লোকের চিন্তাও অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়িতেছে? যাহাই হউক, আমরা বয়স্কদের শ্রেণীতে যাহা দেখিয়াছি এখানেও তাহার উল্লেখ করিতে পারি—শিক্ষক-শিক্ষণের কথা। এই কথা বুঝাইবার জন্য সর্বদা সমস্ত শ্রেণীর সামনে মাটির উপর একখানি বই রাখিয়া দিই ও ছাত্রদের বলি, তাহারা যেমন দেখিতেছে সেই অনুসারে এই পুস্তকের চিত্র আঁকুক। শতকরা নব্বই জন লোক তাহাদের মোট বইয়ে এক আয়ত তৈরী করে, বাকি সকলে যেমন দেখিতেছে তেমন আঁকিতে চেষ্টা করে। এক আধ জনের হয়তো ঐ পুস্তকের মত দেখিতে হয়।

প্রত্যেক বস্তুর দুইটি আকার থাকে। এক, তাহার বস্তুর আকার, যাহার পরিবর্তন নাই। অর্থাৎ যদি পুস্তকের আয়ত আকার হয়, তাহা হইলে সে আকার কখনও বদলাইবে না। ইহাই তাহার মূল আকার। দ্বিতীয় আকার, যাহা চোখে দেখা যায়। ইহার সর্বদা বদল হয়, বস্তু যে কোণ হইতে, যে আলো-ছায়ার অবস্থায় দেখা যায়, তাহার উপর নির্ভর করে। সমতল স্থানে যে বই রাখা হয় তাহা একদিক হইতে দেখিলে আয়ত বলিয়া মনে হয় না। তাহার আকার কিছুটা প্যারালেলোগ্রামের মত দেখায়। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে এই কথা খাটে।

যে সকল বিদ্যার্থী পুস্তকের চিত্র এক আয়ত আঁকিয়া দেখাইয়াছিল, তাহারা যেমন জানিত তেমনই করিয়াছিল, অর্থাৎ পুস্তকের মূল আকার আঁকিয়াছিল। পুস্তকের আকার বিষয়ে তাহাদের যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাই ঐ ভাবে রূপ নিয়াছিল। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঐ পুস্তক কিরূপ দেখাইত সে শিক্ষা তাহাদের ছিল না। আসলে অধিকাংশ লোকে এভাবে দেখিতেই জানে না।

কোন বস্তু পাঁচ মিনিট সামনে রাখিয়া দিন। আবার সরাইয়া বিদ্যার্থীদিগকে বলুন। "ইহার চিত্র যেমন দেখা যাইতেছিল মন হইতে তাহা আঁকুন।" এ অবস্থায় তো আরও বিপদ। অতি অল্প লোকই এরূপ চিত্র আঁকিতে পারিবে। যাহারা তাহাদের ইস্কুলে পড়িবার সময় আগ্রহ সহকারে ড্রইং করিত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ঠিক ঠিক নিরীক্ষণ করিয়া চিত্র আঁকিতে কৃতকার্য হইবে।

এতো গেল শুধু আকারের কথা। রং প্রভৃতি বিষয়েও এই কথা। একই রং-এর দুই 'শেডে'র মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারা, প্রকৃতির কোনও বস্তুর রং-এর ঠিক নাম বলা, এসব খুব কম লোকই পারে। আমাদের এক গোলাপের বাগান আছে। তাহাতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ রকম গোলাপ আছে। শীতকালে যখন ফুলের মৌসম তখন আশ্রমে আগত অনেক দর্শক ফুল দেখিতেও আসেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তাও হয়। এ কথাবার্তা সর্বদা এই প্রকারের হয়: "কত রকমের গোলাপ আপনাদের বাগানে আছে?"

"পঁয়তাল্লিশ রকমের।" "পঁয়তাল্লিশ? কিন্তু দেখিতে তো পাঁচ ছয় প্রকারের লাগে। লাল, গোলাপী, সাদা, হলুদ....." লালের মধ্যে পাঁচ সাত প্রকারের শেড আছে, হলুদের মধ্যেও তাই, এসব তাহারা দেখেই না। এমন কি তাহাদের অনেকে একথা দেখাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না। এজন্যও চোখের ট্রেনিং দিতে হয়।

আলো-ছায়ার ক্রীড়া প্রকৃতিকে সর্বক্ষণ কতখানি বদলায়, উহার মধ্যে রূপের কতখানি ভাণ্ডার গড়িয়া আছে, সে জ্ঞানে আমরা আজ বঞ্চিত হইয়া থাকি। কলা-শিক্ষায় প্রকৃতির এই সম্পদের দ্বার খুলিয়া যায়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইহাই হইল আর্ট। সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেয়। যে দেখে নাই, সে যখন উহা দেখে, অবাক হইয়া যায়। এই কারণেই তো প্রত্যক্ষ দেখায় এত আনন্দ! এই দেখাই ছবি (চিত্র) দেখা।"

দেখা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন উহা দুইদিক হইতে হয়—চোখের দেখা ও মনের দেখা। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ একথা খুব সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন: "মানুষের মনে যা দেখি, তাহা মানবীয় ভাব, আর চোখে যা দেখি তাহা প্রকৃতির ভাব। এই দুইটিকে মিলাইয়াই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। দুইটিই হওয়া চাই। মনের দেখাও চাই, চোখের দেখাও চাই।"

পুস্তিকা পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রেলগাড়ীর কথা।

শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী। ওরিয়েণ্টাল লংম্যান্‌স। মূল্য ১'৫০ এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। ১৯৬০

রেলগাড়ীরই কথা বটে, তবে সচিত্র কাহিনী। প্রস্তরযুগের শিকারী মানুষের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত নানাপ্রকার যানবাহনের কথা। মানুষ নিজের তিনটি নিজে না টানিয়া ঘোড়াকে নিযুক্ত করিল, তাড়াতাড়ি চলা ফেরার জন্য চাকা হালকা করিতে লাগিল, গাড়ি সহজে চলার জন্য রাস্তায় লোহার লাইন পাতিল—এইভাবে ক্রমে ক্রমে যানবাহনের অগ্রগতি চলিতেছে।

এই পর্যন্ত পূর্বাভাস। তাহার পর আসিয়াছে রেলগাড়ীর কথা। জেম্‌স্ ওয়াটের সমস্যা কি করিয়া সমাধান হইল, ওয়াটের পরে জর্জ স্টিফেন্‌সন, এবং তারপরে এখনকার বৈদ্যুতিক গাড়ী—এই কয়েকখানি রঙীন চিত্র শিশুদের মন আকৃষ্ট করিবে, সন্দেহ নাই।

ভাল রঙীন ছবি। প্রতিদিনের কলকব্জার ব্যবহার বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বুঝাইবার জন্য এই ধরণের ছবি-ওয়ালা পুস্তক-পুস্তিকার অবশ্যই দরকার আছে। শিশু-শিক্ষায় ও বয়স্ক-শিক্ষায় যাবি যত বাড়িতেছে, সেই দাবি পূরণ তো আমরা করিতে পারিতেছি না। অনুরূপ পুস্তিকা আরও বেশী সংখ্যায় চাই—"কেন?" প্রশ্নের উত্তর চাই, বিজ্ঞানে আকর্ষণ করিবার জন্য এরূপ আয়োজন অপরিহার্য, যদিও আমরা এ পর্যন্ত তাহা পরিহার করিয়াই চলিয়াছি। বিদ্যুৎ কি করিয়া পাখা চালায়, আলো জ্বালে, বোঝা বহিয়া লইয়া যায়—কে তাহা অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কিশোরমনের সম্মুখে ধরিবে? যন্ত্রবিজ্ঞানের জন্য এই সামান্য আয়োজন অবশ্যই হওয়া উচিত।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি এবিষয়ে গতি নির্দেশ করিতেছে।

৪নং ফরম

(৮নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

২। বৎসরে কতবার প্রকাশিত হয়—
মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭/৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭/৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম—
শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন, ভারতীয় নাগরিক
১, ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

৬। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী—
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ভারতীয় নাগরিক
১, ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

আমি শ্রীঅজিতকুমার বসু এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী ও জ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীঅজিতকুমার বসু

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণকৃৎ কস্তিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৬৬ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

উচ্চ-শিক্ষার হার

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন তাঁহাদের তৃতীয় রিপোর্টে (১৯৫৮-৫৯) বলিয়াছেন, গত কয়েক বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীর সংখ্যা বৎসরে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই হারে বৃদ্ধি চলিতে থাকিলে শীঘ্রই সংখ্যা ১০ লক্ষে পৌঁছিবে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে মোট ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগার-গুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

মঞ্জুরী কমিশন শুধু উপযুক্ত ছাত্রদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, যাহাদের মধ্যে এরূপ শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাইবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি বা অন্যরূপ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু উপযুক্ত ও সাধারণ—এই দুইয়ের পার্থক্য কে বিচার করিবেন? ভাবপ্রাপ্ত দায়িত্বসম্পন্ন শিক্ষকদের এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য পরীক্ষার ফলাফলকেই শুধু বিবেচনায় নিলে চলিবে না। অন্য প্রকার হিসাবও করিতে হইবে। সংখ্যা অবশ্যই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। সেইখানেই বিপদ! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলিবে কি করিয়া, কাহার উপর নির্ভর?

সমগ্র রিপোর্টটি পড়িয়া কমিশন যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রতি চিন্তাশীল শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী সকলেরই দৃষ্টি পড়িবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া এতাবৎকাল জীবিত ছিলেন। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন তাহার কথা, বিশেষ করিয়া ছাত্রমহলে তাঁহার প্রস্তাবের বিষয় বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য দাস মহাশয়ের স্মৃতিকথায় পড়িয়া খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ব্যক্তিগত আলাপে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সকলেরই বাড়িত। তিনি শিক্ষক হিসাবে তাঁহার প্রকৃতিগত সরলতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ও বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিশেষ

করিয়া অধ্যাত্মপথে তাঁহার অগ্রগতি অত্যন্ত দ্রুত ও গভীর ছিল। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ অতি সুন্দর, জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল ছিল। বাংলা দেশ হইতে গুজরাট, সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ ও অনুসন্ধানের ফলে তিনি লোকমানসের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে তাঁহার উপদেশ ও শাস্ত্রপাঠ সকলের মনে গভীর তৃপ্তি আনিয়া দিত।

'আচার্য' কথাটা তাঁহার নামের সঙ্গে খুবই মানাইয়াছিল, শুধু ছাত্রসম্প্রদায়ের জন্য নয়, জ্ঞান-সম্প্রদায়ের জন্যও। আর সে জ্ঞানের মর্যাদা সর্বদা তিনি রক্ষা করিয়া চলিতেন। গম্ভীর অথচ সরল, কৌতুকপ্রিয় অথচ শান্তে অধীতী উদারস্বভাব আচার্য ক্ষিতিমোহনের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছে তাহারা তাঁহার মধুর ব্যক্তিত্বের কথা কখনও ভুলিবে না। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দানের কথা লইয়া এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একবার আমাদের দেশে ছাত্রদুর্বিনয়ের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত যাহারা শিখিতে যায়, তাহাদের মধ্যে এরূপ দুর্বিনয় দেখা যায় না—কারণ তাহারা শিখিতেই যায়, আর এখানে মামুলি স্কুল কলেজে যাহারা যায় তাহাদের উপর শিক্ষার ভার চাপাইয়া দেওয়া হয়।

অবশ্য তিনি তাঁহার দর্শনের চতুষ্পাঠীগুলির কথাই বলিয়াছিলেন।

কলা-শিক্ষা কেন ?

[সেবাগ্রামের শ্রীদেবীপ্রসাদের বিরচিত
"বচ্চোঁ কী কলা ঔর শিক্ষা" হইতে]

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লাবণ্য-নির্মাণ

লাবণ্য-নির্মাণ, শিক্ষা, বিশেষ করিয়া কলা-শিক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য। এই কথাটার উপর সংসারের সকল শিক্ষা-শাস্ত্রী জোর দিয়া আসিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন। অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি অধ্যয়ন করিলেও জানা যায় যে, ব্যক্তিকে সুসংস্কৃত করিবার জন্য শিক্ষার যে পরিকল্পনা করা হইত, তাহার মধ্যে কলার এক প্রধান স্থান ছিল, এবং ব্যক্তির কোন না কোন কলায় নিপুণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

ভারতের পুরাণ-গাথা, গ্রন্থ ও ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে শিক্ষায় কলার স্থান ছিল মুখ্য। প্রাচীন ও মধ্য যুগে নাগরিক বা সংস্কৃতিমান বলিতে 'চতুঃষষ্টিকলাপ্রবীণ'ই বুঝাইত। "প্রাচীন ভারতের এই সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব ব্যক্তি……নিজে এই সকল কলায় জ্ঞানী ছিলেন। নাগরিকদের বিশেষ বিশেষ কলায় অভ্যাস করানো হইত। শুধু শারীরিক অনুরঞ্জনই কলার বিষয় হইত না, মনের ও বুদ্ধির বিকাশের দিকে পুরামাত্রায় বল দেওয়া হইত। সেকালে কোনও পুরুষের পক্ষে রাজসভা ও সভ্যসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যাপারে কলাজ্ঞান আবশ্যক হইত, নিজের গোষ্ঠী বিহারের অধিকার তাহা দিয়া সিদ্ধ করিতে হইত।"

জাপানে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি, স্ত্রীলোকেরা

তো অবশ্যই, ফুলদানিতে সুন্দর করিয়া ফুল সাজাইতে জানে। এই কলা জাপানে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া স্থান পায়, এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ইহা শিখিতে হয়। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেও হয়। চীনের সভ্যতা অনুসারে কোনও রাজা বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করিবার সময় প্রথমেই কোন না কোন কলার নাম করিতেই হয়। হয় তিনি বড় কবি হইবেন, নয়তো চিত্রকর, নয়তো টেলিগ্রাফিষ্ট বা লিপিকার অথবা গায়ক ইত্যাদি।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নাম সকলেই জানেন। তাঁহার গ্রন্থ 'রিপাব্লিকে' তিনি আদর্শ সমাজের চিত্র অংকিত করিয়াছেন। প্লেটোর দার্শনিক মতই ছিল এই যে, শিক্ষার এরূপ শক্তি থাকা চাই যাহাতে ব্যক্তির মধ্যে ছন্দ ও সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার মতে……"আমাদের নাগরিকতার বিকাশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য শুধু সুন্দর ও লাবণ্যময় বাস্তবরূপে হউক। তাহার মধ্য হইতে কুৎসিত চিহ্ন ও দোষ বাহির করিয়া দেওয়া হউক।"…যদি আমাদের যুবকদের জীবনে কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা এই লাবণ্য-সামঞ্জস্যকে নিজেদের শাশ্বত উদ্দেশ্য করিতে চাহিবেন না? অবশ্যই চাহিবেন। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে চিত্রকাব্যের কলা এবং অন্য সকল সৃজনাত্মক ও গঠনাত্মক কলা ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় আছে—বুনাই, বাতাই, বাস্তুকলা ও সর্বপ্রকার উৎপাদনের কাজ। সঙ্গীতের বিষয়ে: "আর, ইহার জন্যই তো বলি যে সংগীত-শিক্ষা অন্য কোনও মাধ্যম অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী মাধ্যম, কারণ ছন্দ ও সামঞ্জস্যের প্রবেশ হয় হৃদয়ের (আত্মার) গভীর স্তরে, আর তাহা উহার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। উহাতে হয় লাবণ্যের নির্মাণ। যাহার উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছে, উহা তাহাকে লাবণ্যময় করে: যাহার এই অন্তর্জীবনের শিক্ষা হইয়াছে, সে সতর্কতার সহিত কলা ও প্রকৃতির অভাব ও ত্রুটি বুঝিয়া লইবে। সে প্রকৃত সুরুচির সঙ্গে যখন সত্যকে আদর করিবে, তখন উহা হইতে আনন্দ পাইবে, নিজের হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিবে, মনকে গড়া করিবে, মনের শিক্ষা করিবে। যৌবনকালে, যখন সে ইহার কারণও বুঝিতে পারিবে না, তাহার এইরূপ বিকাশ হইবে।"

ব্যক্তির বিকাশের প্রথমাবস্থায় কলা-শিক্ষার দ্বারা লাবণ্য-নির্মাণ হয়, একথা প্লেটো এক স্থানের রূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি যখন ছন্দ ও সামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন স্পষ্টত তাঁহার অভিপ্রায় তথাকথিত কলার ছন্দ ও সামঞ্জস্য নয়, সম্পূর্ণ জীবনের সামঞ্জস্য ও ছন্দের কথাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে বোধের প্রয়োজন, কলা-শিক্ষা সেই বোধ প্রদান করিতে পারে। এই মত আজাই চাজার বৎসরের পুরাতন দার্শনিক প্লেটোরই শুধু নয়, সংসারের সকল সভ্যতারই এই মত।

এই লাবণ্য কলাকার কোথা হইতে পেয়ে? প্রকৃতির মধ্যে ইহার দর্শন পাওয়া যায়। তাই প্রকৃতির মধ্যেই সর্বপ্রথম লাবণ্য ও লালিত্যের অনুসন্ধান করিতে হয়।

একথা স্বীকার করি যে সৌন্দর্য-নির্মাণের চেষ্টা জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সকল চেষ্টাই হইল জীবনে সমান ওজন করার দিকে—লাবণ্য সৃষ্টির দিকে। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে ধরা হইয়াছে। মনুষ্যও প্রকৃতির অঙ্গ। মানুষের কোনও কোনও আচরণ তো জানিয়া শুনিয়া সচেতন মনের দ্বারা হয়। কিছু কিছু আচরণ অজ্ঞাতিতে হয়, সংজ্ঞাত বৃত্তির দ্বারা। মানুষের এই সকল প্রবৃত্তি সেইভাবে কাজ করে, প্রকৃতির অন্যান্য জীব তাহাদের স্বভাব অনুসারে যেমন করে। যতদূর লাবণ্যের প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃতির চেষ্টা সর্বকালে সকল বস্তু নির্মাণে লাবণ্যের জন্যই। গাছের একটা দিকের ডাল যদি কোনও কারণে ভাঙিয়া

যায়, সেজন্য তাহার ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভারসাম্য কি করিয়া হইবে, প্রকৃতি তাহারই চেষ্টা করে। যেদিকের ডাল ভাঙিয়া গিয়াছে সেইদিকেই তাহার নবীন শাখা বাহির করে। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে অন্য কোনও দুর্ঘটনা না হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে গাছের ভারসাম্য পুনরায় স্থাপিত হইয়াছে।

শিশু যখন প্রথম প্রথম হাঁটিবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের মনে হয়, ও বুঝি হোঁচট খাইতে খাইতে চলিয়াছে। কিন্তু শিশু কি সেই নর্তকের মত নয়, যে সরু দড়ির উপর দাঁড়াইয়া নাচিবার চেষ্টা করে এবং ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এদিকে ওদিকে হাত বাড়ায়? ঐ শিশুও তাহার চলিবার সময় সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়, ভারসাম্য আনিতে সর্বদাই যাহার প্রয়োজন হয়। নৃত্যের সময় নর্তকের শরীরে যেমন করিয়া হয়, এই সকল স্পন্দনের জন্য সেইরূপ প্যাটার্ণ তাহার শরীরে হয়। এসকল একই তত্ত্বের উদাহরণ। সেই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। যদি কোনও দুর্ঘটনায় এই ভারসাম্য ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ফিরাইয়া আনিবার বা সংশোধন করিবার জন্য প্রকৃতির সমস্ত চেষ্টার প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতির আর একটি চেষ্টা উপরোক্ত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে মিতব্যয়িতা বা উপযোগিতা। প্রকৃতির মধ্যে প্রতিটি বস্তুর নির্মাণে এই চেষ্টা থাকে যে যতদূর সম্ভব কম ব্যয় হউক, তাহার চেয়ে বেশি না হয়। কোনও ফলের কথা ভাবুন—কমলালেবু। বনস্পতিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের নিকট সন্ধান লইলে জানা যাইবে, তাহার ভিতরে যে তন্তু প্রভৃতি আছে তাহা সকলই তাহার নির্মাণের জন্য আবশ্যক। তাহার ভিতরে বাতুর জন্য যে স্থান থাকে, তাহাও তাহা একেবারে অঙ্কের হিসাবে ঠিক পরিমাণে থাকে। উহার মধ্যে এমন কোনও বস্তু নাই বা এমন পরিমাণে নাই যে বৈজ্ঞানিক বলিবে, ইহা অনর্থক ব্যয় হইয়াছে।

এই দুই চেষ্টা—সৌন্দর্য-নির্মাণ ও মিতব্যয়িতা (উপযোগিতা)—উভয়ের মধ্যে এতটা সম্বন্ধ আছে যে একটা অবস্থায় ইহারা একই লক্ষ্যের দুইটি নাম বলা যাইতে পারে। মিতব্যয়িতার মধ্যে যে শক্তি তাহা শেষে সৌন্দর্যরূপে পরিণত হয়, আর যাহা সৌন্দর্য-নির্মাণে ব্যয় হয় তাহা ঐ বস্তুকে পূর্ণতার রূপ দেয়।

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু সিদ্ধান্ত, নিয়ম প্রভৃতি আছে যাহা উপরে বর্ণিত বিবিধ চেষ্টার ভিত্তিস্বরূপ। তাহারও অবশ্য কিছু অঙ্কের হিসাব আছে। কলা সম্বন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে 'প্যাটার্ণ-মেকিং'-এর পিছনে একটা গণিত আছে। সেই গণিত শিখিয়া লইলে ও সৃষ্টিকর্মে তাহা কাজে লাগাইলে বস্তু সুন্দর হয়। কয়েকটি কথা হইতে এই আলোচনার সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিকলার উপর কয়েকটি শাস্ত্র আছে। তাহাতে মূর্তিগুলির নিশ্চিত পরিমাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। মূর্তির প্রত্যেকটি অবয়ব সংস্থাপন ও পরস্পরের অনুপাত কিরূপ হইবে, ইহা একেবারে স্থির করা থাকিত। পুরাতন মূর্তির এই প্রকার প্রত্যক্ষ অধ্যয়ন করা হইয়াছে। তাহাতে কিছু সর্বসাধারণ 'পরিমাণ' পাওয়া গিয়াছে। সে-সব দেখিয়া মনে হয়, উহা তো গণিতের সিদ্ধান্তের মতই মৌলিক সিদ্ধান্ত। বাস্তুকলায় একথা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। বাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ, তাহার দরজা, খিড়কি প্রভৃতির পরিমাণ একেবারে অঙ্কের হিসাব মতে স্থির হওয়া চাই, পুরাতন শাস্ত্র একথা মানিয়া আসিয়াছে। এমন কি, তাহাতে ধর্মের কথাও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীতের

সম্ভব তো পণ্ডিতের এই কথাই প্রমাণ করিয়া এক সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে।

ইহার অর্থ হইল এই যে, সৌন্দর্যবোধ ও মিতব্যয়িতা বা উপযোগিতার ('এস্থেটিক' ও 'ফাংশনাল') মিশ্রণে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত নিহিত আছে। যদি প্রকৃত মিতব্যয়িতা বা উপযোগিতার (কথাটার অর্থ কম ব্যয় হিসাবে না ধরিয়া যদি 'ফাংশনাল' হিসাবে ধরা হয়, অর্থাৎ কাজের দৃষ্টি হইতে বস্তুর উপযোগ) চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সৌন্দর্য-নির্মাণও হইবে, আর যদি সৌন্দর্য-নির্মাণের চেষ্টা হয়, তবে মিতব্যয়িতাও (উপযোগিতা) সিদ্ধ হইবে। একথা সহজ নয়, কারণ আজ আমাদের চিন্তায় সৌন্দর্য ও উপযোগিতা এতই পৃথক পৃথক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে যে উপরে বিবৃত কথা মনে বসিতে খানিকটা সময় লাগিবে।

একথা আধুনিকতম ডিজাইনারেরা মানিয়া লইবে এবং ইহা তখন বুঝিতে পারা যাইবে, যখন আধুনিক উপযোগী বস্তু লইয়া আলোচনা করিব। এবিষয়ে হার্বার্ট রীড লিখিতেছেন: "একথা বলা যাইতে পারে যে কিছু কিছু কাজের জিনিস কল্পনাতেও কখনও সুন্দর করিয়া গড়িতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, কখনও কখনও ইহার সম্ভাবনা হওয়া কঠিন। কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে অনেক বস্তু, যাহাদের হইতে এরূপ আশাও করা যায় নাই, একপ্রকার ভাবাত্মক সৌন্দর্য ধারণ করিতে পারে। ইহার এক স্পষ্ট উদাহরণ হইল মোটরকার। আরও ভাল উদাহরণ হইল রেডিও সেটের। গত পাঁচ দশ বৎসরের মধ্যে সৌন্দর্যের পথে উহা বিকাশলাভ করিয়াছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ কলাবিৎ রোজর ফ্রাই সন্দেহ করিতেছিলেন যে টাইপরাইটারও যুক্তি এক সময়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইবে, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নমুনা এমন ভাল হইতেছে যাহা প্রথমের তুলনায় সে-যামান দেখা যায়। যদিও এখনও কেহ টাইপরাইটারকে কলার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিবে না, কিন্তু তাহার বিকাশ অবশ্যই সেই দিকে হইতে থাকিবে।"*

এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করা আমাদের অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু ইহা হইতে বলিতে চাহিয়াছি যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে উপযোগিতার প্রশ্ন যুক্ত আছে, আর উত্তরের স্তরে এমন কিছু নিয়ম নিহিত আছে, যাহা পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের মত কাজ করে, যাহা শেখানো যায়।

শিল্পী দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন—এক তো সেই শিল্পী যিনি শুধু আন্তরিক বোধ বা ইনটুইশনের দ্বারা সৃষ্টি করেন; অন্য শিল্পী, যাঁহার সৃষ্টিধর্ম বুদ্ধি-প্রধান। আন্তরিক বোধের শক্তি শেখানো যায় না, কিন্তু উহার সৃষ্টিধর্মের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সাধারণ লোককে অবশ্যই শেখানো যায়, বুদ্ধির আশ্রয়ে। উপরে যে সব সিদ্ধান্তের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুদ্ধি দিয়া খোঁজা, বোঝা ও প্রয়োগ করা শিক্ষার বিষয়।

এইরূপে মানুষ প্রকৃতি হইতে যাহা লইয়া আসে তাহাতে তাহার তো সাধ্যে-সৃষ্টির ক্ষমতা থাকেই, তাহার উপর আবার সংস্কারের দ্বারা জানিয়া বুঝিয়া এক সম্পূর্ণ লাবণ্যশীল ব্যক্তি হইবার শক্তিও তাহার আছে। এতখানি আলোচনার পরও কেহ কেহ বলিতে পারে যে কলাপ্রবণতা তো জন্মসিদ্ধ, তাহা শেখানো যায় না। অবশ্য খানিকটা দূর পর্যন্ত একথা সত্য হইতে পারে। মৌলিক রচনা যাঁহারা করেন বা করিবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সত্য। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরও ইহাতে প্রবেশ হউক, এই আশা যতটা রাখি, সেই পরিমাণে ইহা কঠিন হওয়া উচিত নয়। একথা কি সত্য নয় যে প্রাচীনকালে কলাকার, শিল্পকার সকলে বংশপরম্পরা দ্বারা শিক্ষিত হইতেন? পিতার কর্ম পুত্র করিবেন, ইহাই তো ছিল সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক পুত্রই তখন জন্মসিদ্ধ কলাকার হইতেন। এ কথা সত্য যে

* হার্বার্ট রীড—আর্ট এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, ২২ পৃঃ

প্রত্যেক কলাকারের পুত্রই মৌলিক রচনাকারে শিল্পী হইতে পারিত না, কিন্তু একটা স্তর পর্যন্ত তো তাহাকে নিজের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হইতেই হইত। এইরূপে সাধারণ লোকের শিক্ষায় কলাশিক্ষা এজন্য আবশ্যক যে তাহার কলাবোধ লাভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যক্তিত্ব লাবণ্যময় হইতে পারে।

প্লেটো যেমন বলিয়াছেন সেরূপ খুনিয়াদ শৈশব হইতেই প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ এমন অনেক কথা আছে যাহা বিশেষ একটা বয়সেই করিতে হয়। মৃত্যকারের শরীর তখনই সুন্দর ও ছন্দময় হইতে পারে, যখন সে শৈশব হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা পায়। বড় হইয়া শরীরের গঠন বদল করা কঠিন কথা। শৈশবে যদি শরীর ঠিকমত চালাই করা হয় তাহা হইলে বেশি বয়সেও তাহা ঠিক থাকে। যে গলা ছেলেবেলাতেই সাধা হইয়াছে, তাহাতে বরাবর সুরের সমাবেশ হয়। সঙ্গীতজ্ঞের গলার লাবণ্য, কম বয়সেই নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। কলা-বোধ শৈশবেই অভ্যাস করিলে যে গভীর স্তরে প্রবেশ করে, বড় হইলে সেরূপ অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই যে কলা-বোধের (sensibility) সহিত সম্পর্ক বিনয় অর্থাৎ সৃষ্টিধর্ম ও গঠনমূলক বিনয়, তাহার দ্বারা যে বিকাশ সম্ভব, তাহা বাল্যাবস্থায়ই হইতে আরম্ভ করে। ছেলেবেলায় তাহাতে প্রবেশের পথ না পাইলে বড় হইলে তাহা অসম্ভব হয়। বড় হইবার পরও দরজা শুধু তাহাদের জন্যই খোলে, যাহাদের কিছু প্রতিভা আছে।

চিত্রকলা ও মূর্তিকলা বা অন্য শিল্পের শিক্ষা দ্বারা জীবনের যে সকল গ্রন্থি সহজ হইয়া পড়ে, তাহাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল বাল্যাবস্থা। উহাই বিকাশের সময়। ঐ সময়ে আনন্দ ও স্ফূর্তির বিস্তৃত অনুভব হইলে বিকাশ সুখে স্বচ্ছন্দে হয়। কলা-শিক্ষা এই স্বচ্ছ লাবণ্যময় বিকাশের পথ।

এতক্ষণ 'কলা-শিক্ষা কেন?' এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। কলা-শিক্ষার অন্য দিকও থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা জগতের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে সকল প্রকারের সাংস্কৃতিক দৈন্য দেখিতেছি। ইহার কারণ মনের সঙ্কোচন ও অবদমন, না বোধ শক্তির হ্রাস, সত্য দৃষ্টির অভাব—ইহার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। একথা অবশ্য সত্য যে মানুষ তখনই শান্ত ও আনন্দময় থাকে যখন তাহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ হইতে থাকে। কলা-শিক্ষা যে সত্যদৃষ্টিকে নির্মাণ করে তাহার দ্বারা সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করিতে সাহায্য পাওয়া যায়। পরিণামে আনন্দলাভই তো জীবনের উদ্দেশ্য। নন্দবাবুর 'শিল্পকথায়' শেষ অনুচ্ছেদে আছে—"কুপাল জাতকে কামলোকের কথা আছে—তাহার পর রূপলোক। তাহারও পরে অরূপলোক। আমি বলিতে চাই সে আবার তাহারও পরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি আছে, তাই অন্ধতা আছে। রূপলোকে পৌঁছিলে জীবনে অখিল জীবনের কিছু সম্যক অনুভব হয়। আনন্দলোকে আছে রস। শাস্ত্র বলে, রসো বৈ সঃ।"

———

শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বালকদিগের সহিত শিক্ষকের প্রণয় করা কর্তব্য। এই কথা সকলেরই অনুমত বটে। কিন্তু ইহা প্রতিপালনের উপযুক্ত কর্ম করায় প্রথমতঃ অনেকের প্রবৃত্তি হয় না। পিতাপুত্রের যেরূপ ব্যবহার গুরুশিষ্যেরও সেইরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু এখনও এই দেশে পিতাপুত্রের মধ্যে পরস্পরের প্রণয়সাধন চেষ্টা অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাছে পুত্রের নিকট কিছু সম্ভ্রমের ত্রুটি হয়, এই ভয়ে অনেকেই স্ব স্ব সন্তানগণের সহিত মিলিত হইতে চাহেন না। আমার কাছে বসিয়া পড়াশুনা করুক এবং চক্ষুর বাহির হইয়া খেলাধুলা যাহা করিতে হয় করুক, অধিকাংশ লোকেই সন্তান এবং শিষ্যবর্গের পক্ষে ইহা পথ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করেন বলিয়াই বালকদিগের ক্রীড়া তাহাদের পাঠের প্রতিবন্ধক হয়, এবং শৈশবাবস্থাতেই এত কুসংস্কার জন্মে। যদি শিক্ষকেরা বালকদিগের ক্রীড়ার সংসর্গী হন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ কিছুই হইতে পারে না। ক্রীড়াও নানা শুশিক্ষার সহকারিণী হয়, এবং বাল্যাবধি দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জন্মে।

ইতিহাস কি বিজ্ঞান, না কলাবিদ্যা ?

শ্রীইতিহাস রসিক

অধ্যাপক বিউরি ১৯০৩ সালে তাঁহার কেম্ব্রিজের এক বিখ্যাত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, ইহার এক চুল ব্যতিক্রম নয়।" আর একজন লেখক বলিয়াছেন যে আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানের একটি শাখা।

অধ্যাপক বিউরী ঐ বক্তৃতায় আরও বলেন : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখন পাণ্ডিত্যের পরিপূরক হইয়াছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর Halle সহরে Wolf নামে এক লেখক Prolegomena to Homer নামে এক বই লেখেন। এই বইয়ে বর্তমান যুগে সূক্ষ্ম এবং নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে মূল উপাদানগুলির বিশ্লেষণের উপর জোর দিবার প্রয়োজনীয়তা প্রথম স্বীকৃত হয়। ইতিহাসকে অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিবার আন্দোলনের সীমা তখনই রচনা করা হইয়াছিল। গিবন, ভলটেয়ার, উলফ, নিবুর ও ব্রাঙ্কে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্বাভাস দেন।

ইতিহাসের আদিযুগ হইতেই প্রত্যেক ঐতিহাসিক মৌলিকতাবিহীন ও নির্ভেজাল সত্য প্রকাশ করিতে চান। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ইতিহাসকে কলাবিদ্যা বলিয়া বিবেচনা করা হইত, ততদিন পর্যন্ত সত্য এবং বিচ্যুতিহীনতা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করিবার প্রয়োজন কেহই বোধ করিতেন না। সত্যের আবিষ্কার একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালী। গত শতাব্দীর শেষে ইউরোপে পুনরুজ্জীবিত জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্বত্র স্বীকৃত হইল। জার্মানীর জাতীয়তাবোধ ঐতিহাসিক গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করিল, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই কাজে নিয়ন্ত্রিত করিল।

মুকিডিইডিস এবং পলিবাস ইতিহাসের উপযোগিতা বিষয়ে মনে করিতেন যে রাজনীতিবিদ্‌গণ ইতিহাস হইতে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস এবং নীতির উদাহরণ পাইবেন ; ব্যাকিয়াডেলিও মনে করিতেন যে ইতিহাস পাঠ করিলে রাজনীতিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করা যায়। ভাইকনিসিয়াস ইতিহাসকে "দর্শনের উদাহরণরূপ" বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল মতবাদ ইউরোপে গত শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধান্য পাইয়াছিল।

ইতিহাস সাহিত্যের শাখা নয়। ভূতত্ত্ব বা জ্যোতির্বিদ্যার তথ্য সাহিত্যের মালমশলা জোগাইতে পারে ; ইতিহাসের ঘটনা হইতেও তাহা পাওয়া যায়। মমসেনকে সকলেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়া জানে এবং রোমের ইতিহাস লেখার জন্য জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এই খ্যাতি। তিনি Chronicles, Corpus এবং Staatrecht নামে রোমক আইনের তিনখানি বই সম্পাদন করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন। নানাবিধ বিষয়বস্তুর বিচারে ইহাদের মধ্যে আছে। ইহাতে তিনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু ইহারই মধ্যে, তাঁহার রোমের ইতিহাসের মধ্যে নয়।

ইতিহাসের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে, ইহাকে বিজ্ঞান করিয়া তুলিতে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহাকে সম্বন্ধযুক্ত করিতে ক্রমবিকাশ (evolution) চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের বিকাশ অতীতে কি প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহার জ্ঞান ভবিষ্যতের বিকাশের সহায়ক। ইতিহাসকে সাহিত্যের শাখা না ধরিয়া বিজ্ঞান মনে

করিয়া পড়া উচিত। যিনিই এই দুইটি কথা মনে রাখিবেন তিনি একটি জাতীয় চেতনা (conscious) জাগাইতে সহায়তা করিবেন। ফলে লোকে এই বুঝিবে যে, সত্যকারের ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাসের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এবং এই প্রকার গবেষণার উন্নতি সাধন বা ইহা অবলম্বন করিলে বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বরং ইহার দ্বারা একটা ভাল কাজ করা হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি একটি মহান কর্তব্য করা হয়।

যদি জনমত গঠন করিতে হয়, যদি মানুষের চক্ষু হইতে ভুলভ্রান্তির আবরণ সরাইতে হয়, যদি বুদ্ধিপ্রসূত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার উন্নতি করিতে হয়, তবে মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, ইহার একটু কমও নয়, একটু বেশিও নয়। এইরূপে অধ্যাপক বিউরি ইতিহাস বিজ্ঞানের জয়গান গাহিলেন।

আর্কিমিডিস এবং হিরোডোটাসও ইতিহাসকে বিজ্ঞান মনে করিতেন। তাহার প্রমাণ এই যে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া তাঁহারা বিষয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। যে অর্থে ইতিহাসকে আমরা বিজ্ঞান বলি তাঁহারা অবশ্য সে অর্থে বলিতেন না।

মানুষ তাহার বর্তমান অবস্থা জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায় না, তাহার অতীত অবস্থাও জানিতে চায়। ইহার ফলে ইতিহাস চর্চার আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার বর্তমান অবস্থা কি, কেমন করিয়া বর্তমান অবস্থা আসিল, তাহার কারণ কি, এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্রমপরিণতির পদ্ধতির জন্য ইতিহাসকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কারণ, বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার পদ্ধতির, ইতিহাস অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সঙ্গে মিল আছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস যে বিজ্ঞান, এই মত বিউরি এবং জার্মান ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পাইল। গবেষণা করিবার প্রণালীও নির্ণীত হইল। মহাফেজখানায় রক্ষিত কাগজ-পত্রগুলি প্রধান উপকরণের কাজ করিল। ইহাতে সময়ও বাঁচিল। ভাষার বিজ্ঞান (ভাষাতত্ত্ব), মুদ্রার বিজ্ঞান (মুদ্রাতত্ত্ব), প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার বিজ্ঞান (প্রত্নতত্ত্ব), শীলমোহরের বিজ্ঞান, শিলালিপির বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানগুলি ইতিহাস বিজ্ঞানের সহায়ক। ইহারা যদি না থাকিত, তবে ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ জানা যাইত না। দেশের ভাষা, মুদ্রা, প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, দলিলপত্র, রাজপুত্রদের শিক্ষা, রাজসভার বেকর্ডপত্র, সমসাময়িক রচনা ও চিঠিপত্র, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়ের সহিত কোন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক, ইহাদের সাহায্যে বিচার করিয়া ইতিহাস রচনা করা হয়। এই প্রকারে রচিত পদ্ধতিকে এখন হইতে বলা হইল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এবং এইজন্যই ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা হয়। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র হইতে মৌর্য শাসনপদ্ধতি এবং হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে রাজা খারবেলের রাজত্বের বিবরণ এই প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। যে গবেষক ব্রাহুইদের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়দের ভাষার, বা পুশতুভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অনুসন্ধান করিবেন তিনি ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করিবেন।

গত শতাব্দীতে নির্ভুলতা এবং উদ্দেশ্যমূলকতার (বস্তুতান্ত্রিকতার) উপর বেশি জোর দেওয়া হইত। ইহার কারণ প্রাকৃতিক (physical) বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির জন্য ইতিহাসকেও এই শ্রেণীর বিজ্ঞানে পরিণত করিবার ঝোঁক দেখা দিয়াছিল।

কারণ এই মতের সমর্থক ঐতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা বেশি হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া বিসমার্কের জার্মানী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিল। আর একটি কারণ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন, পাঠন এবং পরীক্ষায় ইতিহাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পঠনের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

বিউরি এবং তাঁহার পক্ষভুক্ত লেখকগণ বলেন যে ইতিহাস বিজ্ঞান, ইহার একতুল বাতিক্রম নাই। আর একদল বলেন যে ইতিহাস জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ শাখা নয় (History is not a systematic branch of knowledge—Edward Meyer), অর্থাৎ ইতিহাস কলাবিদ্যা (জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ শাখাকেও বিজ্ঞান বলে)। ইহার মধ্যে কোনটা সত্য ?

ইংরাজী science (বিজ্ঞান) কথাটি লাটিন scientia (জ্ঞান) থেকে আসিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় science-এর এক অর্থ systematic and fundamental knowledge ; ইহার দ্বারা নৈতিক (moral), রাজনৈতিক (political), প্রাকৃতিক (natural) ইত্যাদির জ্ঞানও বোঝায়। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা বুসায়ন শাস্ত্রে যে নিখুঁতভা আছে, তাহাদের সূত্র যে প্রকার সর্বকালে সর্বদেশে একই নিয়মের অন্তর্গত, নৈতিক বা রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে তাহা বলা যায় না। নিয়ম অনুযায়ী পদার্থবিদ্যার সূত্র সর্বত্র সত্য হইবে, ইতিহাস শাস্ত্রের সূত্র তাহা হইবে না।

আবার আজকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অর্থে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিখুঁত, ইহাই সকলের জানা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতবাদ অনেক সময় সংশোধিত হয়। ১৮০৩ সালে বৈজ্ঞানিক ডালটন প্রচার করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক জিনিসের ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু (atom) বলা হয় ; এই পরমাণুকে ভাঙা যায় না। ইহার আট বৎসর পরে ইটালী দেশের বৈজ্ঞানিক আভোগাড্রো এই মতবাদের সংশোধন করিলেন। আবার বর্তমান শতাব্দীতে এই মতবাদের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। আগে জলকে একটি নিদান (element) বলা হইত ; এখন ইহা একটি যৌগিক পদার্থ (compound) বলিয়া স্বীকৃত। পরমাণুকে proton, electron, neutron, ইত্যাদি নানাভাগে ভাঙিয়া পৃথক করা যায়। বুসায়ন শাস্ত্রে যাহাকে basic elements বলে প্রায় পনের বৎসর আগে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৯২, ১৯৫৯ সালে ১০২ হইয়াছে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যতটা নিখুঁত বলিয়া মনে হয় আসলে তাহা নয়। নূতন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের নিখুঁততা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়।* তারপর বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় তাঁহাদের ধারণা অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। Mill-এর Logic বই হইতে ধারণা গ্রহণ করিয়া তাঁহার Organic Chemistry পুস্তকে প্রয়োগ করিয়াছেন, Liebig নিজে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

"Herodotus and Thucydides regard history both as a science and an art, although they may not have used that phraseology. They took great pains in collecting facts though travel and conversation were their sources rather than documents which there were not many in those days."—G.M. Trevelyan's History and the Reader, p 8.

* দীর্ঘকাল প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ সংশোধিত হইবার দৃষ্টান্ত, নিউটনের Law of gravitation বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন সংশোধন করিয়াছেন।

রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যা প্রকৃতি যে অর্থে বিজ্ঞান, ইতিহাস সে অর্থে বিজ্ঞান নয়। এই সকল বিজ্ঞানের একটি সূত্র (formula) সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সর্বত্র এই সূত্র সত্য হইবে। কিন্তু ইতিহাসের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম। কোন সমাজ, জাতি বা রাজ্যের উন্নতি অথবা অবনতির কারণগুলি সর্বত্র একই নয়। মানুষ একটি বিচারশীল জীব। জড় পদার্থ বা পশুপক্ষী হইতে তাহার পার্থক্য যথেষ্ট। একটি আলসেসিয়ান কুকুরের প্রকৃতি বিচার করিয়া সকল আলসেসিয়ান কুকুরের প্রকৃতি বিচার করা যায়। কিন্তু একজন জার্মান বা মাদ্রাজীর প্রকৃতির বিচার করিয়া সকল জার্মান বা সকল মাদ্রাজীর প্রকৃতি বিচার করা যায় না, সমগ্র মানবজাতির বিচার ত আগেই সম্ভব নয়। একথা সত্য যে জগতে যেখানেই অত্যাচার নিপীড়ন অনাচার হইয়াছে, সেখানেই বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। শাসকগণ যেখানে দুর্বল বা অনুপযুক্ত, সেখানে তাহারা ক্ষমতা হারাইয়াছেন। কলকারখানায় যেখানে মজুরী কম, যেখানে মজুরদের স্বার্থ দেখা হয় না, সেখানে আশানুযায়ী উৎপাদন হয় না। কিন্তু বিচারশীল জীবের জীবনপ্রণালী বড়ই জটিল। এই জটিলতা নিম্নশ্রেণীর জীব বা জড় পদার্থে নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজনের আদৌ মিল নাই।

কিন্তু যে সকল ঘটনা জানা যায় বা যাহাদের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। শঙ্করাচার্যের পর উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পাইল। ঐতিহাসিকগণ এমন কোন প্রমাণ পান নাই যে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দু-ধর্মমত গ্রহণ করিল; এ বিষয়ে কোন শিলালিপি, তাম্রপত্র, ঐতিহাসিক দলিল কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্যের সময়ে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা, সম্প্রদায় স্থাপন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ইত্যাদি ঘটিয়াছিল। ইহার পর হিন্দুরাজা, অভিজাত সম্প্রদায় ও মন্দিরের সংখ্যা বেশি হইল। তাঁহারা প্রবর্তিত হিন্দুশাস্ত্রের টীকা, আচার, রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। যখন বৌদ্ধদের সংখ্যা কমিয়া গেল তখন অনুমান করিতে হয় যে তাঁহার প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে লোপ পাইল। ইসলাম ধর্ম বিস্তারের অনেক লিখিত বিবরণ আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ইসলাম-ধর্মীর সংখ্যা বেশি কেন হইল? সে বিবরণ বেশি নাই। মুসলমান শক্তির কেন্দ্র উত্তর ভারতে ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার আগে সেখানে শতকরা ষোলজনের বেশি মুসলমান ছিল না। হিন্দুকৃষ্টির উৎকর্ষ উত্তর ভারতে ঘটিয়াছিল। হিন্দুদের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান উত্তর ভারতে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে হাজার বছর আগে ইহার কোনটিই প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু, বৌদ্ধদের প্রাধান্য সেখানে ছিল। সেখানে মরুভূমি, পাহাড়, গভীর অরণ্য বা কোন সুরক্ষিত প্রাকৃতিক আশ্রয় ছিল না। তারপর হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহের জন্য বৌদ্ধরা অনেকেই মুসলমান হইল। মুসলমান রাজত্বে ইহার উপর জাতিভেদ এবং সামাজিক পীড়নে বহু হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করিল। ইহার জন্যই আজ পূর্ববঙ্গে কোন কোন জেলায় শতকরা নব্বই জনের বেশি মুসলমান। এই মতবাদের সপক্ষে লিখিত দলিলপত্র বিশেষ নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া এই প্রকার সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। এইজন্য অধ্যাপক ট্রেভেলিয়ান বলিয়াছেন: "History, in fact, is a mother of rough guessing from all available facts."

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ইহাদের উদ্দেশ্য পৃথক। যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য এবং মূল্য।

ইতিহাস পড়িবার প্রয়োজন কি? প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয় পড়িতে ইতিহাসের জ্ঞান প্রয়োজনে আসে। ধর্ম, সাহিত্য, ভূগোল, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্থাপত্যশিল্প, রঙীন চিত্র, সকল বিষয়ই জানিতে পড়িতে ইতিহাস সাহায্য করে। বই ইত্যাদি পড়িয়া কোন কৌশলে কতকগুলি বিষয়বস্তু মনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিব, ইহা ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য নয়। বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান, মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করা এবং সন্দেহ হইতে নিঃসন্দেহ হওয়াই ইতিহাস পড়িবার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিককে মোকদ্দমার একজন সাক্ষী মনে করিতে হইবে। যতক্ষণ না তাঁহার আন্তরিকতা প্রমাণিত হইতেছে ততক্ষণ তাঁহাকে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি যদি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইতিহাস লেখেন, তিনি যদি নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার না করেন, তবে তাঁহাকে বিশ্বাস করা উচিত হইবে না। আচার্য যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে একজন আদর্শ ঐতিহাসিক।

ইতিহাসকে প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে কল ভয়ঙ্কর হইতে পারে। নাৎসী জার্মানী ইতিহাসকে মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা দলীয় উদ্দেশ্যে ইতিহাস শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। আবার অন্য ইতিহাস শিখিবার কলও ভাল হয় না। তাহাতে বরং কুসংস্কার বৃদ্ধি হইতে পারে। নির্ভেজাল ইতিহাস যত বেশি শিখাইতে পারা যায় মানবজাতির পক্ষে ততই ভাল।

সৌভাগ্যক্রমে ইতিহাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মে পড়ে না, এবং উহা তাহার কোন শাখাও নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন সূত্র যদি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে ঐ যুগের মতবাদ আগাগোড়াই ভুল। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত নয়। সিরাজদ্দৌলার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। তিনি নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্তমান তথ্যাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যায় তাঁহার হাত ছিল না এবং ঐ ঘটনা যে প্রকারে পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা আদৌ ঘটিতে পারে না। তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে তিনি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রে জড়িত কিছু যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে সূত্রটি আগাগোড়া মিথ্যা হয়।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিজ্ঞান অনুসরণ করিয়া চলিলে ইতিহাসপাঠ ও ঐতিহাসিক গবেষণা সুফল দেয়। মধ্যযুগে পোপ একটা জাল দলিলের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে সম্রাট কনস্টানটাইন রোমক সাম্রাজ্যের সমস্ত পার্থিব ক্ষমতা পোপকে (প্রথম সিলভেষ্টার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে) অর্পণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে পোপ এবং তাঁহার সমর্থকগণ এই দলিলের বলিয়াদে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিতেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে তৃতীয় চার্লসের সময় (৭৬৮—৭১) এই জাল দলিলগুলি লিখিত হইয়াছিল। সাতশত বৎসর ধরিয়া দলিলখানির সত্যাসত্য কেহই বিচার করেন নাই। অবশেষে লরেঞ্জোভালা বৈজ্ঞানিক উপায়ে লাতিন ভাষা আলোচনা করিয়া ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণ করিলেন যে দলিলখানি জাল (The Shorter Cambridge Mediaeval History Vol. II. 1103)।

সাক্ষ্য প্রমাণের যথাযথ সমাদর করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। তাহার ফলে যতটা সম্ভব নির্ভেজাল ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশ্বাসের স্থান আর থাকে না ("If men of science owe anything to us, we may learn much from them that is essential. For they can show how to test proof, how to secure fulness and soundness in induction, how to restrain and to

employ with safety hypothesis and analogy. It is they who hold the secret of the mysterious property of the mind by which error ministers to truth, and truth slowly but irrevocably prevails." Lord Acton: Inaugural Lecture on the Study of History in *Lectures on Modern History 21*)। বৈজ্ঞানিকেরা অত বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকেন না। তাঁহারা সব সময় পরিবর্তন নিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক ক্যারাডে বলিয়াছেন: "In knowledge, that man only is to be condemned and despised who is not in a state of transition." *Ibid 21.*

ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলেন তখন বিজ্ঞানের সংকীর্ণ অর্থে ইহাকে বিজ্ঞান বলেন না। তাঁহারা নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিহাসে রাখিতে চান। সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করিয়া সন্দেহজনক সব কিছু বাদ দিতে হইবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে ইতিহাস যে একেবারে পৃথক, তাহা না বলিলেও চলে। প্রথমটির উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী আবিষ্কার—যে সকল নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া বস্তুজগতে বিবর্তন হইয়া থাকে। প্রত্যেক অতীত ঘটনার সত্যতা ও প্রকৃতি বাহির করাই দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য। প্রথমটির লক্ষ্য সাধারণ নিয়মকানুন (general law), দ্বিতীয়টির লক্ষ্য পৃথক পৃথক ঘটনা (individual facts)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কোন পৃথক ঘটনার কারণ নির্দেশ একটা গৌণ উদ্দেশ্য। ইতিহাসে সাধারণ নিয়মকানুন একটি উদ্দেশ্য হইলেও উহা গৌণ। কারণ ঐতিহাসিক নিয়ম (law) প্রমাণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, উহা মোটামুটি এবং সম্ভাব্য সত্য মাত্র। ইতিহাসকে এই হিসাবে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে যে উহা সত্যানুসন্ধান।

কল্পনা এবং সৌন্দর্যের উপর কলাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। উহা সৃজনশীল, বস্তুজগত ব্যতীত নূতন একটি জগত তৈয়ার করিয়া দেয়। যেখানে সত্যের উপলব্ধিই উদ্দেশ্য সেখানে আর্টের স্থান আছে কি? এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কলিংউড বলেন:

কোঽন্তঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।
কবি-প্রজাপতীংস্ত্যক্ত্বা রম্যনির্মাণশালিনঃ॥ ৫॥
ন্যায়: স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতঃ।
ভূতার্থকথনে যত্ন দেবস্যেব সরস্বতী॥ ৭॥

ঐতিহাসিকের কর্তব্য হইতেছে সত্যের আবিষ্কার ও প্রকাশ। তাঁহার সরস্বতী হইবেন ভূতার্থকথনে দেবসী। তিনি হইবেন অনুরাগ এবং বিদ্বেষ-বর্জিত। কিন্তু প্রাচীনকে চাক্ষুষের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত করিতে ("কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং") হইলে ঐতিহাসিককে হইতে হইবে কবি, অর্থাৎ artist.

মেকলে ইতিহাসকে উপন্যাস করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের অপলাপ করিয়া উহা করিতে চাহেন নাই। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক পলিবিয়াস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেখক ঐতিহাসিকদিগের শীর্ষস্থানে বসিয়া আছেন, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। হানিবলের বিরাট ব্যক্তিত্ব তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উহা প্রকাশ করিয়াছেন রোমক ঐতিহাসিক লিভি। লিভি একাধারে সত্যানুসন্ধিৎসু এবং কবি। প্রাচীন থুকিডিডিস, লিভি ও বর্তমানকালে কারলাইল, মিশলে (Michelet), মেকলে প্রভৃতি একাধারে সত্যের উপাসক এবং কবি।

কিন্তু সকল ঐতিহাসিককেই কি এরূপ হইতে হইবে? যাঁহাদের স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা নাই তাঁহারা কি ঐতিহাসিক হইতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিকের স্থান হইতে

পারে না। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক শুধু সত্য ঘটনা আবিষ্কারে বিমুক্ত থাকিবেন। American Historical Association-এর সেক্রেটারী কল্‌বি (Colby) বলেন, "The zeal for accuracy and impartiality which has added so much of late to the value of historical studies renders the historians indifferent to the form in which they are presented." যাহারা খনি হইতে মর্মর আহরণ করে তাহারাও রূপশিল্পীর প্রয়োজনীয় সেবক, কিন্তু তাহারা সুন্দর মূর্তি অথবা ইমারত গড়ে না।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Bury : Selected Essays
2. Acton, Lord : Lectures on Modern History
3. Rowse, A. L. : The Use of History
4. Trevelyan, G. M. : History and the Reader
5. Ephrim : Recent Advances in Inorganic Chemistry

পরিদর্শনে বিভ্রাট

শ্রীআশিনাথ সেন

১। সে আজ বহুদিনের কথা। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তপসা একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল। এইখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ৺দীননাথ সেন। ইঁহারই পুত্র, স্বল্পসংখ্যক ডি. এল উপাধিধারীর অন্যতম, ডক্টর প্রিয়নাথ সেন হাইকোর্টে উদীয়মান উকীল ছিলেন, কিন্তু অল্পবয়সে মারা যান। তখনকার পূর্ববঙ্গের স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিল সাহেব, ১৮৮৪ সনে তপসা স্কুল পরিদর্শন করিতে যান। ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর বিদ্যাধর দাস (কুমিল্লার বিখ্যাত উকীল ভূধর দাসের পিতা), ছিল সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। স্কুলের আঙ্গিনায় একটি দেবালয় ছিল এবং তাহার সম্মুখে একটি শিবমূর্তি স্থাপিত ছিল। ছিল সাহেব, বিদ্যাধর বাবুর নির্দেশের ফলে, প্রথমেই তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক বুদ্ধিতে এই মূর্তিটি মানিতে গেলে, "ঠাকুরের জাতি নষ্ট করিয়াছেন" বলিয়া অতিযুক্ত হইয়া নিষেধ অগ্রাহ্য করেন।

২। ১৮৮০ সনে ৺দীননাথ সেন (উপরোক্ত একই নামধারী দীননাথ যাঁহার প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী) চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের অদূরবর্তী, মেহের কালীবাড়ী, হিন্দুদের একটি পীঠস্থান ছিল। দীননাথ ইহার নিকটেই একটি পাঠশালা পরিদর্শন করিতে যান। পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়কে পূর্বেই সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় মাসিক মাত্র ৮।৯ টাকা বেতন পাইতেন। পরিদর্শনের সংবাদে, আনন্দিত হইয়া, ৪ মাইল দূর হইতে কয়েকটি চেয়ার আনাইয়া রাখিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার পাঠশালার জন্য অন্ততঃ মাসিক ৫৲ টাকা সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তাঁহার জীবনে এমন সুযোগ আর ঘটে নাই এবং ভবিষ্যতে ঘটিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল যে প্রথমে পরিদর্শক পণ্ডিত আসিবেন; তারপর ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর এবং সর্বশেষে দীননাথ নিজে আসিবেন। এই বিবেচনায় তিনি চেয়ারগুলি

ঠিক করিয়া রাখেন নাই। ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহারা আসিলেই, উহাদের বাহির করিয়া বসিতে দিবেন।

এই পাঠশালা পরিদর্শন করিতে দীননাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রায় ৭ মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গীদের ভাল করিয়া খাইয়া লইতে বলিয়া, দীননাথ তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাস মত, তিন আনার ছোলা, আদা, লবণ ও লঙ্কেশ খাইয়া অগ্রসর হইলেন। ফলে কর্মঠ দীননাথ তাঁহার সঙ্গীদের বহুপূর্বেই, চট বিছান, খড়ের ঘুপ ঘরে পৌঁছিলেন এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতের পড়ানো শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সরল আড়ম্বরের পোষাকে, তাঁহাকে একটি পথচারী কৌতূহলী দর্শকই বোধ হইতেছিল। পণ্ডিতের শিক্ষাদান প্রণালী দেখিয়া দীননাথ বিস্মিত হইলেন। কয়েক মিনিট বই হইতে পড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয় কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের বাড়ীতে কত দামের কি মাছ আনা হইয়াছে। উত্তর হইল, সাড়ে ৫ আনার একটি ইলিশ মাছ। তিনটি আনিতে কত খরচ পড়িত? এইভাবে পাশের একটি ছেলেকে তালের দামের সম্বন্ধে এবং লোকসংখ্যা কত, প্রশ্ন করা হইল। পণ্ডিত মহাশয় প্রায় আধঘণ্টা পরে, একটি কেরোসিনের বাক্সে চট্ বিছাইয়া দীননাথকে বসিতে আহ্বান করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন যে তাঁহার কাজ করিয়া গেলে, কিছু যেন মনে না করেন। ইতিমধ্যে দীননাথের সঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দীননাথ রাস্তার উপর বসিয়া আছেন দেখিয়া পরস্পর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। পণ্ডিত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জীবনের একটি সুযোগ, নিজের ভুলে নষ্ট হইয়া গেল। দীননাথ পণ্ডিতকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। কালে পণ্ডিত যে সাফল্য আশা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন।

৩। লেখকের একবার কলিকাতা ডোম ও ডাব (মুক-বধির) স্কুল দিয়া পরিদর্শন কালে, বিভিন্ন বিভাগ দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া যাওয়াতে, স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ৮ আনার মিষ্টি আনাইয়া জলযোগ করাইলেন। গুমা-খরচ বহি পরে আফিসে আনাইয়া পরীক্ষা করা হইত। তাহাতে ইন্‌স্পেক্টরের জল খাওয়ার বাবদ ৮ আনা ইন্‌স্পেক্টর আফিস হইতে প্রত্যাখ্যাত হইল, এবং ঐ পরিবেশে লেখকের লজ্জার সীমা রহিল না।

———

পুস্তক-সমালোচনা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সৃষ্টিতত্ত্ব, মূল্য তিন টাকা।
Hindu Culture, মূল্য ১·৫০ টাকা
Standard of Life, মূল্য ১·৫০ টাকা।

উপরে যে তিনখানি বইয়ের নাম করা হইয়াছে সেগুলির লেখক শ্রীযুক্ত আশ্বিনাথ সেন, বহুবৎসরের শিক্ষকতা ও পরিদর্শনের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে তাঁহার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া বাণী দেবীর অর্চনা করিয়া চলিয়াছেন। বই তিনখানি সদ্য প্রকাশিত, ১৯৬০ সালের মধ্যেই। তিনি নিজেই ইহাদের প্রকাশক।

সৃষ্টিতত্ত্বে তিনি অণু-পরমাণুর কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। আলোর পরিচয় দিয়া অণু ও পরমাণুর গঠন, পার্থক্য ও রূপান্তরের কথা বলিয়া কোয়ান্টাম নিয়ম ও আপেক্ষিক নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়া পরমাণবিক বোমার গঠন ব্যাখ্যা ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। ১৪০ পৃঃ মধ্যে চিত্র সহযোগে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় তাঁহার এই আলোচনা বাঙালী পাঠকের নিকট ভাল লাগিবে আশা করি। বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে, এসব বিষয়ে তাহাদের কৌতূহলও বাড়িয়াছে। ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সূচনাতে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে সেন মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে; সমালোচকেরও সেই আশা।

Hindu Culture-এর ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক জীবনের ক্ষেত্রে বন্ধ ও মুক্তির কথা বলিয়াছেন—সুখ দুঃখের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বলিয়াছেন। এইসব আলোচনায় দার্শনিক বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

Standard of Life গ্রন্থে (৮১ পৃঃ) লেখক অর্থনৈতিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কমিউনিষ্ট নীতির পক্ষপাতী নিশ্চয় নহেন। তাহার মতে নূতন শ্রেণী গঠনের ফলে অবৃত নয়, সরলই উঠিয়াছে। তাঁহার আলোচনা (পৃঃ ৬২-৬৩) হইতে বোঝা যায় যে তাঁহার বিজ্ঞান-শিক্ষিত মন এবিষয়েও দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন।

অবশ্য আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত; তাহা দোষের নহে। লেখকের উদ্দেশ্য; পাঠকের আসিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত করা। তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। লেখকের নিজের জাগ্রত মনের প্রশংসা করি। এইভাবেই দীপ হইতে দীপ প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

১৮শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৬৬ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

মাতৃভাষা মাধ্যম বলিয়া স্বীকৃতি ?

চৈত্র মাসের শেষেও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ রাজ্যসভায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহকে তাহাদের যথোপযুক্ত স্থান দিতে পারেন নাই। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালীর পুনর্ঘোষণায় সরকার যে যথাসম্ভব শীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার পক্ষপাতী, তাহাই প্রকাশ পায়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি তাহাদের নিজ নিজ ভাষা নিয়ন্ত্রণের বা প্রবর্তনের ক্ষমতা রাখে। আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী কিংবা কোন আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে 'শিক্ষার মান' সত্য সত্যই কমিয়া যাইতেছে কি না তাহা প্রথম হইতেই দেখা দরকার।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাষার যথোচিত জ্ঞান থাকা কি অপরিহার্য নয়? তবে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে? ঐ সকল বিদ্যা যাঁহারা অর্জন করিবেন তাঁহাদের মাধ্যম কি ইংরাজিই থাকিবে, না সাধারণ বিদ্যের মধ্যে ইংরাজি আবশ্যিক বলিয়া গণ্য হইবে, বা ঐ আবশ্যিক ইংরাজির মানও বাড়ানো হইবে, বিশেষ করিয়া ঐ সকল বিদ্যার্থীর জন্য, সে কথা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। আগেকার যুগের লোকেরা ইংরাজিতে স্কুল করিত কম, কারণ ইংরাজি ছিল তাহাদের শিক্ষার মাধ্যম। ইতিহাসও তাহারা ইংরাজিতেই পড়িত, তা হউক সে বাঙ্গালীর ইংরাজি। ইতিহাসের সে অধ্যায় আমরা পার হইয়া গিয়াছি।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের কি হইবে? বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত বই সর্বদা পাঠ্য বলিয়া অনুমোদিত হয়, সেগুলি অনুবাদ করিয়া ফেলার কথা সরকার এতদিনে চিন্তা করিতেছেন। এবিষয়ে বহুপূর্বে, আজ প্রায় বারো বৎসর হইতে চলিল, কলিকাতার শিক্ষা সম্মেলনে বলা গিয়াছিল। যাহা হউক, রাজ্যসভায় শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে—দুই শত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং অনুবাদ সংক্রান্ত ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সরকার বহন

করিতে পারেন বলিয়া শোনা গেল। 'শনৈঃ পন্থাঃ।' কিন্তু বেশি শনৈঃ হইলে শনির দৃষ্টি পড়িবে যে!

কেন এত ছাত্র বিশৃঙ্খলা?

প্রতি বৎসর পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এত স্থান হইতে ছাত্র-হাঙ্গামার অভিযোগ আসে যে ইহা শিক্ষা ব্যাপারে এক প্রধান সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহার ব্যাপক আবির্ভাব এবার বেন চরমে দাঁড়াইয়াছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষা সম্মেলনে মেদিনীপুরে প্রধান অতিথি হিসাবে ডাঃ শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—যথা সন্তানের উপর পিতামাতার প্রভাব হ্রাস, ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকদের অক্ষমতা, নৈতিক আদর্শে শ্রদ্ধার লোপ, রাজনৈতিক বিক্ষোভ তথা উগ্র আন্দোলনের পরিবেশের প্রভাব, আপত্তিজনক চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, গ্রেসমার্ক দানের প্রথা। এই ছয়টি কারণের বিষয়েই ইতিপূর্বে সময়ে সময়ে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় কেহ নির্দেশ করেন নাই। সন্তানের উপর পিতামাতার প্রভাব হ্রাস হইল কি করিয়া, কি করিয়াই বা সে প্রভাব ফিরাইয়া আনা যায়; শিক্ষকদের ক্ষমতাই বা কি করিয়া বাড়ে; নৈতিক আদর্শে শ্রদ্ধা কিরূপে জাগ্রত হয়; রাজনৈতিক বিক্ষোভ তো থাকিবেই, সেই পরিবেশ হইতে ছাত্রসমাজকে কি করিয়া মুক্ত রাখা যায়, ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রহিতৈষীদের ভাবিতে হইবে বৈকি।

অনেক সহযোগী কারণগুলির মধ্যে উগ্র ও অশুভ রাজনৈতিক প্রভাবকেই প্রধান কারণ বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শিক্ষকগণের অভাব আছে, সে কারণে সমস্ত অভিযোগ আছে। তাহা দূর করার প্রয়োজন একান্ত হইয়াই আছে। ইহা সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই রাজনীতি নহে, এই সমস্যাকে সূত্র করিয়া দলীয় রাজনীতির সুযোগ-সন্ধানই শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, একদিকে আদর্শ পিতামাতার প্রভাবের অভাব এবং আদর্শ শিক্ষাব্রতীর প্রভাবের অভাব অথবা তাহাদের প্রভাব কার্যকরী হইতে পারিতেছে না, অপর দিকে উগ্র ও অশুভ দলীয় রাজনীতির প্রভাব ছাত্রগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। দৃষ্টিভঙ্গি-বোধের অভাব এই বিভ্রান্তিরই ফলশ্রুতি।"

মন্তব্যটি ভাবিয়া দেখিবার মত; তথাপি এখনও প্রতিকার নির্দেশ করা হইল না।

শরীর-শিক্ষা ও তাহার চর্চা

ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা আমরা পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। চৈত্র শেষে গোয়ালিয়র লক্ষ্মীবাই শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজোসেফ গোয়ালিয়রে এক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:

"জাতীয় শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। ব্রিটেনে ব্যাজ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎসাহব্যঞ্জক "শ্রম ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত" বাণীর জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণদের খেলার মাঠের ব্যাজ দেবার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়।...আমাদের দেশে আমরা কাজ শুরু করেছি।...প্রত্যেক বিদ্যালয়, কলেজ ও সংস্থাকে এই পরিকল্পনার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে, নিয়মিত অভ্যাসে উৎসাহ দিতে হবে এবং কতকগুলি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে তা পূর্ণ করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে হবে।"

ভবিষ্যৎ কালকে কিরূপ বর্তমানে আনা যায়, ইহাই আমাদের ভাবিবার কথা। শরীরচর্চা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ, আমরা প্রায় সকলেই স্বীকার করি; বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রয়োজন

যে আরও বেশি। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে বৈদেশিক অভিযান আসন্ন বলিয়া মনে হইলে সে প্রয়োজন অন্ত সকল দাবি ছাপাইয়া উঠিত। এই প্রয়োজন বোধের অভাবই হইল তমোগুণের প্রাচুর্য। এই আলস্য কবে দূর হইবে? দূর না হইলে যে আমাদের জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকাই কঠিন। বিশেষ করিয়া ছাত্রদের শরীর দৃঢ় না হইলে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমরা যেন এই অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে পারি।

শিক্ষণ-বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা

শ্রীমমতা রায়

শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় তৈরী করতে আমাদের দেশ খুব বেশি দেরী করেনি। ইয়োরোপ যে কালে এই বিষয়ে মনোযোগী হয়েছে আমাদের দেশেও প্রায় সেইকালেই হয়েছে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। কিন্তু উভয়দেশের ব্যবস্থার চরিত্রগত তফাৎ আছে। ও-দেশে যখন এই ব্যবস্থা থেকে ধর্মীয় প্রভাব অপসারিত করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হল, আমাদের দেশে তখন খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবই খুঁটি গেড়ে বসল। ১৮০৭ সালের দিকে (টিলজিটের সন্ধির সময়) প্রাশিয়াতে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল, সরকারকে সবল ক'রে তুলবার উপায়; শিক্ষা তখন তত্তটা মনোযোগের বস্তু নয়। অর্থাৎ সরকারের প্রয়োজনের জন্য, শাসন-কার্য সুনির্বাহের জন্য, গণশিক্ষাকে এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করা দরকার বলেই শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হল। মহামতি ফ্রেডরিকের গণশিক্ষার পিছনে এই-ই উদ্দেশ্য ছিল। পেস্টালৎসীর অনুপ্রেরণা এবং কোনিগ্‌সবর্গের মর্যাদা ইস্কুল (জিলায় স্থাপন করেছিলেন) শিক্ষার প্রেম নিয়ে এল বটে, কিন্তু প্রয়োজনবাদের সঙ্গে সেটি এল 'উপরন্তু'। ১৮০২ সালে ফরাসীদেশে বোনাপার্ট বুর্জোয়াদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন কেবল রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার কথা ভেবেই। এই দুই দেশেই সৈন্যবিভাগের কথা মনে রেখেই শিক্ষক তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। ইংলণ্ড ১৮০৬ সাল থেকেই (বেল সাহেবের ছাত্র-পোড়ো নীতিকে অনুসরণ ক'রে) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে গ্লাসগোর নর্মাল ইস্কুল (ডেভিড স্টো-র পরিচালনায়) এবং ১৮৪৬ সালে কে. শাটলওয়ার্থের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দিক দিয়ে একটা বাঁধা-ধরা নীতি এল।

মাদ্রাজের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশে ঐ সময়ে শ্রীরামপুরে পাদ্রীদের পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ধর্মের কথা ভেবেই এই শিক্ষক তৈরী। সমাজ বা শিক্ষার কথা ভেবে নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নায়কত্বে ১৮৫৫ সালে।

কাজেই আমরা এ বিষয়ে ইয়োরোপের সমসাময়িক। কিন্তু আমাদের এই প্রগতি বড় দুর্ভাগ্যেরই। হয়ত আমরা দেরী করলে ভালো করতাম। কিন্তু দেরী করা আমাদের উপর নির্ভর করেনি।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় চিরকালই উদ্দেশ্যদুষ্ট। যুদ্ধের সময় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে সৈন্যের যেমন

দরকার, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য শিক্ষকও তেমনি দরকার।

সৈন্যকে যেমন চিন্তার দিক দিয়ে খর্ব করতে হয়, শিক্ষককে তেমনি ঠুলি পরাতে হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ বিভালয়ে এই ঠুলি পরানোর চেষ্টা যুগে যুগে দেখছি। মাদ্রাজের টিচার্স এসোসিয়েশন ১৯০৭-১২ সালেও যা দেখতে পাই তার মূলে তো রীতিমত শুভচক্র-মুক্তির শিক্ষা রয়েছে (আমার কথায় হয়ত কেউ আপত্তি করবেন; কিন্তু ঐ সমিতির কার্যপন্থার আমার এরূপ মনে করা ছাড়া উপায় নেই)। কিন্তু কল্যাণধর্মা শিক্ষাব্রতীরা এই সব কথা বুঝতে পেরে অবিরাম প্রতিবাদ করেছেন। একজনের কথা তো মনে হয়, তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ইতিহাসের অধ্যাপক এস. এস. লরী। ১৮৭৬ সাল থেকে তিনি এই ঠুলি-পরানো নীতির নানাভাবে বিরুদ্ধতা করেছেন।

পূর্বে আমরা 'উদ্দেশ্যদুষ্ট' ব্যবহার করেছি। 'উদ্দেশ্যদুষ্ট'র দুটি ভাগ করা যায়, একটি 'উদ্দেশ্য-গর্ভ' আর একটি নির্ভুল 'উদ্দেশ্য-দুষ্ট'।

চীনের শিক্ষণ-ব্যবস্থা অনেক প্রাচীন, কিন্তু তা উদ্দেশ্যগর্ভ, ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থা উদ্দেশ্যগর্ভ কিন্তু তা সমগ্র সমাজকে আলোকিত করে আপার সফার করে। গ্রীকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা চীনের মতোই একচক্ষু। তারপর খ্রীষ্টীয় যাজকদের শিক্ষণে ছিল রাজশক্তি অপহরণ করবার ইচ্ছা। পরবর্তীকালে ইয়োরোপের গণশিক্ষা আর শিক্ষণের মূলে এল 'গ্রীকের নীতি', উপরন্তু শিল্প-বিপ্লবের ধর্মকে শক্তিশালী করবার ইচ্ছা। কোম্পানীর আমল থেকে আমরা পেলাম খ্রীষ্টীয় যাজকদের এবং শিল্প-বণিকদের নীতি দুটিকে। বর্তমানে আমরা শেষেরটি রেখেছি। যে-ধর্মই হোক তার একটা বিশেষ শক্তি আছে, প্রবঞ্চনার চেয়ে তার মধ্যে বেশি থাকে সমাজ-সেবা। মিশনরীরা এদেশে একচক্ষু হলেও সমাজ-সেবাকে বাদ দেয়নি। কিন্তু কোম্পানী থেকে সাম্রাজ্যের আমলে পরিবর্তনের মধ্যে এই হল যে, কোম্পানীর হয়ত ইচ্ছা থেকে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার শিক্ষানীতি স্থান ক'রে নিল।

মুদালিয়ারের শিক্ষা-আয়োগ শিক্ষকদের উন্নতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেমন ক'রে যেন সেই নীতিই স্বীকার ক'রে বসল। প্রথমত তাঁরা বলতে চাইলেন শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করা যায় কি করে; 'অবস্থা' অর্থ জীবন-যাত্রার অবস্থা। এই নির্দেশ খুবই স্পষ্ট, এত স্পষ্ট যে সরকারকে তা মেনে নিতে হলে নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে যে তাঁরা সামাজিক মর্যাদার (Social Status) কথা বলতে গিয়ে 'বড়ি মাছ না ছুঁই পানি' করেছেন—তার কারণ আর কিছুই নয়, সমাজ সম্পর্কে তাঁদের ধারণার অভাব। তাঁরা চেষ্টা ক'রে এই অকলে অস্পষ্ট হয়েছেন।

একথা ইতিহাস-বিরোধী হবে যদি আমরা বলি, বর্তমান কালের ইস্কুলের শিক্ষকের শিক্ষা-যোগ্যতা কম। সর্দার-পোড়ো ব্যবস্থা তো এখন নেই। কাজেই পূর্বকালে (পূর্বকাল কোন্ সময় থেকে জানিনা) যে বিষয়ে অধিকার নিয়ে শিক্ষক ইস্কুলে ঢুকতেন তার চেয়ে বেশি অধিকার নিয়ে এখন তাঁরা আসেন। কিন্তু একথা স্বীকার করবই যে পূর্বকালের আদর্শ শিক্ষকের চেয়ে এখন তাঁদের চারিত্রিক যোগ্যতা নেই। পূর্বকালের ব্যবসায়ী শিক্ষকের সঙ্গে তাঁদের হয়ত তফাৎ নেই। কিন্তু ঘোড়া সমাজতান্ত্রিক নীকার না করলেও একথা প্রত্যক্ষ যে, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন গান্ধীজীও দেশকে বিশেষ বিশেষ দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারেন। ইয়োরোপের স্বতন্ত্র-সমাজের পক্ষে একথা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু প্রাচ্যের পরিবারতান্ত্রিক সমাজে একথা সত্য। পরিবারের কর্তার, বা গাঁয়ের মোড়লের আদর্শ যেমন পরিবারে বা গাঁয়ে বহুকাল জীবন্ত থাকে, স্বতন্ত্রবাদীদের সমাজে তেমন নয়। কাজেই পূর্বকালের দু চার জন আদর্শ

শিক্ষকের নীতিই সমাজব্যক্তির মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করত। সেইভাবে তাঁদের আদর্শের দরুনই শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল। পরিবারতন্ত্রের সমাজে সামাজিক মর্যাদা আসে ব্যক্তির চরিত্র বা আদর্শকে আশ্রয় করে। এই সামাজিক মর্যাদা তাই দীর্ঘায়ু। কিন্তু স্বতন্ত্রবাদীদের সমাজে সামাজিক মর্যাদা আসে ব্যক্তির কর্মকে অবলম্বন করে, আর সে কর্মফল হচ্ছে সম্পদ। সম্পদকর্ষণার দুর্বার গতিকেই সে সমাজ স্বীকার করে। তাই এই সামাজিক মর্যাদা লক্ষ্মীর মতোই চঞ্চলা। মুদালিয়ারের শিক্ষা-আয়োগ এই স্বতন্ত্রবাদী সমাজকেই দৃষ্টিপথে রেখেছেন। তাই তাঁরা বলেছেন—সামাজিক মর্যাদা শিক্ষকদের দিতে হবে তাঁদের বেতনের কথা মনে করে নয়, তাঁদের সামাজিক উপযোগিতার কথা ভেবে; প্রধান প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বা প্রশাসনিক বিভাগ যেন তাঁদের আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের যেন খুব সম্মান দেন! এই কথা শুনে স্বতন্ত্র এবং পরিবারতন্ত্র এই উভয় সমাজ-ব্যক্তিই উপহাস করতে বাধ্য। উপহাস উল্লাস নয়, তাই তাঁদের কথায় সমাজব্যক্তি হবে উদাসীন।

মোটকথা, টাকা না হলে আর শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদাপ্রাপ্তির আশা নেই। এদেশ থেকে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা উঠে গেছে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। দ্বিতীয়বার নষ্ট হল, কন্ট্রাক্টরী বা সম্পদ-কর্ষণ মনোবৃত্তির যুগে।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় তাদের উপর আনল সমাজের বিরক্তি, কারণ সমাজ তাদেরকে রাজশক্তির একটি অঙ্গ ব'লে মনে করল। সমাজের মধ্যে বাস করেই তারা সমাজ-পরিত্যক্ত। আর কন্ট্রাক্টরী যুগ স্পষ্ট ক'রে নিল তাদের অকর্মতা কিন্তু প্রাচীন আদর্শের ভণ্ডামী।

কাজেই শিক্ষা আয়োগের নির্দেশে তাদের যদি কখনও অবস্থার উন্নতি হয় তবে তাদের ব্যক্তিগত-ভাবে শিক্ষকের জন্য সামাজিক মর্যাদা জুটবে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষকের যে সামাজিক মর্যাদা তা জুটতে পারে না। শেষোক্তটি চাইতে হলে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের চরিত্র বদল করতে হবে অথবা উঠিয়ে দিতে হবে। বদল করা সহজ নয়, তা আমরা বুঝেছি গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষক তৈরীর বিদ্যালয়ের সরকারী অপকর্ষ থেকে, বুঝেছি শান্তিনিকেতনের নবজীবন থেকে। গান্ধীজী বা রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শের আহ্বান করেছিলেন তা বিসর্জিত হয়েছে। এর পর হয়ত আমরা বলব, তাঁরা ছিলেন রোমান্টিক, যুগধর্ম মানেন নি।

কিন্তু আমার পূর্ব প্রবন্ধের (পৌষ মাসের) অনুসরণ ক'রে বলব, যুগ কেবল কয়েকটি গোষ্ঠীর উপর দাঁড়িয়ে নেই। তা দাঁড়িয়ে আছে ভারতের পল্লীসমাজকে নিয়ে। সে আছে, বড় নিষ্ঠুরভাবে আছে। সে আছে বলেই বর্তমান শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা জুটছে না, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা নেই বলেই ভারতে শিক্ষা নেই চরিত্র নেই। এই অশিক্ষিতদের নিয়ে দেশের শিল্পোন্নতি ঘটতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র ঘটবে না। রাজনৈতিক সেই দুর্যোগ থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

এই শিক্ষণ-শিক্ষা ভারতে পূর্বকালে কি ছিল? বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু যুগ পর্যন্ত দেখা যায়, শিক্ষক আর পৃথকভাবে কেউ তৈরী হতেন না। যে-কোন শিক্ষার্থীই শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষক হতে পারতেন। এরই মধ্যে একটু কথা আছে। যে-সব শিক্ষার্থী শিক্ষাশেষে ঘরে ফিরে এসে নিজেদের বৃত্তি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকতা করতেন না। যাঁরা শিক্ষাগুরু হতেন, তাঁদের শিক্ষাকালের শেষ ছিল না। আজীবন তাঁদের শিক্ষা চলত। তবু শিক্ষার সমাপ্তি বলছি এই জন্য যে, বিষয় শিক্ষা তাঁদের শেষ হত। শেষ হত না তাঁদের মননের দিক, যার আর একটি নাম চরিত্র-শিক্ষা, যাকে বর্তমান যুগে বলা হয় ডিসিপ্লিন।' বিষয়-শিক্ষাকে বলা যায় 'ট্রেনিং' বা 'নিউট্রিসন'

আর প্রয়োগ শিক্ষাকে বলা যায় 'ডিসিপ্লিন।' বিষয় থেকে যা আহৃত হল (নিউটিসন), তাই নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করবার মতো মনন শক্তি অর্জন করাকেই বলা হয় ডিসিপ্লিন বা ধ্যান। এই ধ্যান বা চরিত্র-শিক্ষা সমাজের কোলে বসে চলত না। সমাজ থেকে নিজকে বিযুক্ত ক'রে সমাজেরই চিন্তা করা সমাজেরই কল্যাণ করা ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষকদের সমাজসেবা। বৈদিক যুগের অনেক কথাই জানা যায়; তৎকালে সমাজব্যক্তির মধ্যে জুয়া খেলাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল বৃত্তি-ব্যবসায়ীদের প্রতি অবজ্ঞা। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তাঁরা অবজ্ঞা করতেন। যে কোন রকমের বৃত্তি শিক্ষাই হচ্ছে কারিগরী শিক্ষা, সঙ্কীর্ণ শিক্ষা। এই শিক্ষা মনকে সঙ্কীর্ণ করে, চিন্তাকে রুদ্ধস্রোত করে। মনকে উদার ও বিস্তৃত করবার যে শিক্ষা তাই-ই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা দেওয়ার মতো উপযুক্ত হওয়াই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বা ভবিষ্যৎ শিক্ষকের ছিল উদ্দেশ্য। তাই সেকালে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় না থাকলেও প্রত্যেক আশ্রম বা গুরুগৃহই হত শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়।

বৌদ্ধ যুগেও সেই এক ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এমন একটি সম্প্রদায় তৈরী করতে হবে যাদের আদর্শে যাদের শিক্ষায় সমগ্র সমাজকে উন্নত করা যাবে। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় সঙ্ঘের চরিত্রে এমন একটা নিয়ন্ত্রানুশাসন এল, এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা এমন ব্যাপক হয়ে গেল যে, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার দিকে মানুষকে ফিরে যেতে হল। তবে এবার আর পূর্বের মতো আশ্রমে নয়, গুরুগৃহে নয়—মন্দিরে।

মুসলমান যুগ পর্যন্ত প্রাচীন শিক্ষারীতির চরিত্র এমনি ছিল দেখতে পাওয়া যায়।

ইংরেজ আমলেই শিক্ষককে বৃত্তি হিসাবে পড়ানো হতে থাকে। এই বৃত্তি বা শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষকদের বিষয়জ্ঞান দিল কিন্তু প্রয়োগ-জ্ঞান দিতে পারেনি: তারা ট্রেনিং পেল কিন্তু ডিসিপ্লিনে এল না। এরা সমাজের সঙ্গে মিশে শুধু সংগ্রহ করে ইতিহাস লিখল, কিন্তু সমাজ-সেবা করতে পারল না। সমাজসেবার অর্থ সমাজের কেবল দুঃখ মোচনই নয়, সমাজের উন্নতি করা। বিদ্যাসাগর এই দুই রীতির মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে—প্রাচীন এবং নব্য, ডিসিপ্লিন এবং ট্রেনিং। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ট্রেনিং আনলেন, ডিসিপ্লিন শতকরা পাঁচও হয়ত থাকল না। এঁরা ব্যক্তিগত-ভাবে যাইই হউন, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে এঁরা সমাজকর্মী মাত্র, সমাজধর্মী নন। ঠিক বিচার করতে হলে বলতে হয় এঁরা সমাজ-সংস্কারক, কারণ সমাজের মধ্যে নতুনকে যোগ করেছেন, কিন্তু সমাজ-নিয়ন্তা নন।

আমি জানি, আমি একটি বিপজ্জনক বিতর্কমূলক কথার অবতারণা করেছি। বেশী প্রমাণ দিতে চাইনে; শুধু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই যথেষ্ট যে, বিদ্যাসাগর অবসর গ্রহণ করার পর বহুদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর তেমন কর্মকৃতির কথা জানা যায় না। এই যে তিনি ফুরিয়ে গেলেন বা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তার কারণ কি? মননশক্তির মধ্যে দুটি দিক আছে; একরকমের মননশক্তি আধিভৌতিক বা দেহধর্মী, মননশক্তি যেমন বেপরোয়া তেমনি সহসাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক মনন শক্তির তা হয় না। তার আলো অন্য আলোকের পথে মিলে যায়। একটি হচ্ছে বজ্র বিদ্যুতের আলো, আর একটি সুদূর দিগন্ত থেকে ভেসে আসা তারার আলো।

যাই হোক, আমার বলবার কথা হচ্ছে—শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হল উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের জন্ম। এই শিক্ষণ-বিদ্যালয় শিক্ষকদের কারিগর তৈরী হয়ত করতে পেরেছে, কিন্তু শিক্ষক তৈরী করতে পারেনি। জগতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এই ভুল বুঝতে পেরেছিল

বসেই শিক্ষাদর্শন শিক্ষাইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষণ-পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে শিক্ষা কারিগরী থেকে মনকে একটু ছাড়িয়ে নিতে পারা যায়। কিন্তু তাও সেই বিষয়জ্ঞানের মধ্যেই থাকল, কারণ যারা আসছে পড়তে, তারা রোজগারের জন্যেই আসছে। এইজন্য বর্তমানে আবার নতুন আলোচনা উঠছে, শিক্ষণ পাঠক্রম থেকে এই সব অকেজো দর্শন আর ইতিহাস তুলে দিয়ে প্র্যাকটিস টিচিং বেশি ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক, অর্থাৎ অতীতের ভুলটি আবার করা যাক।

ভুল করবার জন্যই ফিরে যাওয়া নয়। আর একটি উদ্দেশ্য আছে, তা হচ্ছে গণশিক্ষার দাবীর সঙ্গে চলতে গেলে কারিগর চাই। গণশিক্ষার দাবী উঠছে, কারণ এ ছাড়া তাদের ক'রে খাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। তারাও শিক্ষাকে চায় রুজি-রোজগারের জন্য, শিক্ষকও ইস্কুলে আসেন রুজি-রোজগারের জন্য।

এই স্বীকৃতি উত্তম কথা। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে, এ অবস্থায় সামাজিক মর্যাদাই বা দাবী করা হয় কেন, আর শিক্ষকদের আত্মত্যাগের মন্ত্রই বা দেওয়া হয় কেন। অবস্থার উন্নতি করতে হলে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা বা দেশের অন্যান্য গোষ্ঠী যেভাবে চাপ দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে নেয় সেইভাবে বাড়িয়ে নিলেই তো হয়। আর এ তরফে আত্মত্যাগের কথা না ব'লে তাদের সাধারণ মানুষ বা সমাজব্যক্তি মনে ক'রে চললেই তো হয়।

কিন্তু তা চলে না। যাঁরাই শাসনরজ্জুর মালিক হবেন তাঁদেরই দরকার হবে সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করার। জগতের এইই সাধারণ রীতি। সেই প্রবঞ্চনা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় দুই উপায়ে —পরিসংখ্যা-সবিনয়ের দ্বারা আর শিক্ষার দ্বারা। কাজেই শিক্ষককে চাই।

আর যাঁরা সত্যিই সমাজনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁদের দায়দায়িত্ব সমাজের শান্তি নিয়ে, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে। সেই গণতন্ত্র বজায় রাখতে হলে শিক্ষককে চরিত্রশিক্ষার পথে আনতে হইবে।

এইখানেই এসেছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্যই দরকার, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা সমাজের কাছ থেকে দাবী ক'রে পাওয়া যায় না, উপাধি বিতরণ ক'রে হবে না। তা পাওয়ার মতো যোগ্যতা আছে কিনা পুরুষানুক্রমে তা জনসাধারণ নীরবে লক্ষ্য করতে থাকে; তারপর এক সময় স্বতই তারা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে থাকে।

এই ইয়োরোপীয় পাপচক্রে স্বাধীন ভারত জড়িত। এই পাপচক্র থেকে উদ্ধার করবার মতো আজ প্রতিভাবানের দরকার, যিনি দেশের মর্মকে ঠিক দেখতে পাবেন, যিনি শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ে সেই ডিসিপ্লিনকে আনতে পারবেন। কিন্তু তা কি আর সত্যিই হবে।

কলা-শিক্ষা ঃ শিশুর দৃষ্টিতে

শ্রীদেবী প্রসাদ, ওয়ার্ধা

"বালকের কলাদৃষ্টির মধ্যে যে ভেদ হইল তাহার ফল। শিক্ষক এই ত্রুটিগুলি দূর করিতে থাকিলে দৃষ্টি ক্রমেই প্রাণহীন, মন ও ব্যক্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে।"

—ফ্রাঙ্ক বিঙ্কেক

কলা-শিক্ষা কেন, এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে সবই বয়স্কের দৃষ্টিতে ; শিক্ষকের দৃষ্টি কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহার বয়স হয় নাই। তাই তাহার দৃষ্টি বয়স্কের দৃষ্টি নয়।

যে পরিণাম ভাবিয়া বা হিসাব করিয়া বয়স্কের দৃষ্টি তৈরী হয়, শিশুদের সেরূপ হয় না। একাজের ফল কিরূপ হইবে, অথবা ইহার দ্বারা কিরূপ সংস্কার পড়িবে, শিশু তাহা ভেবেও না। সে তো প্রতিক্ষণ থাকে নূতন নূতন অনুভূতির সন্ধানে।

প্রত্যেক বস্তু সে পরীক্ষা করিতে চায়। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিতে চায়। যে বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করে তাহার মধ্যে সে খোঁজে আনন্দ। আর যদি সে বস্তুতে বা কাজে আনন্দ পায় তবে তাহা হইতে আবার করিয়া নূতন অনুভূতি পায়। শিশু তাহার চারদিকের সেইসব জিনিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, যাহা বয়স্ক লোকে চোখ মেলিয়াও দেখিতে চায় না, এমন কি যাহার বিষয়ে বয়স্কদের সচেতনতাও থাকে না। আসলে তো ব্যাপারটা এই যে শিশুদের জগৎ এক রকমের। বড়দের জগৎ ভিন্ন রকমের। উভয়েই থাকে নিজের নিজের দুনিয়ায়। উভয়ের দেখিবার ধরণ ও দেখিবার বস্তু পৃথক পৃথক। আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে শিশু যাহা দেখে বয়স্ক তাহা দেখে না। উভয়ের দেখিবার বস্তু একই। বয়স্ক যে লণ্ঠন দেখিতেছে তাহা শিশুও দেখিতেছে। কিন্তু বয়স্ক তাহাকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছে, শিশু দেখিতেছে অন্য দৃষ্টিতে। দৃষ্টান্ত ; বড় দেখে লণ্ঠনের আলো পরিষ্কার আছে কি না, শিশু হয়তো সেখানে একদৃষ্টিতে তাহার উপরে যে পোকা যাইতেছে সেদিকে তাকাইয়া আছে, অথবা হয়তো লণ্ঠনের চিমনি ময়লা হইয়া যাওয়ায় তাহার উপর যাহা কিছু দাগ ধরিয়াছে তাহা দেখিয়া আনন্দ পায়। হঠাৎ লণ্ঠন নিভিয়া গেলে শিশু সেই নিভিয়া যাওয়া অনুভব করিয়া খুশি হয়। খুশিতে সে 'হো' 'হো' করিয়া চিৎকার করিয়া ওঠে। বড়রা সেখানে 'লণ্ঠন নিভিয়া গেল' বলিয়া রাগ করে। অর্থাৎ শিশুর বয়স প্রতিক্ষণে নূতন নূতন অনুভূতি গ্রহণ করিবার সময়।

আর একটা কথা। শিশুর দুনিয়া যেমন বয়স্কের দুনিয়া হইতে পৃথক, তেমনি ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের মাপও উভয়ের একপ্রকারের নহে। বড়দের যাহা দেখিয়া ঘৃণা হয়, শিশুদের তাহা দেখিয়া মজা লাগিতে পারে। যেমন, শিশু যখন মাটির ময়লার মধ্যে খেলা করে, বা কোনও ময়লা বস্তুর মধ্যে হাত ঢুকাইয়া মজা পায়, বা একটা কেঁচো আঙুল দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাকে, তখন কোনও বয়স্ক ব্যক্তি সেপথ দিয়া গেলে প্রায়ই ধমক দিয়া বলে—এসব নোংরা ঘাটিতেছ কেন? উভয়ের দুনিয়া ও উভয়ের দৃষ্টি পৃথক রকমের হইয়া থাকে।

কলার আধ্যাত্মিক দিকে এরূপ হউক অথবা আদিকের দিক হইতে অন্যরূপ হউক, সেদিকে শিশুর দৃষ্টি থাকে না, শিশু তো খোঁজে আনন্দ। যদি সে উহাতে আনন্দ পায়, রস পায়, তবে উহাতেই তাহার মন ভরিয়া যায়।

আমার এই আলোচনা চিত্রকলা আর ড্রয়িং-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহাই আমার বিষয়। শিল্পকলায় শিশু আনন্দ পাইতেছে ইহা তো শিশুর সম্মুখে রং তুলি কাগজ রাখিয়া দিয়া ছবি আঁকিতে বলিয়া দিলেই বোঝা যায়। হয়তো এমন শিশুও আছে যে এই কাজ পছন্দ করিবে না। কেন যে কোন কোন শিশু রং আর কাগজে হাত লাগাইতে সাহস করে না, তাহাও আমি অন্য সময়ে আলোচনা করিব। অধিকাংশ শিশুই কিন্তু রং আর কাগজ দেখিলেই খুশি হইয়া যায়। ব্যতিক্রমের কথা তো বাদ দিতে হয়।

কাদা নিয়া খেলিতে খেলিতে শিশুর 'ঠাণ্ডা' আর 'মোলায়েমে'র যে স্পর্শানুভব হয় তাহাতেই সে আনন্দ পায়। ছবি আঁকিতে এবং ড্রয়িং করিতেও সে তেমনই ধরণের আনন্দ পায়। এখন দেখা যাক, কি কি রকম আনন্দ সে পায়।

ছুতোর বাড়ির শিশু যখন হাতুড়ি ধরিতেও পারে না, হাতুড়ির নামও শোনে নাই, তখনও বাবাকে কাজ করিতে দেখিয়া বাবার পাশে গিয়া বসে, আর বাবার কাজ দেখে। ক্রমে একদিন হাতুড়িখানা হাতে তুলিয়া উল্টা সোজা চালাইতে থাকে। বাবা যেমন করেন, ছেলেও তেমনই করে। তখন কি সে কিছু ভাবিয়া চিন্তা করিয়া, কাঠের একটা জিনিস বানাইবার জন্য হাতুড়ি চালায়, না, তখন তাহার শুধু কাজ করিবার, হাতুড়ি চালাইবার আনন্দ? হাত পায়ের চালনা, আঙুল চালনা এসব তখন তাহার পক্ষে মজার ব্যাপার, আনন্দের ব্যাপার।

কাজ কত রকমের! প্রকৃষকের কাজের জন্য মানুষের ভাবনা ভিন্ন রকমের, অনুশীলনের প্রভেদ আর কাজ করিয়া যে আনন্দ হয় তাহারও প্রভেদ। সূত্রধরের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার বা কাগজ পেন্সিল রং তুলি নিয়া কাজ করার যে সন্তোষ ও আনন্দ তাহা একরকমের নয়, কিন্তু দুইয়েরই আছে কাজ করার আনন্দ। শিশু ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অনুশীলনে আনন্দ পায়। চিত্রকলা বা ড্রয়িং-এ শিশু যে আনন্দ পায় তাহার এক বিশেষ মূল্য আছে।

কোনও কাজ শেষ করিয়া এবং নির্মাণাত্মক কাজ সম্পন্ন করিবার তৈয়ারি জিনিসটি দেখিলে একরকম আনন্দ পাওয়া যায়। শিশুর সামনে রাখা কাঠ ও যন্ত্রপাতি, কাদা বা রং, কাগজ ও কাগজকাটা কাঁচি শিশুকে এক ধরণের নিমন্ত্রণ জানায়, তাহাকে আহ্বান করে, বলে, 'দেখতো, আমাদের দিয়া কিছু তৈয়ারি করিতে পার কিনা!' শিশু উৎসাহে তাড়াতাড়ি যাহা কিছু বানাইয়া ফেলে তাহা দেখিয়া তাহার মনের ভাবটি হয়, 'দেখ, কেমন তৈয়ারি করিয়া ফেলিলাম।' কাজটা করিবার পর সে যে কিছু করিতে পারে এই আনন্দে শিশু উচ্ছল হইয়া ওঠে। সে কাজে 'পটু', এই আনন্দে তাহার চিত্ত ভরিয়া ওঠে। আর তাহার চরম সন্তোষ তো তখনই হয় যখন শিশুদের চিত্রপ্রদর্শনীতে সে নিজের আঁকা ছবি দেখিতে পায়। প্রথমেই সে দেখে, তাহার কাজটি এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে কিনা। যেই দেখে তাহারও ছবি আছে, অমনি সেখানে দাঁড়াইয়া পড়ে ও দেখিতে থাকে। অনেক দিন শুনিয়াছি, শিশু নিজের কৃতিত্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, দেখ, এটা আমার আঁকা ছবি, আমি কি সুন্দর ছবি এঁকেছি!

শিশুর বুদ্ধিতে কলা-শিক্ষার শিশুদের শব্দের ভাষা কম। কিন্তু উহাদের অন্য এক প্রকার ভাষা আছে। শিশুর মন জুড়িয়া থাকে যে সব গল্প আর অনুভব তাহার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে তাহারা পরস্পরের মনের কথা বলিতে ও বুঝাইতে পারে। একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। শিশুদের এই অনুভূতি শুধু শব্দের ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কাহিনী উহাদের মনে আকৃতি পরিগ্রহ করে। যেমন ধরুন, গল্পের মধ্যে পাহাড়ের

কথা আসিল। শিশুর মনে পাহাড় বস্তুটির আকার জাগিয়া ওঠে, শব্দটি নয়। অন্যকে কথাটা বুঝাইবার সময়ও যতক্ষণ সে তাহার মনে যে ছাপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার পুরাপুরি তৃপ্তি হয় না। মনে থাকে তো বস্তুর 'আকার', বস্তুর 'নাম' নয়। নামের প্রশ্ন তাহার কাছে গৌণ। এমন দেখা গিয়াছে, শিশু যখন ছবি আঁকিয়া বর্ণনা করে তখনই যেন সে তাহার মনের ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে।

মানুষের ধর্মই হইল নিজের অনুভূতির কথা সে অপরকে বলিতে চায়। শিশুদের এই ইচ্ছা অধিক প্রবল, আর আকারের সাহায্যেই তাহারা সবচেয়ে ভালভাবে এই ইচ্ছাকে সার্থক করিতে পারে। এটা তাহাদের অতিশয় আনন্দময় উপকরণ।

আমাদের এক ছাত্রের কথা হইতেছিল। একদিন সে একটি ছবি আঁকিয়াছিল, ছবির বিষয় ছিল, বৃষ্টি পড়িতেছে। একটি ছেলে ছাতা হাতে সামনের গাছে বাঁধা গোরুকে বর্ষার হাত থেকে বাঁচাইবার জন্য নিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ পা ফসকাইয়া বেচারি ছেলেটি পড়িয়া গেল। হাতের ছাতাও উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িল। এই ছিল ছবি! স্কুলে চিত্রকর এই ছবিটি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন সে উহাকে উঠাইয়া একটু দূরে রাখিল আর নিজে দূরে দাঁড়াইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল। আমিও যে উহাকে বেশ দেখিতে পাইতেছি তাহা বেচারি জানিতে পারে নাই। চিত্রের বিষয়-বস্তুতে সে এতই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে চিত্রের অসম্পূর্ণতা যেন তাহারই নিজের অসম্পূর্ণতা। আমি হঠাৎ দেখি, ছবিতে যেমন ছেলেটি পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, সে নিজে বারবার তেমন ভাবে পড়িয়া গিয়া ঐ অনুভূতি সকল করিতেছে। এই অভিনয়ে সে যে আনন্দ পাইতেছিল তাহা সত্যই গভীর। আরেকটি ছাত্র একদিন মোটরের ছবি আঁকিয়াছিল। আমি দেখিতেছিলাম, ছবি আঁকিবার সময় সে বারবার ড্রাইভারের হাতলের উপরে হাত চালাইবার ভঙ্গী করিতেছে, আর মুখ দিয়া মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, শিশু যখন ছবি আঁকে তখন সে নিজেই ছবির বিষয় হইয়া যায়। চিত্রের বিষয়বস্তু উহার শরীরে দোলা দেয়, মনে মনে সে নাটক করিতে থাকে। এই ভাব বড় বড় চিত্রকরদেরও হয়। চীনের চিত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গের ইতিহাসকার এই ধর্মের কয়েকটি কাহিনী বলিয়াছেন। যে চিত্রকর ঘোড়ার ছবি আঁকিবেন তিনি আপন শরীরে ঘোড়ার হেলিয়া দুলিয়া চলার গতিভঙ্গী অনুকরণ করিয়াছেন, এমন চিত্রকরের কথা বর্ণিত আছে। চিত্রাঙ্কনে এরূপ নাটকের প্রয়োগ-সম্ভাবনা শিশুদের পরম আনন্দ জোগায়।

শিশু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। সে প্রতিক্ষণ নব নব কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকে। মাটির ঘর তৈয়ারি করিল, অমনি তাহার মনে হইল বুঝি এটা কেল্লা, বুঝিবা রাজার বাড়ি। কয়েকটি ঘাস দাঁড়াইয়া বলে, দেখ রাজার সেপাই সামন্ত আসিতেছে। আর যদি রাজায় রাজায় যুদ্ধ দেখাইবার ইচ্ছা হয় অপরদিকেও কিছু তৃণ সাজাইয়া দিবে। বলিবে দুই রাজার সৈন্য লড়াই করিতেছে। বালুর উপরে গাছের ডাল পুঁতিয়া গর্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলে, মহল তৈয়ারি হইল। একটা কিছু কল্পনা করিয়া খেলা শুরু করে, আর করিতে করিতে তাহার মাথায় নূতন নূতন কল্পনার উদয় হয়। মাটি, বালি, ঘাস এইসব উপকরণ তাহার কল্পনায় সাহায্য করে।

শিশুকে প্রথম বর্ষেই ছবি আঁকিতে দিতে হয়। তখন উহার আঁকা ছবি যাহা বড়দের দৃষ্টিতে শুধু কাটাকুটি, শিশু তাহার মধ্যে পাহাড়, নদী,

মালা, আকাশ পর্যন্ত দেখিয়া লয়। শিশুদের এইসব চিন্তের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা যাইবে। কিন্তু এখানে বলিতে চাই যে এইভাবে ছবি আঁকায় শিশুদের কল্পনা-শক্তির উৎসাহ লাভ হয়। এই কল্পনা-জগতে এ ভাবের কবি-কল্পনা করায় শিশুর লাভ হয় আনন্দ।

মানুষের মনে সর্বদা কোন না কোন ভাবনা উঠিতে থাকে। এইসব ভাবনা কোন না কোনরূপে প্রকাশ পায়। ইহাদের বাহির করিয়া দিবার পথ চাই। আজ সূর্যোদয় দেখিয়া কোনও বিশেষ চিন্তা মনে আসিলে শীঘ্রই ইচ্ছা হয় যে কাহাকেও ডাকিয়া তাহা প্রকাশ করি। কবি হইলে কবিতা লিখিয়া নিজের চিন্তাকে রূপ দিবেন, চিত্রকর হইলে চিত্র আঁকিয়া। এইভাবে অনেক মাধ্যমের দ্বারা এই সকল চিন্তাকে রূপ দেওয়া হয়। আবার অনেক নূতন নূতন চিন্তাও মনে জাগে।

জীবন অর্থই হইল দেওয়া নেওয়া। প্রকৃতি হইতে নেওয়া ও প্রকৃতিকে দেওয়া, ইহাই জীবন। একটা ঘড়ায় জল ভরিলে তাহা ভরিয়া যাইবে। পুরা ভরিবার পর আর জল ভরা যাইবে না। উহা আর জল লইতে রাজি হইবে না। যদি উহাতে আরও জল ভরিতে হয়, তবে প্রথমে উহা খালি করিতে হইবে। অর্থাৎ নিতে হইলে দিতে হইবে। আর যদি নূতন জল না দেওয়া হয়, তবে প্রথমবারের জল ধীরে ধীরে পচিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে দুর্গন্ধ হইবে। এইভাবে মানুষেরও নিজের নিজের ভাবনা বাহির করিয়াই দিতে হয়। শুধু শিক্ষকেরাই তাঁহার বুদ্ধি দিয়া, তাঁহার আত্মশক্তি দিয়া অন্তরে অন্তরেই তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন। পচিয়া গলিয়া যাওয়ার সুযোগই সেখানে হয় না। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সচরাচর এরূপ করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া শিশুদের পক্ষে একথা খাটিতেই পারে না, কারণ তাহারা এসব ব্যাপারে সচেতন নহে। সেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি দিয়া মনকে দাবাইয়া রাখার প্রশ্নই ওঠে না। শিশুকে তো কোন না কোন প্রকারে এইসব চিন্তাকে রূপ দিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতেই হইবে।

চিত্রাংকণ প্রভৃতি কলার কাজের দ্বারা এইসব চিন্তা সার্থকভাবে প্রকাশ হয়। সুশিক্ষার কাজ হইল পরিকল্পনা এরূপ করা, যাহাতে শিশুদের এইসব চিন্তা সুন্দর ও সুস্থ রূপ লইয়া বাহিরে আসে। একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি উপস্থিত করি। যদি কোনও শিশুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'স্ফূর্তি' দেখা যায়, আর সে বিনা কারণে এদিক ওদিকে জিনিস-পত্র তছনছ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে শিক্ষকের কাজ হইল, শিশুর এই তছনছ করিবার চিন্তাকে কোনও কাজ দিয়া সুন্দর রূপ দেওয়া। খুব পরিশ্রমের কাজ দিলেও এই বৃত্তি অনেক দূর পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে। বাগান করিতে গেলে মাটি খুঁড়িতে হয়। মূর্তি গড়িতে হইলে খোদাই প্রভৃতি কাজে কুমারের কাজে খুবশক্ত মাটি ছানিতে ঘাম পর্যন্ত বাহির হইতে পারে। এই প্রকারের অনেক কাজ আছে। চিত্রকলার দ্বারাও ইহার সুন্দর রূপ দেওয়া যায়। শিশু হয়তো এমন ছবি আঁকিবে, যাহাতে খুব মারধোর, লাঠালাঠির বিষয় আছে। কোন্ চিন্তাকে কোন্ কর্মের দ্বারা বাহির করিতে পারা যাইবে, তাহাতো শিক্ষক অবস্থা বুঝিয়াই ঠিক করিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে তো আমরা বলিতে চাই যে চিত্রকলাও এইসব চিন্তা বাহির করিয়া দিবার সুন্দর ও স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়। এইসব চিন্তা বাহির হইয়া গেলে যে আনন্দের অনুভব হয়, তাহার খুবই গুরুত্ব আছে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই আনন্দের অনুভব, যাহাকে স্ফূর্তির বোধও বলা যায়, অতিশয় প্রয়োজনীয়। এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে এইসব কর্মের দ্বারা শিশুর মনে যদি কোনও ভয়ও জন্মে, তাহা হইলে সে ভয়ও প্রকাশপথে বাহির হইয়া দূর হইয়া যায়।

কলার কাজে কেন শিশুর রুচি, ইহার কিছু কিছু কারণ উপরে দেওয়া হইল। পরিশেষে এক প্রয়োগের কথা উল্লেখ করি। শিশুরা পুস্তক লিখিবে, এই ছিল 'প্রয়োগ।' বিষয়বস্তু রচনা করা, তাহা চিত্রিত করা, সুন্দরভাবে লেখা, মলাট প্রস্তুত করিয়া তাহার মুখপত্র বানানো, তাহা প্রকাশিত করা, এইসব ছিল কাজ। শ্রেণীতে তেরটি বালক ছিল, গড়ে চৌদ্দবৎসর বয়সের। বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে এই কাজ করার কথা ছিল। একজন ছাত্রের সঙ্গে কথায় কথায় বই লিখিবার কথা আলোচনা হইল। আমি তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে বই লেখা এমন কিছু একটা বড় কাজ নয়, সেও ইচ্ছা করিলে নূতন নূতন বই তৈরী করিতে পারে। কথাটা তাহার খুবই মনে লাগিল; সে স্থির করিল যে সে অবশ্যই একটা বই লিখিতে চেষ্টা করিবে। দুইদিন পরে নিজের বন্ধুদের নিকট কথাটি বলিল। ছেলেদের মধ্যে খুব ফূর্তি। তাহাদের ছয়জন স্থির করিল, নিজে নিজে বই লিখিবে। সকলে নিজের নিজের বিষয় বাছিয়া লইল, পরের দিন হইতে ছবি তৈরী করিতে আরম্ভ করিল। ষোল দিন পরে ছয়টি পুস্তক তৈরী হইল। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা শিশুরা প্রায়ই এ সব লেখে। গল্প প্রভৃতি 'সচিত্র' করার জন্যও কোন কোন স্কুলে উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু এই ছেলেরা যে রামায়ণ-মহাভারতও লিখিবে, তাহা কল্পনাও করি নাই। এই ছেলেরা নিজেরাই বা এ বিষয়ে কি ভাবিতে পারিত? এখানে এ কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পুস্তকগুলির মান কিরূপ হইল, কোন স্তরের উপযোগী হইল, তাহাও বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমার তো মনে হয় যে সাধারণত যেরূপ সাহিত্য ছেলেদের জন্য রচিত হয় তাহার মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠস্তরের সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের তুলনা হইতে পারে।

এখানে তো শিশুদের উপর এই কাজের কি প্রভাব হইল, সে কথা বিবৃত করাই আমার প্রধান বক্তব্য। যেদিন বইগুলি তৈরী হইয়া আসিল, সেদিন একটি বালক আমাকে খুব ভাবাবেগে বলিল, "কালও ভাবি নাই যে আমার বই এত ভাল হইবে।" আর একজন খুব চিৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, সত্যই তো আমার বিশ্বাসই হয় নাই যে বই তৈরী হইবে, না আর জানি কি হইবে।"

এই যে শিশুদের আত্মদর্শন হইল, ইহাই বড় কথা। শিশু এক শক্তির ভাণ্ডার। উহার মধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে। সে এরূপ কাজ করিতে পারে যাহা বয়স হইয়াছে বলিয়া আমরা সঙ্কোচ বশে করিতে পারি না। পুস্তকগুলি লিখিবার পর এই আত্মদর্শন হইতে তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের মধ্যে কতখানি শক্তি আছে। এই ব্যাপার আমি প্রথম হইতেই সর্বদা অনুভব করিতাম। কলার প্রত্যেকটি কাজ মানুষকে আত্মদর্শন করায়। নিজের ভিতরে যাহা আছে তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া যাওয়াই আত্মদর্শনের প্রক্রিয়া। কিন্তু উপরে বর্ণিত প্রয়োগের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই প্রকার শক্তির সন্ধান পাইলাম। এইরূপ আত্মদর্শন শিশুদের তো আনন্দ দান করেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশের এক খুব বড় উপায়ও হইয়া দাঁড়ায়।

ভিতরে এতখানি সৌন্দর্য, এতখানি শক্তি আছে একথা অনুভব করিলে শিশু আরও সুন্দর ও শক্তিশালী হয়।

কলা-শিক্ষার দ্বারা শিশুর যে সামগ্রিক বিকাশ হয় তাহার মধ্যে আনন্দলাভের অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশির ভাগ ছেলেরা কলার কাজে এইজন্য রস গ্রহণ করে যে তাহার দ্বারা আনন্দ পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা কলা-প্রবৃত্তির দ্বারা কি ভাবে আনন্দলাভ হয় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। এইরূপ আরও আলোচনা

হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের যদি এ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যায় যে আনন্দবোধ শিশুর অন্তরের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাহা হইলে কলার কাজ শিক্ষা তালিকায় তাহার উপযুক্ত স্থান অনায়াসেই করিতে পারিবে।

*শ্রীদেবীপ্রসাদের 'বাল্যে কলা ও তার শিক্ষা' হইতে।

আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

শ্রীচরণেষু

মাষ্টারমশাই, আজ আপনাকে গ্রীষ্মাবকাশের অভিজ্ঞতার কথা লিখিব। সেখানে একটি ছেলের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহার বাড়ী শিকাগোর ৫০ মাইল দক্ষিণে ক্যাংকাকী শহরে। তাহার বাবা সেখানকার এক কারখানায় কাজ করেন। একজন উপরিওয়ালা ঘণ্টায় ১ ডলার ৪০ সেণ্ট হিসাবে আমার জন্য চাকুরী দিবার প্রতিশ্রুতি ছেলেটিকে দিয়াছিলেন। সেইজন্য জুন মাসের ৯ তারিখে ছেলেটির সঙ্গে ক্যাংকাকীতে পৌঁছিলাম। ডলার সেণ্ট সংকেতে এইভাবে এদেশে লেখে—S 1·40

ক্যাংকাকীতে Y.M.C.A আছে। যে কোনও দেশের Y.M.C.Aর সভ্য হইলে সুবিধা পাওয়া যায়। এ দেশের Y.M.C.A-তে শুধুমাত্র থাকিবার ব্যবস্থা আছে; খাইবার ব্যবস্থা নাই। একা থাকিবার জন্য ছোট একটি কামরা সাপ্তাহিক ৮·৫০ ডলার হিসাবে ভাড়া লইলাম। এ দেশে ঘর ভাড়া লইলে সঙ্গে সঙ্গে বেশ দরম বালিশ, বিছানা, চাদর, তোয়ালে, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি পাওয়া যায়। শীতকালে ঘর গরম রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দেশের সব জায়গায় এই একই নিয়ম। সপ্তাহে একবার বা দুইবার বিছানার চাদর এবং তোয়ালে বদলাইয়া দেওয়া হয়।

ঘর ভাড়া করিয়া ছেলেটিকে লইয়া কারখানায় গেলাম। তখন এ দেশে ইস্পাত কারখানায় দেশব্যাপী ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। এই কারখানার কাজের জন্য তখনও কিছু ইস্পাত মজুত ছিল; সেইজন্য কারখানা চালু ছিল। কারখানায় গেলে পর ছেলেটির পরিচিত লোক বলিলেন যে যুদ্ধ বিভাগের কাজ সেখানে হইতেছে। প্রত্যেক কর্মীকে শপথ লইতে হয় যে সে কমিউনিষ্ট মতবাদ সমর্থন করে না, বা নিজেও কমিউনিষ্ট নয়। তারপর নিয়ম অনুযায়ী কোনও বিদেশীকে কাজে নিয়োগ করা যাইবে না। ছেলেটি বিরক্ত হইল। আমি বিদেশী; মাত্র গরমের মধ্যে কাজ করিব তাহা আগেই পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছি। তাকিয়া আসিয়া এখন বিদায় করিয়া দেওয়াতে বড়ই বিরক্ত হইল; আমারও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবার মত অবস্থা। সে তাহার বাবার সুপারিশ লইবে না। সে চলিয়া আসিল; আমিও তাহার পিছনে আসিলাম।

ছেলেটি আমাকে নিয়া Employment Office-এ গেল। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে ধর্মঘট হওয়ায় ইস্পাত সরবরাহের উপর নির্ভরশীল অনেক কারখানা বন্ধ হইয়াছে বা হইবার উপক্রম। তবু আমার নাম লিখিয়া রাখা হইল। যদি কোনও কাজ পাওয়া যায় তবে খবর দেওয়া হইবে। কিন্তু

বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে কোনও কাজ জুটিল না। টিকা কাজ দুই তিনটা পাইয়াছিলাম। এক সিনেমা ঘরে দুই রাত্রি পুরানো চেয়ার সব তুলিয়া দিয়াছিলাম; রাত্রি ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কাজ। আড়াই দিন চিঠি পত্র রাখিবার কাইল তৈয়ারী করিবার কারখানায় কুলীগিরি করিয়াছিলাম। আর এক দোকানে এক বিকাল মাত্র কাজ করিয়াছিলাম। ঐ সহরে যে লাইব্রেরী ছিল সেখানে গিয়া পড়াশুনা করিতাম। Thesis লিখিবার উপকরণও কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

অবশেষে নিজের চেষ্টায় এক কাফেতে কাজ জুটিল। কাফে, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতি খাইবার টেবিলে মেয়েরা পরিবেশন করিবে। যাহারা মোটরে চলিবার পথে যাইতে যাইতে খাইতে চায় তাহারা ঘরের মধ্যে আসিবে না। তাহাদের জন্য "Drive in" কাফে; অর্থাৎ কাফের পাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকে, সেখানে মোটর আসে। এক প্রকার ট্রে আছে যাহা মোটর গাড়ীর জানালায় আটকান যায়। তাহার উপর চাহিদা মত খাদ্য পরিবেশন করা হয়। সেখানে ছুটিয়া ছুটিয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া অল্পবয়সী মেয়েরাই সেখানে কাজ করে।.....

মালিক আমাদের সাথে সমানে কাজ করিতেন, একই উর্দি পরিতেন ও একই খাদ্য খাইতেন। জাপান হইতে আগন্তুকদের নিকট শুনিয়াছি, জাপানে ছোট ছোট কারখানায় মালিক কর্মচারীদের সঙ্গে একই ঘরে একই খাবার খাইয়া থাকেন। আমি দুই দিন রান্না করিয়াছি; কয়েকদিন রান্নার যোগাড় করিয়াছি, এক সপ্তাহ রাত্রি ১টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত বাসন ধোয়া, ঘর মোছা প্রভৃতি ধোয়া মোছার কাজও করিয়াছি। শেষে একদিন automatic machine-এ কাপ প্লেট ধুইয়াছি। মেসিনের মধ্যে কাপ প্লেট রাখিয়া হাতল ঘুরাইয়া দিলে দুই মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ হয়। ধুইবার সময় দেশের কথা বার বার মনে পড়িত। দেশে মেয়েরা যদি এমনি একটা মেশিন পান তবে অনেক কষ্ট লাঘব হয়।

মাত্র দুই সপ্তাহ সেখানে কাজ করিয়াছি। এদেশে প্রায় সব জিনিসের রান্না নাম মাত্র। মাংস নামমাত্রভাবে রান্না হয়। কাঁচে এবং ছোটখাট রেস্টুরেন্টে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা কাঁচা কিমা মাংস ব্যবহার করা হয়। কিনিবার সময় তাহার আকার গোল দলার মত থাকে। গ্যাসের উনন ব্যবহার করা হয়। উননের উপর চ্যাপ্টা লাল ইস্পাতের তাওয়া থাকে। মাংসের দলা উপরে রাখিয়া পুন্তী দিয়া চ্যাপ্টা করিতে হয়। কিন্তু পুন্তী আমাদের দেশের মত নয়—দালানে দেওয়ালের উপর ইট গাঁথিবার সুরকী নাড়াচাড়া করিতে যে কর্নিশের প্রয়োজন হয়, পুন্তী দেখিতে সেই কর্নিশের মতো। চাপিলে মাংস হইতে যে রস বাহির হয়, সেই রসেই মাংস ভাজা হয়। তিন মিনিটেই কাজ শেষ। তারপর, বনে রুটির মত গোলাকার কাটা দুই টুকরা পাউরুটির মধ্যে ঐ মাংস চাপিয়া দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে রুচি অনুযায়ী পনির (Cheese), পিঁয়াজ, টম্যাটো, ও লেটুস একটার পর একটা সাজাইয়া দিতে হয়। ইহাকে কোথাও hamberger বলে, কোথাও beef-berger বলে, কোথাও cheese-berger বলে, কোথাও বা অন্য একটা নাম দেয়। ইহা ছাড়া, আণ্ডে খোসা ছাড়াইয়া ডিম ভাজা হয় (পোচ)। কাগজে জড়ানো পাতলা মাংসও ভাজা হয়; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

একটা জিনিস দেখিলাম, অনেকেই এই হাতের কাজের চাইতে কেরাণীগিরি করিবার মত আরামের কাজ খোঁজে। যাহারা হাই স্কুলের পড়া শেষ করে না তাহাদের সংখ্যা কাফে রেষ্টুরেন্ট-এ বেশি। এখানে উপার্জন সব থেকে কম। সাধারণত ঘণ্টায় ৭৫ সেন্ট মাত্র; যেখানে বিশেষ পরিশ্রমের কাজ সেখানে ইহার ৩।৪ গুণ উপার্জন। এইজন্য

স্ত্রীলোকের সংখ্যা রেষ্টুরেণ্টের কাজে অনেক বেশি। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম যে নিজের বাড়ী আছে, স্বামী চাকুরী করেন, ৩।৪টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তবুও মেয়েদেরও আয় করা চাই; বাড়ীতে বসিয়া থাকার চেয়ে যদি সপ্তাহে উপরি কিছু আয় করা যায় তবে তাহা বর্ত্তমানে তো কাজ দিবেই; ভবিষ্যতেও দিবে। অতিমাত্রায় কাজ কেহই করিতে চায় না, আবার শুধু বসিয়া থাকিতেও চায় না। ইহাদের সমাজের গঠন যে প্রকার, পারিবারিক রুচি, প্রথা এবং আচার যাহা, তাহাতে আমাদের দেশের মেয়েদের মতো হাড়ি ঠেলিতেই অর্ধেক দিন যায় না। বাড়ীতে যে রান্না হয় তাহা এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করা যায়। বাড়তি রান্না রেফ্রিজারেটর-এর মধ্যে রাখিয়া ইচ্ছামত খাওয়া যায়। একান্ত যে গরীব তাহারও একটা আইস বক্স আছে। গাজর, কপি, লেটুস, টম্যাটো, শালগম, বীট প্রভৃতি কাঁচা খাওয়া প্রথা; আমাদের দেশের মত তেল গরম মসলা, ঘনে, জীরা, প্রভৃতি দিয়া গুরুপাক খাদ্য অন্য কোনও দেশে নাই। এ দেশের বার টাকা দামের স্লেটও খাইয়াছি; আমাদের দেশের মত অত তেল, ঘি, মসলার ছড়াছড়ি কোথায়ও দেখি নাই। আমাদের আয় কম, স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য খুবই কম জোটে; যাহাও জোটে তাহা রান্নার দোষে আমাদের অনেক সময় উপকার করিবার পরিবর্তে অপকার করে। ১৯৩৮ সালে হলাণ্ড দেশে দশ টাকার স্লেট খাইয়া আমার এক আত্মীয়ের বমি হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কারণ মাছ অধসিদ্ধ ছিল। জাপানীদের রান্না তাঁহার একেবারেই অপছন্দ, কারণ সুসিদ্ধ নয়। অথচ, কাঁচা তরকারীও তাঁহার অপছন্দ। অন্তে পরে কা কথা—আমার সন্ন্যাসী মেজ মামা একদিন গাজর দেখিয়া চমকাইয়া বলিয়াছিলেন, গাজর ঘোড়ায় খায়। ডাঃ অকরয়েড-এর বই আনিয়া দেখাইলাম যে কতগুলি ভাইটামিন গাজরে আছে। কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। ঐ গাজর মসলা দিয়া রাঁধিয়া খাইতেও আপত্তি—কারণ, ঘোড়ায় খায় গাজর! আলুভাজার সঙ্গে টম্যাটোর চাটনী মাখিয়া খাইয়া ইহারা বলিবে "delicious"! আর আমরা দেখিলে অবজ্ঞা করিব। অথচ, আমাদের রান্না ঘরে মসলা হাড়ি বাসন থাকিবে। যে কাপড় পরিয়া রান্না করা হয় তাহা এ দেশে জুতা মুছিবার জন্যও কেহ ব্যবহার করিবে না।

লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে বাড়ী করা হয় তাহার রান্নাঘরের পাশের নর্দমা সহরতলীর নর্দমাকেও লজ্জা দেয়। বাড়ীর মালিককে চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও ভ্রূক্ষেপ করিবেন না; বরং সেজন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করিতে বলিলে অপব্যয় মনে করিবেন। 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'।

দুই সপ্তাহ কাজ করিয়া সেই কাগজের ফাইল তৈয়ারী কারখানায় আবার এক চাকুরী পাইলাম। কারখানা অনেক দিনের; বাড়ীটা বোধ হয় তিন বিঘা জমির উপর। এদেশে ইহাকে ছোট কারখানা বলে। কিন্তু ভাল জিনিস তৈয়ারী করা হয় এবং জিনিসের মান খারাপ হয় না বলিয়া সুনাম আছে। অটোমেটিক মেশিন দিয়া কাগজ কাটিবার ভার আমার উপর ছিল। ঘণ্টায় ১২৫ ডলার আয়, শনিবার দেড়গুণ। আমাকে দ্বিতীয় শিফ্‌টে কাজ করিতে হইত, সেজন্য ৫ সেণ্ট বেশি পাইতাম। বিকাল ৪-৩০ হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কাজ; শনিবারে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত। দুই চারজন লোক মাত্র রবিবারে কাজ করে—তাহাদের পাওনা দুই গুণ। শনিবারে ও রবিবারে যে এই অতিরিক্ত বেতনের নিয়ম, তাহা দেশের সকল কলকারখানার প্রযোজ্য; কৃষি ও ফসল সম্পর্কীয় কারখানায় এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। আর একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। শনি-রবিবার ছাড়া সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশি কাজ হইলেই দেড়গুণ বেতন দিবার নিয়ম।

শুনিতে যদিও আমার কাজ ছিল আরামের, কিন্তু এক জায়গায় ছিল "ভাল গাছের আড়াই হাত।" অড়ান কাগজের রোলের ওজন থাকিত ১০০০ পাউণ্ড থেকে ১২০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। ঠেলিয়া লিয়া কলে চাপাইতে প্রাণান্ত। তারপর, চুলচেরা হিসাব করিয়া চাপাইতে হইবে, একটু এদিক ওদিক হইলে, চলিতে চলিতে মেশিন বিভ্রাট ঘটাইবে। নিয়ম ছিল যে আমাকে দৈনিক ৫০,০০০ কাগজ কাটিতে হইবে। আমি ৩৭০০০ পর্যন্ত কাটিয়াছি—বেশি আর পারি নাই। এইজন্য ১৪ দিন কাজ করিয়া চাকুরী খতম হইল।

এই কারখানা এবং অন্য সব কারখানায় দেখিয়াছি যে কেরানী মাত্রেই মেয়ে; কালেভদ্রে পুরুষ কেরানী চক্ষে পড়ে। দোকানেও মেয়ে কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বেশি। শুধু পরিশ্রমের কাজে, চেয়ারে বসিয়া কাজ নয়, পুরুষের সংখ্যা বেশি। বড় বড় কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকে; Help wanted Female; Help wanted: Men. বিজ্ঞাপনে মেয়ে কর্মচারীদের চাহিদা বেশি থাকে। কারণ, প্রধানত কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য প্রায় ৩৫,০০,০০০ সবল সুস্থ পুরুষ সৈন্য বিভাগে আটক; বেসামরিক পরিশ্রমের কাজে পুরুষের চাহিদা বেশি। কম শ্রমের কাজে বেতন কম; পুরুষেরা সাধারণত অত কম পয়সায় কাজ করিতে চায় না। স্কুলের শিক্ষকরাও গরমের ছুটিতে বেশি খাটুনির কাজ করিয়া বেশি পয়সা আয় করিবেন, কিন্তু কেরানীর কাজ করিবেন না। সেইজন্য স্ত্রীলোকের চাহিদা বেশি। পুরুষদের চাইতে তাহাদিগকে সুযোগ সুবিধার অল্প বিস্তর বেশি দেওয়া হয়। কারখানায় তাহাদের হাত মুখ ধুইবার জায়গাটাও একটু বেশি ফ্যাশানের।

(বারান্তরে সমাপ্য)

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY.

শিক্ষা

মা বিদ্যা কল্যাণকৃৎ কস্যচিদ্ দুর্গতির্ভবতু গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৬৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

প্রতিবার বৈশাখে মাস তাহার নিদাঘ তাপের সহিত আনে শ্যামল ছায়া—কাব্যের ছায়া—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্নিগ্ধ নবপরিচয়। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবৎসর রবীন্দ্রজয়ন্তীর বিশেষ গুরুত্ব আছে—শতাব্দীর জয়ন্তীতে সমারোহ অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তার জন্য চাই দেশের সকলের সহযোগিতা, তাহার চেয়েও বেশি সকলের আগ্রহ, চেষ্টা ও কর্মতৎপরতা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো আমাদের জাতীয় জীবনের বহুদিকে, সে প্রভাবের ধারণা ও সে প্রভাব বিচার করিয়া গ্রহণ, দুই-ই সাধনা সাপেক্ষ। এই সাধনাই এবার আমাদের শতাব্দীর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ফুটিয়া উঠুক। আমাদের সংস্কৃতির যাঁহারা ধারক ও বাহক তাঁহাদের এবিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা না বলিলেও চলিবে।

শিক্ষার মাধ্যম

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম যে কি হইবে তাহা লইয়া বিতর্কের শেষ নাই। এবিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট মতামত বহুবার প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু বিদ্বজ্জনের মত অস্পষ্টরূপ। তাঁহারা রাজ্যসভায় বলিয়াছেন যে এই নীতি "আত্মঘাতী" এবং আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যম হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের "সঙ্কীর্ণতা" আসিবে। মাতৃভাষাকে পুরাপুরি সম্মান কি কোনও দিনই হইবে না? অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে যে ইহা লইয়া পরীক্ষা হইতেছে না, তাহা নহে। হয়তো এইরূপ বিস্তৃত পরীক্ষা হইতেই শেষে একটা স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাইতে পারিব।

দলীয় রাজনীতি

ছাত্রবিক্ষোভের সঙ্গে ছাত্রদের অধিনয় লইয়াও রাজ্যসভায় এবং অন্যত্র নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। দলীয় রাজনীতি তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকেই মনে করেন, কিন্তু শিক্ষকদের রাজনৈতিক মত বা জীবন বলিয়া কিছু কি থাকিবে না? ছাত্রদের না হয় ছাত্রাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা বয়স্ক, যাহাদের জীবন-প্রবাহ একটা বিশেষ খাতে বহিতেছে, তাহাদের নিকটে কি এইটুকু আশা করা যায় না যে, শিক্ষকতা ও দলীয় রাজনীতি পৃথক থাকিবে—বিদ্যালয়

বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় লইয়া স্বদেশী রাজনীতি পুষ্ট করা চলিবে না? স্বীকার করি, ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়ন যেমন তপস্যা, শিক্ষকের নিকটও অধ্যাপন তেমনি তপস্যা হওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষকের জীবনে তো সে নিয়ম নূতন করিয়া গাঁথিয়া বসে নাই। তাই উত্তরের নিয়ন্ত্রণ এক প্রকারের হইতে পারে না। বিক্ষোভের নামে রাজনৈতিক বিপ্লব চাই না, এই কথাটা স্পষ্ট মনে রাখিলে সমূহ বিপদ হইতে আজ রক্ষা পাওয়া যাইবে, যে মহতী বিনষ্টি চক্ষের সামনে দেখিতে পাইতেছি তাহা সৃষ্টে মিলাইয়া যাইতে পারে।

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

দেশের উন্নতি এখন ধাপে ধাপে হইতেছে। আমাদের পরিমাপ হইল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিমাপ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে কারিগরি শিক্ষা আরও বিস্তার লাভ করিবে, বিস্তর কলেজ খোলা হইবে, ডুনিয়াদি টেকনিক্যাল স্কুল খোলা হইবে। তপশিলী ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানে শতকরা পঁচিশটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে বলিয়া নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদ সুপারিশ করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিল্প যদি গড়িয়া ওঠে, তবেই এই সকল কারিগরি শিক্ষা সত্য সত্য প্রসার লাভ করিবে। কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরি জোগাড় করা নয়, কর্মে নিয়োগ। সেই কর্মের সৃষ্টির উপরই শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে।

স্বর্গীয় রাজশেখর বসু

রাজশেখর বাবু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যালে যেরূপ দক্ষতা সহকারে কাজ করিয়াছিলেন, বর্তমান যুগের বাংলার ইতিহাসে শুধু সেই কারণেই হয়তো তাঁহার নাম স্থায়ী হইত। কিন্তু পরশুরাম বাংলা সাহিত্যে 'মেকি'র বিরুদ্ধে কুঠার চালনা করিয়া সমাজের যে হিতসাধন করিয়াছিলেন, তাহা অন্য ধরণের স্থায়ীত্ব দাবি করে; সাহিত্যিকেরা সমাজের শিক্ষক; আরও বিশেষভাবে রাজশেখর বাবু শিক্ষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহার চলন্তিকা বর্তমান যুগের সাহিত্যিক ও শিক্ষকের সঙ্গের সাথী। বয়স হইলেও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁহার জাগ্রত মন কর্মক্ষম ছিল। তাঁহার প্রভাব বাঙালীর চিত্তকে বলিষ্ঠ ও জাকামি হইতে মুক্ত করুক।

———

"ওঁর চরণধূলি আমার মাথায়"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চাঁদের আলোয় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। তমলুক থেকে রূপনারায়ণের তীরবর্তী একটি পল্লীর অভিমুখে চলেছি রিক্সায়। আরোহী আমি এবং আমার একটি বন্ধু। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম এক জন শিক্ষক সম্পর্কে। একটু আগে সৌম্যদর্শন এই শিক্ষক ছিলেন বাসে আমাদের সহযাত্রী। তমলুকে তাঁর নিবাস। পাঁশকুড়া স্টেশনে একটি পাঞ্জাবী যুবক তাঁর ব্যাগটি গাড়ীতে তুলে দিলো। যুবকটি তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। সারা রাস্তা আমরা দুই বন্ধু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এসেছি। কী ভালোই যে তাঁকে লাগলো! Sweetness and light. কথার মধ্যে যুক্তির আলোকচ্ছটা, আচরণে অনির্বচনীয় মাধুর্য। বুঝলাম, কিসে আকৃষ্ট হয়ে পাঞ্জাবী যুবকটি কুলীর কাজ করতে একটুও কুণ্ঠা অনুভব করলো না।

রিক্সা এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছে। আমরা দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি। পরের দিন সোম। মাথার উপরে চাঁদ হাসছে। রিক্সাওয়ালার দিকে চেতনার বাতায়ন এতক্ষণ বন্ধই ছিল। হঠাৎ তার কথায় আমাদের মনকে এমন দোলা দিল যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেই কথাটি গানের সুরের মতো কানে এখনও বাজছে। "উনি মরেও যুগযুগান্তর চির অমর হ'য়ে থাকবেন। ওঁর চরণধূলি আমার মাথায় আছে।" আমি ডায়েরীতে তার কথাগুলি লিখে নিয়ে পড়লাম। রিক্সাওয়ালা বললো, "লিখুন চির-অমর।" আমার খাতায় লেখা ছিল শুধু 'অমর'। বানানো কাহিনী নয়; হুবহু সত্য।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে জানলাম, রিক্সা-ওয়ালার নাম আবুবকর, শিক্ষকটির কাছে সে এককালে পড়েছিল তমলুকের এক বিদ্যালয়ে। বিদ্যা বেশীদূর এগোয় নি। অষ্টম শ্রেণী থেকেই স্কুলের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবার জন্যে রিক্সা টানা সুরু হোলো। আঠারো বছর ধ'রে সে রিক্সা টানছে। দু'চাকার হাল্কা গাড়ীখানা তার সঙ্গী। ধর্মতলার এক দোকান থেকে কেনা এই রিক্সা বছরের পর বছর ধ'রে সংসার যাত্রা নির্বাহে তাকে সাহায্য করছে।

কিন্তু এতকাল পরেও মুসলমান আবুবকরের মর্মের গভীরে তার হিন্দু মাস্টার মশায়ের প্রতি শ্রদ্ধা অম্লানই আছে। রিক্সাওয়ালা জীবনের প্রভাতে মাস্টারের কাছ থেকে অনির্বচনীয় এমন কিছুর স্পর্শ নিশ্চয়ই পেয়েছিল যার জন্যে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল: "উনি মরেও যুগযুগান্তর চির অমর হয়ে থাকবেন। ওঁর চরণধূলি আমার মাথায় আছে।"

আজও ছাত্রের সুপ্তি জুড়ে তার মাস্টারের স্নেহসুধা। সেই সুধার একটুখানি পেলে নিজেকে সে ধন্যই মনে করে, স্নেহময় মাস্টারের একটু সেবার সুযোগ পেলে সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। গুরু চরণপ্রান্তে বসে বিদ্যার আলোর সঙ্গে ছাত্রের প্রথম পরিচয় তাঁকে কখনও সে উপেক্ষা করতে পারে? উপেক্ষা যখন করে তখন বুঝতে হবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব তার মনের উপরে কোনই রেখাপাত করে নি।

বাসে শিক্ষকটি বললেন, তিনি যখন স্কুলে প্রবীণ শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁর পনরো জন সহকর্মীর মধ্যে একজন মাত্র টিউশনি করতেন। এখন তো ঘরে ঘরে ছেলে পড়াতেই শিক্ষকদের সময় কাবার হ'য়ে যায়। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ কোথায়? ছাত্রদের মনে আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, আর এই শ্রদ্ধাহীনতাই চারিদিকের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে বহুল পরিমাণে কি দায়ী নয়?

———

প্রাথমিক শিক্ষক

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিয়া প্রকৃতই প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছি। শিক্ষাকর্মে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের সকলের মধ্যে একটা যোগসূত্র রহিয়াছে, রহিয়াছে আদর্শের মূলগত সমতা, রহিয়াছে আর্থিক অনটন, রহিয়াছে সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। এই সমতার জন্যই আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছি। যদি আমার সংক্ষিপ্ত কথা কয়টিতে এমন কিছু থাকে যে বাহিরের লোকের কথার মত শোনায় তাহা হইলে তাহা আমার প্রকাশের ত্রুটি বলিয়া ধরিয়া লইবেন, ভাবের ত্রুটি বলিয়া ধরিবেন না, ইহাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। সময় অল্প, আপনাদের নানা চিন্তা। বর্তমান যুগে নানা দিকে মন দিতে হইতেছে, সুতরাং আমার ভাব ও ভাষা যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সংযত করিবারই চেষ্টা করিতেছি। এই সুযোগ গ্রহণ না করিলে নয়, কারণ মনের কথা বলিবার এরূপ অবসর, সুযোগ ও ক্ষেত্র আর কোথায় পাইব? বর্তমানকে উপেক্ষা করা চলিবে না। সেজন্য আজ দুই চারিটি কথা বলিতেছি, কে জানে আপনাদের মধ্যে কেহ যদি আমার কথাগুলি গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া কাজে লাগাইতে চেষ্টা করেন! তাহা হইলে আমার ঘোল আনাই লাভ। সুতরাং আমার যাহা বলিবার আছে আর বিলম্ব না করিয়া তাহা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করি, আশা করি আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন। সংসারে নূতন কথা কয়জন বলিতে পারে? আমারও কথা নূতন নয়, তবে আজকার দিনে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় তাহা নূতন করিয়া বুঝিতে চাহিতেছি।

বর্ধমান জেলায় আমরা সমবেত হইয়াছি, আপনাদের কর্মক্ষেত্র এই জেলার মধ্যে আবদ্ধ। বর্ধমান জেলার আয়তন স্বল্প নহে, সুতরাং আপনাদের কর্মক্ষেত্রের বিরাটত্ব আপনাদের কল্পনা ও স্বপ্নকেও বিরাট্ করিয়া ধরিবে। বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে রাঢ়দেশের সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, সে বিষয়েও আপনারা অবশ্যই অবহিত আছেন। ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের সহিত বাংলার যোগসূত্র আবার এই বর্ধমানেই বাঁধা হইয়া থাকিবে, ইতিহাস অবশ্য তাহার সাক্ষ্য দিবে। প্রাচীন ইতিহাসের পরম্পরা এখানে বিবৃত করিবার শক্তি ও জ্ঞান আমাদের নাই, কিন্তু বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি, তখন আমাদের মানস চক্ষুর সামনে ভাসিয়া ওঠে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিরূপ। একদিকে কলকব্জা কারখানার শব্দে মুখর বর্ধমানের উদ্যোগশালা, অন্যদিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে শোভমান বর্ধমান প্রকৃতই বর্ধমান। আসানসোল ও দুর্গাপুর ভবিষ্যৎ ভারতের পরম আশার স্থল। বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বুনিয়াদ পাকা করিয়া তুলিবার জন্য আদর্শবাদী কর্মীরা কয়েক বৎসর হইল কাজ আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের কেন্দ্রকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট। আজ যখন বর্ধমানের দিকে তাকাই, তখন এই সব দিকই চোখে পড়ে। ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে, এই সব তাহা নির্দেশ করিতেছে। এই তো সেদিন গঙ্গাটিকুরিতে স্বাধীনচেতা সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনাদর্শে ও সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। আমাদের একালের দুর্লভ পরাবলম্বন প্রীতি সইয়া

সেই বলিষ্ঠ আদর্শের সুবিচার করিতে পারি না, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় নতি জানাই। যে দেশে এরূপ আদর্শ প্রতিকূল অবস্থায় মান হয় নাই, সেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে সন্দেহ নাই।

আপনাদের বহু সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। সমস্যার প্রধান হইল অন্নসমস্যা। আমরা শুনি, কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ। কলিতে প্রাণ আছে অন্নের মধ্যে। অন্ন দুর্মূল্য, সব জিনিসই দুর্মূল্য, তাহা সত্ত্বেও অন্ন, যাহা দেহ মন পুষ্ট করে, যাহা প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করে, না হইলেই নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে কয়েকটা খুব দামি কথা আছে—সেখানে বলা আছে—"অন্নাদের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" শুধু তাই নয়, বরুণের তনয় ভৃগু পিতার নিকটে গেলেন, ব্রহ্মের বিষয়ে শুনিবার জন্য, বরুণ তাঁহাকে প্রথমেই বলিলেন অন্নের কথা। অন্নের উদ্দেশ্য সর্বপ্রথমে। ব্রহ্মসাধনার জন্যও অন্ন চাই। সঙ্গে সঙ্গেই আছে—অন্নং ন নিন্দ্যাৎ, অন্নের নিন্দা করিবে না, সন্তুষ্টমনে অন্ন গ্রহণ করা চাই, অন্নং ন পরিচক্ষীত, অন্নকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, বরং অন্নং বহু কুর্বীত, অন্নকে বর্ধিত করিবেন। কোথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, কুতো বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজাবরে—উত্তর হইল, অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ। যাঁহারা শিক্ষক তাঁহারা অন্নকে অবশ্যই যথাযোগ্য মর্যাদা দান করিবেন। কিন্তু সমস্যা হইতেছে, কোথা হইতে এই অন্ন জুটিবে? দেশব্যাপী অর্থ-নৈতিক সংকটের সরল সমাধান তো আমরা করিতে পারিব না। নিত্যকার কর্মে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগের দ্বারাই তাহা সম্ভব। এ সংকট শুধু শিক্ষকের নহে, সমগ্র সমাজের, সুতরাং আমাদের সংকটের তীব্রতাও সেখানে, ইহা ব্যাপক। দেশের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে আপনারা অর্পণ করিয়াছেন, আপনাদের প্রতিনিধি যাঁহারা, তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন যেমন এদিকে থাকা চাই, তেমনি আপনাদের সমবায় শক্তির দ্বারাও এই সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চাই। দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন আমাদের গৃহ হইতে না গেলে শিক্ষাদানে ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক ও সত্য কথা। আজকার দিনেও আমাদের সংস্কার হইতেছে বেশির ভাগ উপর হইতে, নীচ হইতে নয়, ইহাই দুঃখের বিষয়। গান্ধীজী শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করিতে চাহিয়াছিলেন, ষোল আনা না হউক কিছুটা করাও কি সম্ভব নয়? প্রসঙ্গক্রমে, শিক্ষক কি স্বাবলম্বী হইতে পারেন না? দেশব্যাপী শিক্ষালাভের আকুল আগ্রহ, সুতরাং বর্তমানের অবস্থা তো এমন হইবার কথা নয়, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের, তাঁহারা জমির নিকটে বাস করিতেছেন। মাতা বসুন্ধরার স্পর্শ তাঁহারা যতটা পাইতেছেন, অন্য শিক্ষকদের পক্ষে ততটা পাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা শিক্ষার তিনটা ভাগ করিয়া লইয়াছি—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। ইহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাই কি সবচেয়ে গুরুতর নয়? এক তো প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সকল লোকের—অবশ্য সকলের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনই বা হইবে না কেন, সকলেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিদ্যানুরাগী হইবেন না কেন, তাহার কোনও কারণ নাই। তথাপি কার্যত দেখি, সকলে উচ্চশিক্ষা এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন না। প্রাথমিক শিক্ষাই বা কয়জন শেষ করিতে পারেন! এখনও আমাদের সমাজে এমন বহুলোক আছেন যাঁহারা কোন না কোন কারণে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ কাল ও ক্রম শেষ করিতে পারেন নাই; এই না পারার কারণ সন্ধান করিতে হইবে। যাহাদের হাতে খড়ি হইয়াছে, প্রথম বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষালয়ে যাহারা ভর্তি হইয়াছে, তাহারা বৎসর

শেষ না হইতেই লেখাপড়ায় কেন জলাঞ্জলি দিল তাহার কারণ যাহাই থাকুক, তাহা জানা চাই, কারণ তো দূর করিতেও হইবে। তা ছাড়া যদি আমাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হয়, অর্থাৎ আমাদের পাঠশালার ছাত্রেরা যদি শিক্ষকের নির্দেশে সুপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শেষ করিতে পারে, তবেই বা তাহাদের জীবনে পরবর্তী শিক্ষাক্রমের জন্য প্রস্তুতি হইয়া থাকিবে? সত্য বটে, যাহারা গোড়ায় কাঁচা থাকে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে সার্থকতা লাভ করে, এবং এখন যাঁহারা উচ্চশিক্ষায় সুপণ্ডিত, উচ্চতম শিক্ষামন্দিরে যাঁহারা গৌরব অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রাথমিক স্তরে এমন কি মাধ্যমিক স্তরেও তেমন যশ অর্জন করিতে পারেন নাই, তথাপি একথা অবশ্যই সাধারণভাবে সত্য যে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপরেই পরবর্তী শিক্ষা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং দুই দিক দিয়াই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে—সকল লোকের প্রয়োজন বলিয়া, এবং ইহাই সকল শিক্ষার আধার বলিয়া। সমাজে প্রাথমিক শিক্ষকের স্থানও সেই পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ, এই দৃষ্টিতে না দেখিলে সমাজে তাঁহার প্রয়োজন আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব না।

সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকেরই যে বেশি সম্বন্ধ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহা সাক্ষাৎ সম্পর্ক, এবং ভবিষ্যতে সোশ্যাল কোন দিকে চলিবে, এখনই বা কিভাবে চলিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার দর্শন অভ্রান্ত। তাঁহার সত্য দর্শনের উপরই পণ্ডিতদের আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। সরকারী পোষকতা থাকুক আর না-ই থাকুক, বৃত্তি কম হউক আর বেশি হউক, সমাজের সহিত তাঁহার যোগ যে বেশি একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। আমার বক্তব্য এই যে তিনি তাঁহার এই স্বাভাবিক নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। সমাজসেবকের গ্রামসেবকের যে স্থান তাহা তিনিই পূর্ণ করুন। তিনি বিচ্ছিন্ন বা উদাসীন থাকিলে গ্রামের কর্মশক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা প্রাথমিক সেবকের কথা তুলিয়া উপর হইতে ব্যবস্থা করিতে চাই বলিয়া আমাদের ব্যবস্থা পাকা হয় না; গোড়া আলগা হইলে কি করিয়া গাছ শক্ত হইবে, দাঁড়াইবে কি করিয়া? প্রাথমিক শিক্ষকই গ্রামে উপদেশ দিবেন, যাহা শুনিয়া লোকে চলিবে। চিরদিনই তো তাঁহার স্থান সুনির্দিষ্ট আছে। তাঁহার হিতবুদ্ধি সমাজে সঞ্চারিত হইলে মঙ্গল, নতুবা নয়। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, তাঁহার কর্ম বা আচরণ যতই উৎকর্ষ লাভ করিবে, ততই পল্লী বা গোষ্ঠীর উন্নতি হইবে। এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য, শুধু এই দিকটায় জোর দিতে চাই যে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীর উপর তো তাঁহাদের একটা স্বাভাবিক অধিকার আছেই, তাহার উপর তাহাদের পিতা মাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গেও যে যোগ আছে তাহা হিতকর্মের অনুকূল। অবশ্য হিতচিন্তন চাই, কল্যাণকামনা চাই সর্বাগ্রে, এবং আপনাদের তাহা যথেষ্ট আছে ইহা ধরিয়া লইতেছি। সেই কল্যাণকামনা আমাদের গোষ্ঠীর উন্নতিসাধন করুক, করিবার ক্ষমতা তাহার আছে, ইহাই আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করি।

সমাজসেবার একটা বিশেষ দিকের কথা এখানে বলি। এই বিশেষ দিকের সঙ্গে আপনাদের যোগ আছে। আমি বয়স্কশিক্ষার কথা বলিতেছি। আমাদের সমাজ হইতে নিরক্ষরতা যদি একেবারে দূর করিতে হয় তাহা শুধু আপনাদের সহায়তায় সম্ভব বলিয়া মনে করি। অবশ্য বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব শিশুদের হইতে ভিন্ন, তাহাদের পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হইতে ভিন্ন। তাহাদের সম্ভাব্য অগ্রগতির হারও ভিন্ন। প্রাথমিক শিক্ষার কর্মে যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহারা যদি সমগ্র সময় সেই কর্মেই নিয়োগ করেন তবে বর্তমান অবস্থায় তাহা সবচেয়ে ভাল। আমি নিজে মনে করি, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কর্মী থাকিলে কর্মের সুব্যবস্থা ও প্রগতি সম্ভব। কিন্তু আদর্শ ব্যবস্থা তো সংসারে বিরল, প্রায় অসম্ভব। আপনাদের সক্রিয়

সহযোগিতায় এইখানে পরিপূরণ হইতে পারে, বয়স্ক-শিক্ষার ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন হইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাও যেমন সার্বজনীন হওয়া উচিত বয়স্কশিক্ষাও তেমনি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, অন্তত বহুব্যাপক বহুবিস্তৃত হওয়া উচিত। অত্যল্পকাল পরেই শিক্ষার আমূল সংস্কার হইবে বলিয়া গুজব শোনা যাইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাতে আবশ্যিক করিতেই হইবে। আপাতত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা কার্যকরী করিবার যথেষ্ট বা আয়োজন চলিতেছে। এই কর্মক্ষেত্র কি আপনাদের সেবা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে?

চারিদিকে অস্বস্তি। নানা সমস্যায় আমাদের জীবনযাত্রা বিপন্ন। গান্ধীজী বলিতেন, একটা দিক সামলাও, অন্য দিকগুলি আপনাআপনি ঠিক হইয়া যাইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ঠিক মত ব্যবস্থা করিতে পারিলেও সব ঠিক হইয়া যাইবে। হয়তো আজকার জটিল অবস্থায় এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়, তথাপি আমাদের হাতের কাছে যাহা আছে, যে কর্মভার আছে, তাহা বহন করাই তো সঙ্গত। যাঁহারা নিত্যকার নানা গ্লানির মধ্যে আপনাদের কর্তব্য ভোলেন নাই প্রাথমিক শিক্ষার সেই সব কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার জানাইয়া আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করি।*

* বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের বোলপুর অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্যাংকাকী সহরে দুইমাস ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে এক ক্লাবে যুগিয়াদি শিক্ষা বিষয়ে এবং এক গীর্জায় ভারতবর্ষের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছি। দক্ষিণাও কিছু পাইয়াছি। বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিবার বা শুনিবার প্রথা নাই। আমাদের দেশের মত অচেল সময় কাহারও নাই। সকলেই ব্যস্ত, 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ' বইয়ে গান্ধীজী কর্মব্যস্ত জোহান্সবার্গের লোকদের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে তাহারা যেন দৌড়াইয়া চলে। সে প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। তখন মোটর গাড়ীর আবিষ্কার হয় নাই। এ দেশের কর্মব্যস্ত সমাজে মোটর গাড়ী একান্ত আবশ্যক। এই মোটর গাড়ীতে চড়িয়া লোকে উপার্জন করিবে, সামাজিকতা করিবে, ধর্মোপাসনা করিবে, আমোদ ফূর্তি বেড়ান—সব কিছুই করিবে। বিদেশের কাহিনী শুনিবার জন্য এবং নিজেদের দেশ সম্পর্কে মতামত জানিবার জন্য আমেরিকানরা বিদেশী বক্তাকে নিমন্ত্রণ করেন। বক্তা সাধারণতঃ ২০।২৫ মিনিট বক্তৃতা করেন তারপর কিছু সময় শ্রোতাগণ প্রশ্ন করেন, বক্তা তাহার উত্তর দেন। মোট এক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু শেষ করিবার নিয়ম। প্রশ্ন সব বিষয়েই হইয়া থাকে, বিষয়ের সহিত বক্তৃতার অনেক সময় সম্পর্ক থাকে না।

এদেশে গুণ যেমন দেখিয়াছি, দোষও তেমন পাইয়াছি। যদিও সামাজিক বৈষম্য আগের চেয়ে কমিতেছে, যদিও বর্ণবিদ্বেষ এখন অনেক

কম, তবু তাহা আছে। অনেক ক্ষেত্রে নিগ্রোদের আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের চাইতে অবম মনে করা হয়। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ চিঠি লিখিয়া এক অজ্ঞলোক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সম্প্রতি অস্লোতে আমেরিকান রাজদূতের মৃত্যুপদে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত নিগ্রো ডাঃ রালফ্ বুঞ্চকে নিয়োগ করিলে স্ক্যানিডার আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষেষ প্রচারের সমুচিত উত্তর দেওয়া হইবে। আমি সমর্থন করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম। চিঠিখানা ১৯৫২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখের টাইমস-এ সম্পাদকীয় (২৪) পৃষ্ঠায় বাহির হইয়াছিল; কিন্তু Sir, Dr., Mr. ইত্যাদি কয়েকটা কথা ছাপা হইল না। কারণ, এদেশের নিয়ম ভিন্ন। ঐ চিঠির অবিকল নকল দিলাম:

To

The Editor of the New York Times.

I fully support the proposal of George Cressey suggesting the appointment of Ralph Bunche as an Ambassador.

As an exchange student from India, I can assure you that his appointment would be an effective weapon against anti-American propaganda in South-East Asia. It alone would act as a billion dollar American propaganda. In addition, it would help to dispel the prejudice of many innocent Americans. We cannot minimize the psychological reaction.

Carbondale, Ill.
Oct. 22, 1952

Dilip Biswas

আমি সভাসমিতিতে আমেরিকানদের দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কোনও প্রকার খোসামোদ কথা বলি নাই। যদিও সম্মান পাইয়াছি কিন্তু স্পষ্ট কথা বলার জন্য অর্থও বেশি পাই নাই। আমি অবশ্য তাহাতে মোটেই দুঃখিত নই।

দুই দিন শিকাগো সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। খুব অল্প সময় ছিলাম। চশমার প্রয়োজন ছিল। বাই-ফোকাল চশমার দাম পড়িল ১৩ ডলার। ছোট কোম্পানীতে আরও ৩ ডলার কম। কিন্তু তাহাদের উপর আমার বিশ্বাস হইল না। শিকাগো নিউইয়র্কের এক সংস্করণ। দুপুর বেলায় অনেক সময় রাস্তায় সূর্যের আলো পড়ে না, দুই ধারে বিরাট বিরাট বাড়ী। মিচিগান হ্রদের কূলে শিকাগো সহর। সহরের সৌন্দর্য তাহাতে আরও ফুটিয়াছে। কিন্তু আমার নিকট শিকাগো, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিস্কো, সত্যিক আমেরিকা নয়; আমি তাহাতে মুগ্ধ নই, আমাকে তাহা আকর্ষণ করিতে পারে না।

Employment Office হইতে অনুমোদন পত্র লইয়া মিলফোর্ড গ্রামে কাজ করিতে গেলাম। Employment Office-এর সকলেই আমার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমি বিদেশী, সেজন্য কোন প্রকারই অবজ্ঞা করেন নাই। সকলেই বন্ধুভাবে উপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি যদি কঠিন পরিশ্রম করিতে পারিতাম তবে অনেক আগেই তাঁহারা কাজ দিতে পারিতেন; ঘণ্টায় আয় ছিল ১·৮০। মিলফোর্ড গ্রাম ক্যাংকাকী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে—ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের সীমান্তে। সেখানে ফুটী ও asparagus টিনের কৌটায় প্যাক করিবার এক কারখানা আছে। সেটা নাকি পৃথিবীর মধ্যে এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় কারখানা। আরও ১২ মাইল দক্ষিণে হবস্টন গ্রামে আর এক কারখানা আছে। সেখানে সামাবিধ খাদ্যশস্য কৌটায় ভরা হয়; তাহা ইহার চেয়ে বড়, এবং সেখানে বছরে অনেক সময় কাজ হয়। এখানে মে, জুন এবং আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে ৫।৬ সপ্তাহ কাজ হয়। মে, জুন মাসে Asparagus এবং আগষ্ট মাসে ফুটী টিনের কৌটায় ভরা হয়। বাকী সময় আর কোনও কাজ নাই।

সেইজন্য এই সময় মজুরের প্রয়োজন হয়। কাজ করিবার জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জ্যামেকা, পুয়েরটোরিকো ইত্যাদি এবং টেক্সাস হইতেও মজুর আসে। এই সব মজুরদের মাতৃভাষা স্প্যানিশ; ইহারা বর্ণসংকর আদিম অধিবাসী। আগে উত্তর আমেরিকার উত্তরপূর্ব অঞ্চল এবং দক্ষিণে ব্রাজিল ছাড়া গোটা পশ্চিম গোলার্ধই স্পেনের অধিকারে ছিল। স্পেনের সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাইতে ছোট ছিল না। দেশ হইতে মুরদের তাড়াইবা দিয়া স্পেনের দুঃসাহস আরও বেশি হইল। যুদ্ধোন্মাদ সামন্ততন্ত্র দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিবার পর কাজ করিবার মত কিছু যদি না পায়, তবে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ফ্রান্সে রাজ্য হারাইয়া ইংলণ্ডের সামন্তগণ আর কোনও কাজ না পাইয়া নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিল: ইতিহাসে তাহা Wars of the Roses নামে পরিচিত। ঐ সময় কলম্বস যদি আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সামন্তজনের দুঃসাহস দেখাইবার পথ করিয়া না দিতেন, আমার মনে হয় তাহা হইলে স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাদের পরাক্রম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, রোমানদের পর স্পেনের মত পরাক্রমশালী দেশের আবির্ভাব ইউরোপের ইতিহাসে আর দেখিনা।

দুঃসাহসের পিছনে ছিল সোনারূপার প্রতি আকর্ষণ। ইউরোপের লোকেরা গল্প শুনিত যে ভারতে সোনার গাছে হীরা পান্না মুক্তা ফলে। ভারত আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বস বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু মিলিল আর এক দেশ। কিন্তু সে দেশেও অঢেল সোনারূপা। দেশ জয় করিবার জন্য স্পেন সৈন্যসামন্ত পাঠাইত এবং সেই সাথে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দিবার জন্য পাদরীও যাইত। কিন্তু সৈন্য অপেক্ষা এই পাদরীরাই স্পেনের রাজ্য বিস্তারে—বিশেষভাবে ফ্লোরিডা অঞ্চলে—বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের খ্রীষ্টান করিয়া দিগ্‌বিজয়ীগণ তাহাদের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করিত। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা এখনও অনেক এবং তাহাদের প্রায় সকলেই বর্ণসংকর। অথচ উত্তর অঞ্চলে ইংরাজদের অত্যাচারে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটা বিশেষভাবে চিহ্নিত এলাকা ছাড়া এদেশে তাহারা আর নাই। ১০০ বছর আগে মিসিসিপি নদীর পরপারে পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণে বর্তমান মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত অধিকাংশ লোকই ছিল বর্ণসংকর স্পেনিয়ার্ড। তারপর এক যুদ্ধে ঐ সব অঞ্চল এই দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখনও তাহারা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষার কথা বলে এবং অধিকাংশের গায়ের রং আমাদের মত। একটা মত আছে যে এই সব আদিম অধিবাসী অনেক হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া এদেশে আসিয়াছিল। দেওয়ান চমনলাল তাঁহার "হিন্দু আমেরিকা" বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

মিলফোর্ড গ্রামে একটি মাত্র হোটেল আছে, আমি সেখানে একটা কামরা ভাড়া করিলাম—সপ্তাহে ১৫ ডলার; অবশ্য তিন বেলার খোরাক ঐ সঙ্গে ছিল। গ্রামখানা ছোট, প্রায় ২০০০ হাজার লোকের বাস। যা কিছু গৌরব তা ঐ কারখানার জন্য। বছরের অন্য সময় ঘুমন্তপুরীর মত শান্ত চুপচাপ থাকে। গ্রামে একটা হাইস্কুলও আছে; তাহার প্রিন্সিপালের সহিত পরে আলাপ হইয়াছিল। গ্রামের মাঝখানে একটা ছোট দেওয়াল গাঁথিয়া তাহার উপর একদিকে যুদ্ধে মৃত সৈন্যদের নাম, আর এক দিকে গ্রামের নাম এবং লোকসংখ্যা খোদাই করা আছে। নামের পিছনে আবার আছে—"The Mecca City of Illinois"। Mecca (মক্কা) কথাটা পবিত্র হিসাবে এদেশে খুবই ব্যবহৃত হয়—কাজের আগেও Mecca কথার ব্যবহার দেখিয়াছি।

আমি সাধারণ মজুর হিসাবে কাজ আরম্ভ করিলাম, নির্দিষ্ট বেতন ঘণ্টায় ৯৫ সেণ্ট ; মেয়েদের আরও কয়েক সেণ্ট কম। কারখানাটি একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; ৩০।৪০ বছর আগে প্রথম স্থাপিত হয়। বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ টিনের কৌটার খাদ্য প্যাক করা হয়। অস্থায়ী কর্মচারীদের থাকিবার যোগ্য পৃথক ঘরও আছে ; কিন্তু তাহা বড়ই বিশ্রী—অবশ্য কলিকাতার অনেক মেসবাড়ীর চাইতে ভাল। ঐ সব ঘরে থাকিবার জন্য কোনও ভাড়া লাগে না। যাহারা স্থানীয় মজুর তাহারা ৫।১০।১৫।২০ মাইল দূর হইতে নিজেদের বা বন্ধু-বান্ধবের গাড়ীতে করিয়া কাজ করিতে আসে। কোথাও কোথাও মজুরেরা বা ৩০।৪০ মাইল দূরের কারখানায় গিয়া কাজ করে। আমাদের নিকট ১০ মাইল অনেক দূর ; এ দেশে তাহা নয়। রাস্তা ভাল ; ঘণ্টায় ৫০ মাইল থেকে ৮০ মাইল পর্যন্ত বেগে গাড়ী চলে। ১৬ বছরের কম কাহাকেও খাটাইবার আইন নাই ; ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত লোকে সাধারণত কাজ করে। অধিকাংশ রাজ্যে আইন করা আছে যে ৬৫ বছরের পর পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকেই বৃদ্ধ বয়সের পেনসন পাইবে। এক বৃদ্ধ দম্পতীকে কাজ করিতে দেখিলাম ; তাহাদের শীঘ্রই ৬৫ বছর পূর্ণ হইবে। গরমের ছুটির জন্য অনেক স্কুলের ছেলে কাজ করে। হাই স্কুলের পড়া সাধারণতঃ ১৮ বছর বয়সে শেষ হয় এবং পড়িবার জন্য স্কুলে কোনও প্রকার ফী দিতে হয় না। ১৬ বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক।

এই মিলফোর্ডের কারখানায় পাঁচ সপ্তাহ কাজ করিয়া মোট বোধ হয় সাড়ে তিন শ ডলার পাইয়াছিলাম। মামাদের নিকট ধার করা টাকা এবং লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম শোধ দিবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে বেশ শ ডলার পাঠাইয়াছিলাম। খাওয়া থাকার খরচ করিয়া নগদ বোধ হয় সওয়া শ' ডলারের বেশি ছিল না। আমার যুক্তির টাকার মেয়াদ ছিল নভেম্বর মাস পর্যন্ত ; কিন্তু বীলিদ লিখিতে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত লাগিয়াছিল। কিছু সঞ্চিত টাকা আর এই সওয়া শ' ডলার দিয়া খরচ চালাইয়াছিলাম।

ক্যাংকাকী ও মিলফোর্ডে কাজ করিয়া আসল আমেরিকার রূপ দেখিয়াছি। শিকাগো, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস্, সান ফ্রান্সিসকো বহির্বাস মাত্র। আমেরিকার হৃদয় কল কারখানা, গ্রাম, পরিবার ও গীর্জার মধ্যে আছে। যদি গীর্জায় না যাইতাম, যদি কলকারখানায় কাজ না করিতাম, তবে আমার আমেরিকা ভ্রমণ সার্থক হইত না। তাহা না হইলে এই শতাব্দীর বিদেশীরা যেমন পনের দিনে পাঁচ হাজার মাইল পাক-ভারতে ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন, আমার কাহিনীও তাহাই হইত। রুচি যদি ভিন্ন হইত, মিস মেয়ো'র 'মাদার ইণ্ডিয়া'র মত বই (যাহাকে গান্ধীজী ড্রেন ইন্‌স্পেকটরের রিপোর্ট বলিয়াছেন) লিখিবার অভিজ্ঞতা হয়ত বা হইত। আমেরিকার আসল রূপ দেখিয়াছি, তাহার বদন দেখিয়াছি, এই আমার গর্ব। ইতি

প্রণত দিলীপ

ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সমাজ চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ইংরেজ কোম্পানী এনেছিল, তার বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষ কেটে পড়ল। কিন্তু সমাজগত পরিবর্তনে ভারতবর্ষ তেমন বিদ্রোহ করেনি, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধানই ঘটে গেল। নতুনের পক্ষপাতী কিছু লোক এর জয়গান করলেও অধিকাংশ লোক মৃতপ্রায় হয়ে গেল। তারা নিঃসাড় হল কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজের প্রগতি দেখা গেল না। জয়গান যাঁরা করলেন তাঁরা সংস্কারকামী হয়ে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে সহরে বাস করতে সুরু করলেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন লোক তাঁদের পিছু পিছু সমগ্র অন্ধ সংস্কার নিয়ে সে নগরও গ্রাস করল। তাই আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী বুৎসুদ্দী পেয়েছি কিন্তু জাতিকে পাইনি। এমনি সময়ে এল সিপাহী বিদ্রোহ। এই সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতাই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদের ক'রে তোলে। কিন্তু শিক্ষিত লোকের সে জাতীয়তা বীরোপাসনা আর ইংরেজ-বিদ্বেষ নিয়ে হলেও, ভারতীয় সমাজকে ঘিরে তার সৃষ্টি হয়ত হয়নি।

মহাত্মা গান্ধীই প্রথম এই অভাবটি বুঝতে পারেন। তাই তিনি অনুন্নত সমাজ, অস্পৃশ্য সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করতে সুরু করেন, জাতীয়তার সঙ্গে বেঁধে দিতে চাইলেন গ্রামীণ সভ্যতাকে, গ্রামের শিল্প-সংস্কৃতিকে, কুসংস্কার যে ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যেই বিজাতীয় প্রেরণায় অধিকতর অনিষ্টকর হিসেবে দেখা দিয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চাইলেন। এইভাবেই একের পর এক তাঁর জাতীয়-আন্দোলনের সমস্যা উপকরণ চুকছে; সর্বশেষে এল বুনিয়াদি শিক্ষা। যাঁরা এই বুনিয়াদি শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ইয়োরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষার সহজরীতি এবং স্বাভাবিক রীতি হিসাবে নেবেন, কর্মকেন্দ্রিক বা Learning by doing প্রভৃতি তত্ত্বের সঙ্গে মেলাতে চান, তাঁদের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। আর এরই অপর দিক রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা। কিন্তু সেকথা বর্তমান প্রবন্ধে নয়।

সংস্কার দুভাবেই 'কু' হতে পারে; পুরনোকে নিয়ে মত্ত করা, আর নতুনকে নিয়ে মোহগ্রস্ত হওয়া।

তার মধ্যে আবার পুরনোকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার মধ্যে যতটা শান্তশ্রী আছে নতুনের মোহের মধ্যে ততটা নেই। একটি হয়ত অভিশাপ, কিন্তু অপরটি হচ্ছে স্বার্থপরতা। একটিতে ব্যক্তি সমাজের ঘুণকীটে, অন্যটিতে ব্যক্তি পশুর মতো সমাজ বিষয়ে অন্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

হাণ্টার কমিশনের * থেকে দেখা যায়, সরকারের চেষ্টা অনগ্রসরদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য। আমাদের দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হবে; (১) অনগ্রসর জাতি কারা? (২) সরকার এই চেষ্টা করছেন কেন? প্রশ্ন দুটি স্বতন্ত্র ভাবে হয়ত আলোচনা করা যাবে না, কারণ দুটি সমস্যাই পাশাপাশি দেখবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রথম দিকে সরকারী পুঁথিপত্রের অনগ্রসর জাতি বলতে ভারতের আদিবাসী আর অনুন্নত বা অবজ্ঞাত হিন্দু সমাজকেই মনে করা হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদিবাসী আর

অবজ্ঞাত সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে ভাবা হয়নি। মাদ্রাজে অবশ্য 'পঞ্চম' (পঞ্চম শ্রেণী) সম্পর্কে ১৮৯০ থেকেই ভাবা হয়েছে, তাই ১৮৯৩ সনে শিক্ষার সুযোগ দিতে বিশেষ বিধান হল, যাকে বলা হয় পঞ্চমদের শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা। মোটামুটি তারিখ বোধহয় (ভারতের পক্ষে) ১৮৯০ সাল, যখন থেকে আদিবাসী আর অবজ্ঞাত শ্রেণীকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা সুরু হতে লাগল। তবে শিক্ষার ব্যবস্থার দিক দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ইংরেজ সরকার একই প্রকারের নিয়ম প্রবর্তন করলেন বলে আমরাও দুটি সম্প্রদায় বা সমাজকে একই প্রবন্ধে আলোচনা করব। কিন্তু সমাজের সমস্যা আর চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। অবজ্ঞাত সমাজ হিন্দুসমাজের দোষেই হয়ত সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার সমস্যা ইংরেজ আমলে এমন প্রবলভাবে ঘটল যে তারা যে বস্তুতই অবজ্ঞাত তা বুঝতে পারল। ইংরেজ শাসক হিসাবে এলেও তারা ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়। তারা এখানে রাজত্ব পেল। রাজত্ব চালনার জন্য তাদের চোখ এদেশের উন্নতিশীল আর উন্নত সম্প্রদায় থেকে নিচে নামেনি। তারা মুসলমানের বদলে ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু অভিজাতদের শরণাপন্ন হয়েছে, ভারতবাসীর বদলে হিন্দু-মুসলমানকে চিনে নিতে বাধ্য হয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ টানবার পর আদিবাসী আর অবজ্ঞাতদের চিনতে চাইছে। কিন্তু উদ্দেশ্য এবার পৃথক। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির কারণ ছিল রাজনৈতিক, আর আদিবাসী বা অবজ্ঞাতদের নিয়ে মাতামাতি করার কারণই হচ্ছে অর্থনৈতিক। এই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করা যাক।

অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত বা আদিবাসী, সবাই ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী। উন্নত হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই প্রাচীন অধিবাসী। তবে সমাজে এক শ্রেণী অবজ্ঞাত হয়ে থাকে কেন? সমাজ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা সমাজে গোষ্ঠী নির্মাণের দিকে বেশ নজর দেন। এই গোষ্ঠী নির্মাণ পদ্ধতি অনেকে দু'রকমের বলেছেন। আদিম (Primary) এবং সংস্কৃত (Secondary)। সংস্কৃত গোষ্ঠী বৃহত্তর; তাদের সাহচর্যে আদিম গোষ্ঠী বেশি সময়ই তাদের বেড়া ভেঙে এদিকে চলে আসে। চলে আসে সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে যতটা নয়, তার বেশি সভ্যতার (Civilisation)। সভ্যতার মধ্যে থাকে জীবিকানির্বাহের একটা প্রশস্ত কিংবা নৈপুণ্যসহজ পন্থা। কিন্তু কোন সমাজই তো আর ব্যক্তি সমবায়ে গঠিত হয় না, গঠিত হয় কর্মরত ব্যক্তিকে নিয়ে। কাজেই তারা কাজ নিয়েই আসে। এই কাজ প্রথমদিকে কেবল ব্যক্তিগত, অনেকটা অস্থায়ী সমাজব্যক্তির কৃষিরোজগারের মতো; তারপর কালক্রমে সেই কাজই সমাজগত হয়ে পড়ে। সমাজগত হয়ে যখন পড়ে, তখন তারা সমাজব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত। আরও দিন গেলে ধর্ম বা সংস্কৃতিতে অথবা সম্পদের স্তরে তারা উন্নতসমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাহলে চারটি স্তর কল্পনা করা যায়। আদিম সমাজ-কাঠামোর মধ্যে স্থিতি, আদিম এবং সংস্কৃত এর মাঝখানে অবস্থান, সংস্কৃত সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস, সংস্কৃত সমাজকে প্রভাব করবার মতো ক্ষমতা অর্জন। এর মধ্যে হয়ত বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় রূপটি হচ্ছে অবজ্ঞাতদের, আর প্রথমটি আদিবাসীর। তবে তৃতীয় রূপটি নিতান্তই অস্পৃশ্য নয়, তারা কারিগরীতে উৎকর্ষ দেখিয়ে সংস্কৃত-সমাজে স্বীকৃত হয়ে বেশ ভালোভাবেই বসবাস করে।

টয়েনবী বলেন, কৃষিজীবীরা চিরকাল পশু-পালকদের হাতে উৎপীড়িত হয়েছে, যাযাবরদের হাতে সমাজবাসীরা নাস্তানাবুদ হয়, সমভূমির লোকে পাহাড়িয়াদের হাতে পরাজয় বরণ করে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এমন বিপর্যয় ঘটে না। ভারতবর্ষের যাযাবর বা পাহাড়িয়ারা নিজেদের হিন্দু বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা সমতলভূমির উপর বিশেষ উৎপাত অন্তত ইংরেজের রাজত্বের প্রাক্‌কালে করেছে বলে খুব বড় রকমের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইংরেজরা আদিবাসী এবং অবহেলিতদের হিন্দু ব'লে যার যেখানেই বড় বেদনা পেত তা তাদের কাগজপত্রে দেখা যায়। এইজন্য মিশনারীদের ওদের মধ্যে কাজ করবার জন্য খুব উৎসাহ দেওয়া হত, অর্থ সাহায্য করা হত।

ইংরেজের আমলে অস্পৃশ্য এবং অবজ্ঞাত গোষ্ঠী হিসেবে কোন কোন সম্প্রদায়কে দেখা গেছে বটে। কিন্তু যাকে বলা হয় 'অনুন্নত সমাজ' তা ইংরেজ বণিকদেরই সৃষ্টি, ভারতবর্ষীয় সমাজের নয়। সমাজের স্থায়ী কারিগরশ্রেণী ইংরেজ ব্যবসায়ের বা বিজ্ঞানের আক্রমণে অনুন্নত হয়ে পড়ল; অধিকার থেকে অপসারিত করতে গিয়ে আদিবাসীদের উগ্র দস্যু তস্করে পরিণত করল।

হিন্দু-মুসলমান সমাজের যে বৃত্ত, তার প্রান্তের দিকে ছিল এরা। কোনরকম বিদ্বেষ হয়ত ছিল না, সামাজিক সদ্ধতিও ছিল না, কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরতা ছিল। এই নির্ভরতা নষ্ট হয়ে গেল ইংরেজের বাণিজ্যিক আক্রমণে। এই প্রান্তীয় সমাজটি কৃষিজীবী এবং কারিগর। কিভাবে এই গোষ্ঠী-নির্ভর সামাজিক গতিতে বাধা এসেছে তা সংক্ষেপে একটু বলা যেতে পারে।

ইংরেজরা তো কোম্পানীই হোক আর সম্রাজ্ঞীই হোক, ভূমিকে দেখেছে রাজস্বের অঙ্ক হিসাবে। কাজেই কৃষিকাজে তাদের খুব উৎসাহ ছিল না। কাঁচা মালকে তারা ব্যবসায়ের জন্য অল্প মূল্যে নিতে চায়, দিতে চায় পরিণত বস্তু চড়া দামে। বিলেতের বিজ্ঞান এদেশের রক্তচোষা। আর তারা নিজেরা নিল বাগান চাষ। বাগান চাষের মধ্যে বড় হচ্ছে চায়ের বাগান, কফি চাষ।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ ব্যাঙ্কস (Joseph Banks)-এর নির্দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকেরা চায়ের চাষে মন দিতে থাকে। চীন থেকে বীজ এনে চায়ের চাষের কথা হয়। কিন্তু পরে আসামেই দেশীয় চায়ের গাছ পাওয়া গেল। ১৮৪১ থেকে আসামে চায়ের চাষে উন্নতি হ'ল। ১৮৪৪তে কাছাড়ে সুরু হল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৬২-এর মধ্যে দার্জিলিং, ছোটনাগপুর এবং চট্টগ্রামে চায়ের কোম্পানী কলকব্জা নিয়ে বসে যায়। ১৮৬৯তে ৪১টি বাগান। তারপর চেষ্টা হল কাংরা, কুমায়ুন এবং দেরাদুনে। ১৮৮০তে সিংহল কফি চাষ তুলে দিয়ে চায়ের চাষ গ্রহণ করল, ১৯০৩ সালে চায়ের চাষ হচ্ছে সর্বসমেত ৮২০ বর্গ-মাইলে, চা তৈরী হচ্ছে ২০ কোটি পাউণ্ডের উপর। চায়ের চাষের পক্ষে উঁচু ঢিলা ভালো, ৭০০ ফুট উচ্চ ভূমি দরকার, অর্থাৎ পাহাড়িয়া অঞ্চলের জমি চাই। ডিসেম্বরে জঙ্গল কাট, ফেব্রুয়ারীতে পোড়াও, ৪।৫ ফুট ব্যবধানে গাছ পোঁত। এমনি ক'রে নতুন চায়ের জমি অধিগত হয়। এমনি করে কফি চাষ সুরু হল ১৮১০ থেকে। মহীশূর, কুর্গ, নীলগিরি প্রভৃতি পাহাড়িয়া অঞ্চলে কফি চাষ ছড়িয়ে পড়ে। কফি চাষের জন্য ভূমির উচ্চতা চাই ২০০০ থেকে ৫০০০ ফুটের মধ্যে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে আর একটি চাষ সুরু হল, সিঙ্কোনার, ১৮৬২ সালে। মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশে এই চাষটি থাকলেও, বোম্বাইয়ে এবং যুক্তপ্রদেশেও চায়ের চেষ্টা চলেছিল।

সমতলভূমিতে প্রধান চাষ এল পাটের আর নীলের। নীলের চাষ প্রথম সুরু হয় সুরতে (সুরাট)। ইয়োরোপীয় পর্যটক ডক্টর হোভ (Dr. Hove) ১৭৮৭তে বলেছিলেন নীল চাষ হয় পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে। সুরত থেকে তখন নীল রপ্তানি হত। আমেরিকা বস্ত্রের কারবারে নামলে গুজরাতের এ অঞ্চল থেকে নীলচাষ উঠে

যায়। তারপর আমেরিকা চিনি আর কফির উপর নজর দেওয়ায় আবার ভারতে নীলচাষের প্রবর্তন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবার বাঙলাদেশে নীলচাষ সুরু করল। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশে নীলের চাষ ছেয়ে গেল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে ২০০০ বর্গমাইল জুড়ে নীলচাষ হয়। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ছাড়াও মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে নীলের কারবার হয়। এর পাতাতেই রঙ। রাসায়নিক সারের দরকার। আর দরকার বৃষ্টি-শস্যকে ডুবিয়ে দেওয়া। বড় করতে হবে বেশুন বা আখন শস্যের জন্য ফসলের অপেক্ষা। কারণ ঐ সময়েই নীলচাষ সুরু হয়।

ধানের পক্ষে যে রকমের জমি দরকার, পাটের পক্ষেও সেই রকম। তাতেই ধানের জমিকে পাট টেনে নিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল জুড়ে পাট চাষ হ'ত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পাট চাষ করবার দিকে কোম্পানীকে সুদ্ধ করে। সন্ধান দেন ডক্টর বুকানন হ্যামিলটন। ১৮২৪ থেকে চাষ সুরু হলেও ১৮৫৪ সাল থেকে (ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর) এর প্রসার ঘটে। তাঁতী কোম্পানী তো ছিলই, এবার শ্রীরামপুরে কল প্রতিষ্ঠা হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে কলকাতার কাছে ৩৮টি কারখানা, ৭৫০ লক্ষ টাকা মূলধন, ১৮৪০৬টি পাট-তাঁতে, লোক খাটছে ১২৪০০০।

ভূমি আর এক প্রকারে চলে যাচ্ছে—রেলগাড়ী আর রাস্তা নির্মাণ করে। ১৮৫২-৫৩ সাল থেকে রেল পত্তন হয়। প্রথমে ব্রডগেজ অর্থাৎ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চির পারস্পরিক দূরত্বের রেল বসানো হয়। কারণ রেলের প্রয়োজন ছিল মাল চলাচলের জন্য। ব্রডগেজের মালগাড়ী ১০ থেকে ১৫ টন মাল নিতে পারে, আর মিটার গেজ তখন মাত্র ৫ টন নিতে পারত। কিন্তু একথাটা বলা হয়নি; বলা হয়েছিল, ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে ব্রডগেজই দরকার, বিশেষ করে সাইক্লোন এখানে বেশি। আসল কথা, জমিটা বেশি চলে গেল। পরে যখন সরকারেরই জমি অপচয় ব'লে মনে হয় তখন মিটার গেজ, ন্যারো গেজ প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। এই রেলের জন্য কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোম্পানী যে টাকা ধার করবে তার জামিন থাকতে হবে সরকারকে। অনেকটা বর্তমানকালের ওয়ার্কস ব্যাঙ্ক লোনের মতো। সরকার এতে আর্থিক দিক দিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় রাজ্য সরকারের অনুরোধে নিজেরা রাজ্যের রেলের ভার নেয়, ভার নেওয়ার অর্থ, কর-প্রথার পরিবর্তন করতে হয়।

১৮৬০-৬১ থেকে খাজনা কর প্রকৃতির পরিবর্তন করা হয়। নানারকমের ভূমি ব্যবস্থা চালু হল। রায়ত জমিদার মিলে সে এক হোতের অবস্থা। সরকার কোন জায়গায় শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন শস্য নিতেন, কোন জায়গায় কম। ১২ বছরের মেয়াদী অধিকার, কোথাও বা ৩০ বছরের। এমনি ক'রে ঐ সব থেকে চালের দাম বাড়তে সুরু করল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমে উৎপন্ন শস্যের মূল্য প্রায় অর্ধেকে নেমে যায়। চাষীদের দুরবস্থার শেষ নেই। অনবরত দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। তাদের মজুরীতে কতই না কামাক। বাংলার পূর্বপ্রান্তে তাদের মজুরী বেশি, আসাম পশ্চিমপ্রান্তে কম। কেউ গেট-ভাঙার কাজ করছে, কেউ কাপড় নিয়ে। এই সেদ দমতল আর পাহাড়িয়া চাষী বা ভূমিহীন ব্যক্তিদের কথা।

রাসায়নিক রঙের দরুণ ছিপাগার আর ঈজরেজ বা রঙকেরা বৃত্তিচ্যুত হল। ন্যাঙ্কাশায়ারের কল্যাণে দেশের তাঁতি বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষণের আশ্রয় নিল। ইস্পাতের প্রাবল্যে লোহার কারিগর মুষ্ষুর্, ধাতু পাত্রের জন্য পাথরের কাজ চলে গেল। বাড়ীঘর আর রেল নির্মাণে কাঠের অমটন, ছুতোরেরা কর্মহারা, অন্তত নিপুণ কারিগর নেই। লাঙ্গলের পড়তি। ১৮৭৮ সালেও ইয়োরোপীয়েরা

এদেশে রেড়ির তেল আলাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারপরই আমেরিকার কেরোসিন, তেলীদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল। মৌচাষীরা আর বন থেকে বেরোয় না, কিংবা বেরিয়ে আসে কমলার গাঁয়ে বা চায়ের বাগানে। তেমন আর আসব তেলের উপর অনেক সম্প্রদায় নির্ভর করত। তারা বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। রেলের দৌলতের জন্য পাড়াগাঁয়ের শকটচালকেরা দারিদ্র বরণ ক'রছে। ঘানি মানা শঙ্কিত। সামান্য কুসুমের চাষই কি তখন বাংলাদেশে কম ছিল! এই কুসুম থেকে তেলের বীজ হয়, রঙ হয়। তা গেল। ১৮৭৩-৭৪ সনেও তো এর চালান ছিল ১৩০০০ হন্দর, আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ৪ হাজার হন্দরে দাঁড়াল। শুধু কাপড় বা বস্ত্ররঞ্জন এবং বস্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে ভারতের বহু অধিবাসী নানাভাবে জীবিকা অর্জন করত, বহু রকমের কারিগরি বেঁচেছিল। তা কোম্পানীর কলে চলে গেল। এমনি ক'রে কার্পেট, পশম প্রভৃতির কাজ ছিল। অতিজ্ঞ পাঠকের কাছে সে সব বিষয় বিস্তারিত করে বলবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, এই সব কর্মকে অবলম্বন করে সমতলভূমির এবং আদিবাসীদের বহুলোক বেঁচে থাকত। ভূমি গেল, কর্ম গেল। কর্মের শিক্ষা গেল, সামাজিকতা গেল। আর তো কিছু থাকতে পারে না। কাজেই তারা অবজ্ঞাত শ্রেণীভুক্ত এবং আদিবাসীর পর্যায়ে নেমে থাকল ইংরেজের কাছে, নবশিক্ষিতদের কাছে, প্রাচীনপন্থীর কাছে; প্রাচীনপন্থীর কাছে, কারণ তারাই দেশ-পা বদল ক'রে কর্মসন্ধানে সহরে আসছে, খাদে নামছে, বাগানে খাটছে। তারা স্থায়ী নয়, তাদের মধ্যে কিছুই স্থায়ী নেই। উপরন্তু কাঁচা পয়সার ঝনঝনানিতে তারা নতুন মর্যাদার ইসারা পায়। তাদের চরিত্র নেই, তাদের সমাজ নেই। তারা শুধু অবজ্ঞাত নয়, তারা পরিত্যক্ত।

এরই মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা সমাজ-সংস্কার করলাম। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলাম, বিধবা বিবাহ প্রচলন করলাম, নতুন নতুন ধর্মপথ ও মত প্রতিষ্ঠা করলাম, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করলাম, মাতৃভাষা নিয়ে লড়াই করলাম। কিন্তু এই সব সমাজহিতকর কাজের কোন্‌টি তাদের স্পর্শ করেছে? মধ্যবিত্তের দাবী নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করলাম। কিন্তু তাদের তাতে কি উপকার হ'ল?

মহাত্মা গান্ধী তাই তাঁর আন্দোলনে এদেরকে টেনে আনতে চাইলেন। তাই তাঁর শিক্ষায় আছে (সাফাই), তাঁতি আছে (কাতাই), রঙরেজ আছে, গ্রামের প্রধান বৃত্তিগুলি আছে। গান্ধীজীর সমাজবোধের এই দিক, আর রবীন্দ্রনাথের সমাজের উচ্চ দিক যথা ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, ধ্যানীমন, সৌন্দর্যবোধ— এই দুই দিকটি নিয়ে ভারতের সামগ্রিক সমাজ-শিক্ষা এগোতে চেয়েছিল। বুনিয়াদি শিক্ষা 'শিক্ষার বুনিয়াদ নয়, কর্মরত মানুষের শিক্ষার বুনিয়াদ, আর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সমাজের চিন্তাশীল মানুষের সংযম ও সৌন্দর্য শিক্ষা।

কিন্তু ইংরেজ তাদের মধ্যে কোন্ শিক্ষা দিতে চেয়েছিল? মূল কথায় বলা যায়, ইংরেজের সন্তান করতে আর নিম্নশ্রেণী কুলী হ'তে। আর সেইজন্যই তারা ইংরেজীশিক্ষাকে বর্জন করে। বাংলাদেশেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। তৎকালের বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত (পশ্চিমের দিকে)। এই অঞ্চলের আততায়ী উড়িষ্যার ভূঁইহারা। এরা অনেকটা আদিবাসী, তবে হিন্দু বলে নিজেদের জানে। সেখানে ইংরেজী প্রাথমিক ইস্কুল খোলা হ'ল। ১৮৯৮-৯৭ এর রিপোর্টে দেখা যায়, মাত্র ৪ জন আদিবাসী ছাত্র। তারা ইস্কুল বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, কারণ তাদের মতে শিক্ষা আর পুলিশ উভয়ই উৎপীড়ক (They burnt the School houses in disturbance, and are said to regard police and education as equal forms of oppression.)। সরকারী রিপোর্টের কথা: তাদের

সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষা মিলছেনা বলেই তাদের এই ক্রোধ।

এই কথাটাই একটু আলোচনা করা যাক।

১৯০১ এর আদমসুমারীতে দেখা যায়, ভূঁইয়ারা সংখ্যায় ৯১৫৮১ জন। ২০টি উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে তারা বাস করে; ময়ূরভঞ্জ, পাংপুর, পাল-লহরা, কেউঞ্জর, কালাহাণ্ডি, নীলগিরি, চেন-কানল, তালচের প্রভৃতি রাজ্যে। ১৬০০ বর্গমাইল জুড়ে তাদের বাস। অরণ্যাঞ্চলের উচ্চভূমিতে তারা পল্লী নির্মাণ করে, পাল লহরা, বোনাই, কেউঞ্জরে তাদের প্রধান বাসভূমি।

ভূঁইয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত; মাল কুদি প্রভৃতি প্রধান শ্রেণি। পাহাড়ী ভূঁইয়ারা বাড়িতে বেঁধে কাঁধে বোঝা নেয়। অন্যেরা কাপড়। এরা শরপ্রিয় বা লড়ুয়ে জাতি। তাড়াটিয়া সৈন্য ছিসাবে খাটে। হিন্দুরা এদের হাতের জল খায়। এরা বিশুদ্ধ ওড়িয়াতে কথা বলে। বিবাহ প্রথায় স্বাধীন প্রেম এবং নির্বাচন মানে, তবু অনুষ্ঠান হিন্দুর মতানুযায়ী। অস্ত্রের মধ্যে ধনুক, তীরের মাথায় লোহার ফলা, বাঁকানো তরবারী, ছুঁড়তে চালাতে হয় এমন ভারী কুড়ুল। বনে ঢুকতে হলেই এই অস্ত্র তাদের সঙ্গী। অরণ্য পাহাড় এবং পাহাড়িয়া নদীর সন্নিকটে তাদের পল্লী বসবে। তাদের গ্রামের উপান্তে বাস করে পতিত জাতি পান এবং কোল, মজুরের কাজ করে এরা! সর্দারের বাড়ীর কাছে আছে মণ্ডপ। স্বভাবে বিশ্বস্ত, সাদু, বড়ই স্বাধীনতা-প্রিয়, আর অতিথিবৎসল, এদের অতিথি সৎকারের কথা উড়িষ্যা অকলে প্রবাদের মতো।

সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক প্রথা। প্রত্যেক কুলের পৃথক অস্তিত্ব। সমস্ত পরিবার মিলে একটি প্রধানকে নির্বাচন করে। তার কথাই চূড়ান্ত। কিন্তু তাকেও সামাজিক কোন নির্দেশ দিতে পরিবারের কর্তাদের ডেকে সম্মতি নিতে হয়। অনেক দেবতা। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—পৃথিবী বা বসুন্ধরা আর তৎপুত্র ব্যাঘ্র দেবতা। তারপর গ্রামদেবতা, জলদেবতা, অরণ্য-দেবতা, বৃষ্টি দেবতা। শালগাছের নীচে এদের প্রতীক পাথরের। বর্ষোৎসব তারা পালন করে। ঘরের চাকা বা অন্য ব্যাপারে কাঠ যোগান দেয়, বড়ি যোগান দেয়। উৎসবের মধ্যে 'মাঘ পোড়াই' আর 'করমা'—কৃষিবৃত্তের সঙ্গে যুক্ত। শিকার উৎসব 'আশ্বিন পাব্বি' কয়েকদিন ধ'রে চলে।

ধান প্রধান খাদ্য নয়, উৎসব-অনুষ্ঠানে খায় মাত্র। প্রধান খাবার ফলমূল, অরণ্যজাত অন্যান্য খাদ্য, আর শিকার-করা পশু। গাছের উপর এদের অধিকার, অধিকার মাটিতে। মাটি খুঁড়বে না, তাই পুকুর করবে না। মেয়েদের আর পুরুষদের স্নানের ঘাট সম্পূর্ণ পৃথক।

মূলত কৃষিজীবী। প্রত্যেকে নিজের জমি চাষ করে। ফসলের সময় প্রত্যুষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম কাজ করবে। ঘরে ফিরে এসে স্নান করে চারটি খেয়ে মৃত্যোৎসবে যায়। প্রতি বিশ বছরে বছরে একবার গ্রাম বদল করে। বন পুড়িয়ে গাছ কেটে আবাদ করে। প্রথম বছর সাধারণ শস্য, দ্বিতীয় বছরে ধান, তৃতীয় বছরে তরকারি। তারপর আবার নতুন জমি খুঁজতে হয়।

ইস্কুলকে তারা অনাবশ্যক উপকরণ মনে করে। যদি কর্তৃপক্ষ বলেন,—কেন তোমার ছেলে আসেনা ইস্কুলে? তোমার ভরিমানা।

—তাই নাকি? চল, আমিই যাই তোমার ইস্কুলে। হাসতে হাসতে বাবা উত্তর দেয়। এমনি তাদের শিক্ষায় ঔদাসীন্য।

কেনই বা উদাসীন হবে না! বিংশ শতাব্দীর পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহের পর দুটি বিদ্রোহ হয়েছিল, ১৮৬৮তে আর ১৮৯৩ সনে। ১৮৬৮ সালে সরকারী এজেন্ট ছিলেন স্যর জেমস্ অবস্টন। এদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম তিনি করেন নি। পরিবার পিছু খাজনা: প্রতি ঘরের জন্য ৪ আনা, লাঙ্গল প্রতি ৮ আনা। বর প্রতি ইস্কুলের বেতন ১ আনা। আর, সরকারের প্রতিনিধি এলে যানবাহনের খরচ বহন করতে হবে তাদের, ঘর তৈরীর কাজে লাগতে হবে। (ক্রমশঃ)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

প্রতিমাসেই প্রায় আমাদিগকে কোনও না কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে হারাইতে হইতেছে। বয়স হইলে সকলকেই যাইতে হইবে, মরণ কাহারও বারণ শুনিবে না। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা হয়—যেন সমূলঃ লোকো ন ক্ষুতো ন ভবিষ্যতি। যোগেন পণ্ডিত মহাশয় অশ্রদ্ধার সম্বোধন নয়, ভালবাসার, সমাদরের, ঘনিষ্ঠতার ডাক। যখনই কেহ তাঁহার কাছে গবেষণার এমন কি আলোচনার জন্য গিয়াছে, তখনই তাঁহাকে সহজরূপে পাইয়াছে। সেকালের পণ্ডিতদের জীবনযাত্রা ও স্বাধ্যায়ের আদর্শ তিনি একালেও রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সময় নাই অসময় নাই, সর্বদা অহিতাগ্নি জ্ঞানোপাসক অক্লান্ত-ভাবে শাস্ত্রচর্চা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

শিক্ষক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মহান্তির ভাষণ

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি মেদিনীপুরের অন্তর্গত পটাশ-পুর থানার প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতা চারুচন্দ্র মহান্তি শিক্ষকদের মহাসিলনের আয়োজন অভিনন্দন করিয়া বলিয়াছেন, "জাতির চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের যে দান সে দানের কথা শুধু আজকের দিনে নয়, যুগে যুগে স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র সেইজন্য পণ্ডিতের মধ্যে শিক্ষকও যে একজন পিতা, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পিতার কর্তব্য প্রতিপালন করিলে শিক্ষকসমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য মঞ্জুরি কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনকল্পে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থা সংশোধন করিবার পরামর্শই দিয়াছেন। শিক্ষার সাফল্য সর্বশেষ পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে না। স্কুলের আভ্যন্তরীন মূল্যায়নও চাই। সারা বৎসর ধরিয়া ছাত্রেরা কতখানি উন্নতি করিল, তাহারও দিনের পর দিন একটা হিসাব রাখা চাই, এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ছাত্রদের ক্রমাগত

অধ্যয়নের অভ্যাস হইতে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য দেখিতে হইবে যাহাতে এই আভ্যন্তরীন মূল্যায়নের অপব্যবহার না হয়।

কিন্তু শুধু এইটুকু করিলেই চলিবে না—ভর্তি করিবার সময়ে ছাত্রদের বাছাই করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। এদেশে ছাত্রনির্বাচনের কথাটা শুধু লয়্যাকলেই এবং কয়েকটি বিদ্যালয়েই আবদ্ধ আছে। প্রশ্নপত্রও দেখিতে হইবে, যেন শুধু বুদ্ধির পরীক্ষাই না হয়, অথবা মুখস্থ করার ক্ষমতাকেই উৎসাহ দেওয়া না হয়। কলেজে পড়িতেছে, অথচ পাঠ্য-পুস্তক কখনও দেখে নাই—ছাত্রদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য কমিটি কলেজগুলিকেই দায়ী করিয়াছেন।

যেখানে 'কিশলয় মোদিকা' এখনও চালু আছে, সেখানে কি আর কিছু বলিতে বা আশা করিতে পারা যায়!

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ

জ্যৈষ্ঠ মাসে নব্য দিল্লীতে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পরিষদ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, (১) উচ্চ বিদ্যালয়-গুলিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কাজ দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখা উচিত নহে; তাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা গুরুতর ভাবে ব্যাহত হইবে।

(২) সকল উচ্চ বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্ততপক্ষে শতকরা ৫০ টি বিদ্যালয়কে তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের নিদারুণ অভাব সম্পর্কে পরিষদ সুপারিশ করিয়াছেন যে বর্তমান গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য যাহাতে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিভিন্ন ধরণের অক্ষরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শিক্ষকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্বল্পকালীন সার্টিফিকেট কোর্স, অবকাশ কালীন কোর্স, পাঞ্জাবের ন্যায় দুই বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স প্রভৃতি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) প্রতি বৎসর ১লা ডিসেম্বর জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করিতে হইবে এবং ১লা ডিসেম্বরের পর সপ্তাহব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে। এই সময় সমগ্র দেশব্যাপী বিজ্ঞান মেলা এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শনী দ্রব্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিতে হইবে।

এজন্য যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে: তৃতীয় পরিকল্পনা কালে সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন এবং নূতন ও পুরাতন সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

(৫) বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকের স্বল্পতার সমস্যা দূরীকরণের জন্য পরিষদ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যোগ্য থাকিলে, ৬০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়াছেন।

(৬) বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নকল্পে পরিষদ প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে এক জন এবং প্রত্যেক ডিভিশন অথবা অঞ্চলে একজন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নকর্মী নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন।

(৭) বিজ্ঞান-ক্লাব গঠন আন্দোলনের প্রসার-কল্পে পরিষদ রাজ্য শিক্ষাগুরুকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা

শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়)

ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও কাশ্মীরে ন্যূনাধিক শতকরা ষাটজন বালক ও বালিকা (যাহাদের বয়ঃক্রম ৬ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে) স্কুলে যাইবার সুবিধা পায় না, কারণ পর্যাপ্ত স্কুলের অভাব। অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা কিছুটা ভাল হইলেও সমগ্র ভারতের মধ্যে কিঞ্চিদধিক শতকরা চল্লিশজন প্রাথমিক শ্রেণীর (৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক) ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা ব্যবস্থা আদৌ হইতে পারিতেছে না। ইহার কারণ, শিক্ষকের অভাব।

যাহাদের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে তাহারা কতটা শিক্ষা পাইতেছে তাহা বলা কঠিন। একদিকে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠন সামগ্রীর অভাব, অন্য দিকে পর্যাপ্ত বেতন ব্যবস্থা না থাকায় যে শ্রেণীর শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের পারদর্শিতার অভাব, প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষাকে খুবই নিম্নস্তরে রাখিয়াছে। অন্যদিকে যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকের অভিভাবক শিক্ষা সম্বন্ধে শুধু উদাসীনই নহেন, নানারূপ বাধারও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শিক্ষা লাভ করা যে কত প্রয়োজনীয় তাহার ধারণা পল্লী অঞ্চলে অনেক অভিভাবকের নাই। নয় বা দশ বৎসর বয়স হইলেই স্কুল ছাড়াইয়া, বা ছাড়ান সম্ভব না হইলে স্কুল কামাই করাইয়া মেয়েটিকে গৃহকর্মে মাতাকে সাহায্য করিবার কার্যে বা ছেলেটিকে কৃষিকর্মে বা কারখানায় পিতাকে সাহায্য করিবার দৃষ্টান্ত হয়ত বিরল নহে। ১৯২৯ সালে হার্টগ মহোদয় সর্বপ্রথম দেখান যে, যত বালকবালিকা শিক্ষা আরম্ভ করে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়িয়া শিক্ষা সমাপ্ত করে, ও দুই-তৃতীয়াংশ মধ্য-পথেই স্কুল হইতে বিদায় লয়। ইহা অবশ্য ব্রিটিশ যুগের কথা, কিন্তু ১৯৪৮ সালে বোম্বাইয়ের গোখলে ইন্সটিটিউটও দেখাইলেন যে ১৯৪৪ সালের যে তিন লক্ষাধিক বালকবালিকা প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিল, ১৯৪৮ সালে তাহাদের মধ্যে শতকরা যাহার জন অর্থাৎ এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছাত্রছাত্রীকে চতুর্থ অথবা প্রমোশন না পাওয়ার জন্য নিম্নতর শ্রেণীতে দেখা গেল ও প্রায় অর্ধেক ইতিমধ্যেই বিদ্যায় গ্রহণ করিয়াছে। দু এক বৎসর বিদ্যালয়ে যাইয়া তাহারা যেটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা ভুলিতে বেশিদিন লাগিবে না, ও পরিণামে তাহারা অশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে মাত্র।

কেন যে এরূপ হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান আবশ্যক। ১৯৫৮ সালের ভাদ্র মাসে এই প্রবন্ধের লেখককে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ভারতের প্রতিনিধিরূপে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরে যাইতে হইয়াছিল ও তথায় বালসাংস্কৃতিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা-সভায় ৯-১০ বৎসরের বালকবালিকাদিগের গৃহজীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্নাবলী প্রস্তুত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে এই প্রশ্নাবলীর উত্তর সংগ্রহের দায়িত্ব লেখকের উপর পড়ে ও লেখক লখনউ জেলার নগর ও গ্রামাঞ্চলে এই প্রশ্নাবলী

দিয়া তাহার উত্তর সংগ্রহ করেন। বঙ্গদেশে বীরভূম জেলায় শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে এই প্রশ্নাবলীর উত্তর সংগ্রহের জন্য লেখক শ্রীশিক্ষেতনের প্রাথীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন পরিচালক ও শিক্ষা পত্রিকার পরিচালক প্রবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের নিকট ঋণী। অবশ্য খুব অধিকসংখ্যক বালক-বালিকার নিকট হইতে উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় নাই; কারণ ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা দ্বারা উত্তরসংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। তবে সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বালকবালিকা নির্বাচিত করায় যাহাদের নিকট উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিনিধি স্থানীয় ধরা হইলে অসঙ্গত হইবে না। সমগ্র প্রশ্নাবলীর উল্লেখ করিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করাইতে চাহি না, তবে প্রশ্নাবলীর মধ্যে ৯-১০ বৎসরের বালক-বালিকাকে এমন দুইটি কার্যের উল্লেখ করিতে বলা হয় যাহার সুসম্পাদনে তাহারা গৃহে পুরস্কৃত হইতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে এমন দুইটি কার্যের উল্লেখ করিতে বলা হয় যাহার অবহেলার জন্য তাহাদের তিরস্কৃত হওয়া সম্ভব। এস্থলে গৃহকর্ম ও পঠনকার্যের তুলনামূলক উত্তরমাত্র দেওয়া হইতেছে, কারণ তাহাতে প্রতিপাদ্য সমর্থিত হইবে। অন্যান্য উত্তরের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেককে দুইটি করিয়া কর্মের উল্লেখ করিতে বলা হইয়াছিল। তাই শতকরা সংখ্যা কোন কোন স্থলে ১০০র অধিক হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ইহা ব্যতীত অপর কর্মগুলির শতকরা হার অপেক্ষাকৃত নগণ্যই ছিল।

তালিকা নং ১

	লখনউ		শ্রীনিকেতন
	নগরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
বালক			
গৃহকর্মে মাতাকে সাহায্য অথবা ভাই ভগিনীর দেখাশোনার জন্য পুরস্কৃত	৫১·৪%	৬৪·৯%	৭৯·৬%
পিতাকে সাহায্যের জন্য পুরস্কৃত		৪০·৫%	৫০·০%
পাঠের জন্য পুরস্কৃত	৯২·২%	৫৪·১%	৬০·০%
গৃহকর্ম অবহেলার জন্য তিরস্কৃত	৩১·১%	৬২·১%	৬০·০%
পাঠে অবহেলার জন্য তিরস্কৃত	২৫·৬%	৫·৪%	৫৩·০%
বালিকা			
গৃহকর্মে মাতাকে সাহায্য অথবা ভাই-ভগিনীর দেখাশোনার জন্য পুরস্কৃত	৫২·৫%	সকলেই	সকলেই
পিতাকে সাহায্যের জন্য পুরস্কৃত		১৬·১%	১০·০%
পাঠের জন্য পুরস্কৃত	৮২·২%	৩৮·১%	৪০·০%
গৃহকর্ম অবহেলার জন্য তিরস্কৃত	২৫·০%	সকলেই	২৬·৬%
পাঠে অবহেলার জন্য তিরস্কৃত	২·৪%	৮·৩%	৩৩·৩%

উপরোক্ত তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে নগরাঞ্চলে যাহাই হউক না কেন, গ্রামাঞ্চলে পঠনকার্যকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যতটা নামান্যরূপ গৃহকার্যকে। বালিকাদের বেলায় এটা অধিক প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইব অধিকাংশ বালকবালিকার উপর একাধিক কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, ও সেই দায়িত্বগুলির মধ্যেও গ্রামাঞ্চলে পঠনকার্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিশেষ করিয়া বালিকাদিগের বেলায় ইহা বেশ দেখা যায় যে তাহারা নিয়মিত ভাবে পড়িতেছে কিনা, তাহা হয়ত দেখাই হয় না।

তালিকা নং ২

	লখনউ		শ্রীনিকেতন
	নগরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
বালক			
গৃহকর্ম বা ভ্রাতা-ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ	২৭·০%	৬০·০%	৭২·০%
পিতাকে সাহায্য ; বা বাজার করা বা জল আনা	১২·৫%	৬৬·০%	৩২·০%
পঠন	৭১·১%	৩৮·০%	২৪·০%
বালিকা			
গৃহকর্ম বা ভ্রাতা-ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ	৮০·৫%	৬৮·৭%	৫০·০%
পিতাকে সাহায্য করা ; বাজার করা বা জল আনা		১১·২%	১৩·৪%
পঠন	৬৪·৫%	৪১·২%	২০·০%

এই উত্তর হইতে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আমরা এতদিন যে প্রকার শিক্ষা দিয়া আসিতেছি তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে, কারণ অন্ততঃ গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষাদান কার্যে আমরা গৃহ হইতে উৎসাহ ত পাইতেছিনা, বরং কতকাংশে হয়ত বাধা পাইতেছি। শিক্ষার প্রসারে এই বাধা সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দুই উপায়ে এই বাধা দূর হইতে পারে। প্রথম, পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষাকে অধিক কার্যকরী করিয়া। গৃহে যে ধরণের কার্য বালকবালিকারা করিতে অভ্যস্ত তাহার সহিত সমন্বয় রাখিয়াই পাঠক্রম নির্বাচিত করিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা ইহা কতকটা হয়ত সম্ভব, তবে মনে রাখিতে হইবে বিভিন্ন পরিবারের সমস্যা বিভিন্ন। কৃষক পরিবারের গৃহকর্ম, কর্মকার পরিবারের গৃহকর্ম হইতে বিভিন্ন। আবার মৎস্যজীবীর পরিবারের গৃহকর্ম, তন্তুবায়ের গৃহকর্মের অনুরূপ নহে। সকলেরই ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়িতে আসিবে। কতজনের সমস্যার সমাধান পাঠক্রম পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব?

অন্য উপায়, গৃহকর্মের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবস্থা রাখিয়াই স্কুলের সময়তালিকার নির্ধারণ। সাধারণতঃ স্কুল ১০টায় বসে ও ৩টা বা সাড়ে তিনটায় শেষ হয়। গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের সকাল বাড়ি হইতে বাহির হইতে হয় ও চারিটার পূর্বে তাহারা বাড়ি ফিরিতে পারে না। এতটা সময় অনাহারে থাকিয়া তাহারা এতটা ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে তাহার পর আরও কিছু সময় তাহাদের ক্লান্তি

দূর করিতে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় গৃহের দিক হইতে তাহাদের উপর যে দাবী আসে তাহা পূরণ করা কঠিন হয়। ভিরস্কার সেহলে অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, কখনও কখনও গৃহের দাবী মিটাইতে পাঠের প্রতি অবহেলা করাও আশ্চর্য নহে এবং এই অবহেলার জন্য খুব কম গৃহেই তাহাদের তিরস্কৃত হইতে হয়। ইহার ফলে পাঠের অবহেলা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে মধ্যপথেই পাঠ সাঙ্গ করিতে হয়।

স্কুলে যে সময়টা ব্যয় হয় তাহার কতকাংশ হয়ত নিরর্থক। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নির্ধারিত আছে, কিন্তু ছয় হইতে এগার বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের কোন বিষয়ে কুড়ি বা পঁচিশ মিনিটের বেশী মনঃসংযোগ করানো অসম্ভব। বাকিটা সময় নিরর্থক যায়। সময় সংক্ষেপ করিতে দৈনিক পঁচিশ মিনিট করিয়া সাত ঘণ্টা শিক্ষাদান ও পনের মিনিটের জন্য শারীরিক শিক্ষার জন্য ও পনের মিনিট বিরামের জন্য সময় রাখিলে দৈনিক সাড়ে তিন ঘণ্টার অধিক লাগিবার কথা নহে। তাহাতে বর্তমানে যতটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ততটা শিক্ষাই হয়ত দেওয়া হইবে।

এই ব্যবস্থার একটা লাভ, ইহাতে বিদ্যালয়ের সময়তালিকার সংশোধন সম্ভব। গ্রীষ্মকালে সকালে সাড়ে ছয়টা হইতে দশটা ও বৈকালে দুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা স্কুল করিলে একই গৃহে দুইবার স্কুল চলিবে। শীতকালে সময়ের ব্যবস্থা সাড়ে সাতটা হইতে এগারটা ও একটা হইতে সাড়ে চারিটা সম্ভব। শুধু বিদ্যালয়ভবন ও পাঠন সামগ্রীর সাশ্রয় ইহাতে হইবে না। একজন শিক্ষকের পক্ষে দুইটি ক্লাশ চালানো কঠিন হইলেও সময়ব্যবস্থার সুব্যবস্থার দ্বারা অন্তত দুইজন শিক্ষক দ্বারা তিনটি ক্লাশের ব্যবস্থা হয়ত কঠিন হইবে না।

শিক্ষায় প্রদার কার্যে এই বিভক্তিতার ফল খুব বেশী। যে সকল রাজ্যে অর্ধেক বা তাহারও কম ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাহাদের জন্য রাতারাতি দ্বিগুণ শিক্ষক সংগ্রহ করা অসম্ভব, ব্যয়ও খুব বেশী বাড়িয়া যাইবে। এ ব্যবস্থা কিন্তু ততটা কঠিন হইবে না, ভবনও বেশী নির্মাণ করিতে হইবে না, অতিরিক্ত শিক্ষক যত দরকার তাহা পাওয়াও কঠিন হইবে না। যে টাকাটা বাঁচিবে তাহার দ্বারা শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে যোগ্যতর শিক্ষকও পাওয়া যাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মহালাভ। বালক-বালিকার সকালটা বা বিকালটা একেবারে খালি থাকিবে। এ সময়ে তাহারা গৃহকর্মে সাহায্য করিবার সময় পাইবে। শিক্ষার জন্য গৃহের দিক হইতে যে বিরোধিতা আসিতেছে তাহাও দূর হইবে, ও বিদ্যালয় হইতে অনর্থক ছুটি লইবার বা মধ্যপথে শিক্ষা সমাপ্তির অভ্যাস অনেকটা দূরীভূত হইবে।

দেশের শিক্ষার কর্ণধারদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের এই একটা দিক সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। অন্য দেশের সমস্যাও আমাদের সমস্যা এক নহে। এই সমস্যার সমাধান আমাদের অবস্থা অনুযায়ী করিতে হইবে।

———

সহজ ও সরল

শ্রীইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষিত সমাজে স্বচ্ছল অবস্থার মানুষকে বিদ্যা-শিক্ষা শিশুকাল থেকে আরম্ভ করতে হবে। বিদ্যাশিক্ষা বলতে আমি শুধু পড়া ও লেখা এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা বোঝাচ্ছি। শিশুকে বিদ্যা ততটুকু করে দিতে হয় যতটুকু তার অপরিণত বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি গ্রহণ করতে পারে, এবং অল্পে অল্পে বাড়াতে হয় যাতে তার শক্তিগুলি পরিচালনার ফলে বাড়তে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক গ্রহণ শক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়াই বিদ্যাদানের উদ্দেশ্য। কারণ তাহলে সে সংসারের সকল ব্যাপার থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। স্কুলের বার ঘণ্টায় আর শিশুকে কতটুকু দেওয়া যায়—স্কুলের বাইরেটাই তার আসল পাঠশালা। সেই পাঠশালা থেকে সে যাতে নূতন নূতন জিনিস আহরণ করে আনতে পারে স্কুলে তারই পথ করে দেয়। কিন্তু যা সে এখনও বুঝতে পারে না এই রকম সব ব্যাপার যদি স্কুলে তার মগজে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, সেগুলি সে ভুলে যায়, নয়তো যদি স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়, তবে মুখস্থ করে রাখে। ফলে মন তার পরের কথার পাহাড় হয়, নিজের ভাববার বা বোঝবার ইচ্ছা ও শক্তি যায় লোপ পেয়ে। এই ধরণের বিদ্যাশিক্ষা চলত আমাদের দেশে (অন্য দেশেও) কিছু কাল আগে পর্যন্ত। মারধোর করে ছেলেকে শক্ত জিনিস কণ্ঠস্থ করাবার চেষ্টা হত। সেই জন্যই লেখাপড়া শেখা তার কাছে বিভীষিকা বলে মনে হত। শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি এদিকে পড়ে, এবং ক্রমে বেত মেরে শক্ত জিনিস শিশুর কচিমাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন বিপদ এসেছে অন্যদিক থেকে। এখন হয়েছে সহজ লেখাদের বিপদ। এখন ধরে নেওয়া হচ্ছে ছেলে বুঝতে অক্ষম, তাকে সহজ কথা ছাড়া কিছুই বলা হবে না। শিশুর মেহমন দুই-ই ক্রমবর্ধমান এবং বাড়বার জন্য উন্মুখ, এই সত্য যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রায়ই দেখি, শিশুর মন স্কুলই থেকে বাড়বার খোরাক পাচ্ছে না। অত্যন্ত সহজ জিনিস পেয়ে পেয়ে শক্ত জিনিস দেখার আগ্রহ থাকছে না, বুদ্ধির ধার কমে আসছে। কেবল না বুঝে মুখস্থ করে যেন তার নিজের চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যেত তেমনি ক্রমাগত সহজেই বোধগম্য ব্যাপার বুঝে বুঝে তার বোধশক্তি কেবল চক্রাকারে ঘোরে, সামনে এগুতে পারে না।

এই কারণে মনে হয়, এখন শিশুদের ক্লাসগুলিতে পড়ানোর বিষয় ও পদ্ধতির একটু বদল করার প্রয়োজন হয়েছে। এইটি স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুর মন অপরিণত, কিন্তু অক্ষম নয়। অপরিণতকে বুঝে বুঝে খোরাক দিতে পারলে সে ক্রমে পরিণত ও সক্ষম হবে। সহজ জিনিস থেকে ধীরে ধীরে শক্তর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শক্তকে শিশু যেন ভয় না পায়, তার কাছে কঠিন ও জটিলকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরল করে নেবেন। অর্থাৎ শিশুর পাঠ্য বিষয় সব সময় সহজ হবে না—কিন্তু বোঝাবার গুণে সরল হবে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, কিভাবে শক্তকে সরল করে শিশুর সামনে উপস্থিত করা যায়, এ কথা চিন্তা করে দেখুন। এসব জিনিস সর্বদা মনস্তত্ত্বের বইয়ে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মাকে যেমন নিজের নিজের ছেলের প্রকৃতি বুঝে দুধ খাওয়াবার সময় ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তেমনি প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যেকটি

শিশুর প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাকে বিশেষরূপ দুগ্ধ পান করাবার পন্থা বের করতে হবে। দুধ ভালো জিনিস, তা ছেলের স্বাস্থ্যকে দৃঢ় করবে, তা খাওয়াতেই হবে। দুধ খেতে চায় না বা ভাল লাগে না বলে যদি কেবলই ছেলেকে জল খাওয়াই তা হলে আমার ছেলেটির কি দুর্ভাগ্য হবে না? বিদ্যা শক্ত জিনিস, তা গ্রহণ করতে শিশুর কষ্ট হয়, ভাল লাগে না। সে তো হবেই, তা বলে বিদ্যার বদলে যদি কেবলই অ-বিদ্যা (অর্থাৎ সহজ বস্তু বা বিদ্যা নামের অনুপযুক্ত) ছেলের সামনে ধরে দেওয়া হয়, তাহলে ওতে তার মনের মৃত্যু হবে। যে ছেলে আনন্দ করে দুধ খায়, অর্থাৎ শক্ত জিনিস নিতে চায় তার জন্য বেশি চিন্তা গুরুমশায়দের করতে হবে না। সে শক্তকে শক্ত বলেই নিক। কিন্তু যে ছেলে শক্ত দেখলে নিতে চায় না, তার জন্য শিক্ষকেরা একটু ছেলেভুলানো পথ নিন। "ঐ দেখ কাক এসে খেয়ে গেল", "কে খাচ্ছে কে খাচ্ছে? শেয়ালে খাচ্ছে" বলে, অথবা চিনি মিশিয়ে দুধকে শিশুর মনে প্রবেশ করানো। মাষ্টারমশায় এক আধটা চড় চাপড়ই মারলেন (অবশ্য মায়ের মন যদি তাঁর থাকে তবেই এ অধিকার তাঁর আসবে), তাতে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যতই নিন্দা করুন, কিছু ক্ষতি হবে না। অসুখ রোগীকে তো ডাক্তার জোর করেও ইন্‌জেক্‌শান দেন, এবং একবার শরীরে ঔষধটা গেলে ভাল কাজই করে, মন্দ কিছু করে না।

আজ যে শিক্ষাবিভাগের উঁচুদিকে 'শিক্ষার মান কমে গেছে' 'শিক্ষার মান কমে গেছে' রব উঠছে এ কিছুতেই থামবে না, যদি তলার দিকে ছেলেকে কেবলই সহজ জিনিস শেখাবার চেষ্টা চলতে থাকে। অবশ্য নীচু ক্লাসেই শক্ত জিনিস শেখান হোক, বলতে এ কথা বোঝাচ্ছি না যে, যা শিশুর পক্ষে বোঝা অসম্ভব সে রকম কিছু আমদানী করা হোক। এ সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান খুব বড় বড় শিক্ষাবিদ্‌দের আছে, তাঁরা নীচু ক্লাসের পাঠ্যক্রম নিয়ে চিন্তা করুন।*

* শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'ঘরোয়া' পত্রিকায় সৌজন্যে।

ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮৯৩ সনে সরকারী এজেন্ট ওয়াইলি সাহেব। তিনি কর ধার্য করলেন লাঙ্গল প্রতি ১৩ আনা, সাড়ে ছ আনা ঘর প্রতি, আর ইস্কুলের কর হল দ্বিগুণ। যারা ঘর ছাইবে না তাদের খাজনা আরও ৩ আনা করে ঘর প্রতি।

এ ছাড়া আছে বনবিভাগের আইন। গাছ পোড়াতে পারবে না, বনে ঢুকতে পারবে না।

এ অবস্থায় তারা যদি ইস্কুলবাড়ী পোড়ায় বা নতুন শিক্ষায় উদাসীন হয়, তবে খুব দোষ দেওয়া যায় না। চাষের জন্য বন পোড়ানো চলতে পারে, মীলের জন্য পাটের জন্য বাস্তুনষ্ট করতে পারা যাবে, কিন্তু এদেশের অধিবাসীর রীতিনীতি মান্য করব না, তাদের জনমজুরী দেব না—এ রীতি তো কোম্পানী করেনি, করেছে সুদভ্য সাম্রাজ্যবাদী পার্লামেন্ট। আমার তো মনে হয়, ভূঁইয়াদের বিদ্রোহই প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন। লিখিত নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পার্থক্যই ছিল।

এমনি অনুন্নত সমাজ বা আদিবাসী ছিল গণ্ড, গউরা, ভুয়াং, সাঁওতাল প্রভৃতি।

গণ্ডরা অনার্য গোষ্ঠিভুক্ত; উড়িষ্যার পাটনা এবং সোনপুরে রাজ্যে প্রধানত বাস। এদের জন চলে না। কাজের মধ্যে চৌকিদারী কাজ, ভাঁতের কাজ আর গানবাজনা। সাধারণত তারা মোটা কাপড় তৈরী করত, যাকে বলে গড়া।

গউরাদের কুলগত কাজ ঘি তৈরী করা। ঘি তখন রপ্তানী হত। তারা বিনিময়ে পেত শুধু গোচারণক্ষেত্র আর সেই ক্ষেত্রের বেড়া দেওয়ার কাঠ। পরিবহনের কাজেও এরাই লাগত।

ভুয়াংদের বাস পাহাড়ে। বড় বেশি আদিম। পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে। আদম গাছের পাতা হচ্ছে পরিধেয়। কর্ণেল ডালটন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষদের কাপড় পরালেন, মেয়েদের কাপড় পরালেন জনস্টন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই ব্যাপারে হিবে রিজলী সাহেব তাঁর বিখ্যাত বইয়ে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, যতক্ষণ পায় না ততক্ষণই ধর্মের বুলি কপচায়। ন্যাংটাদাদাদের কাপড় পেয়ে আবার পেয়ে এখন বলে 'কাপড় দাও।' কিন্তু রিজলী সাহেব পরবর্তী কালের কথা বোধহয় জানতেন না। বিংশ শতাব্দীর সুরুতেও তারা গাছের পাতাই পরছে। সরকারী কথা, "But even at the present day they only wear these when they visit the public marts" ১৯১০ সালের কথা।

ভারতের দক্ষিণ পূর্ব খণ্ডের আর একটি আদিবাসীর কথা বলে নিই। এরা হচ্ছে খোন্দ।

এদের বাস পূর্বঘাট, গঞ্জাম আর মহানদী জুড়ে। এদের বাসভূমির দুটি ভাগ করা যায়; পশ্চিম আর পূর্ব প্রান্ত। পশ্চিম প্রান্তের খোন্দমালেরা আদিম আর বন্য। মদ খায়, শূকরের মাংস খায়। মেয়েরা কাপড় পরে কোমরে জড়িয়ে, কিন্তু বক্ষ নগ্ন। বলে তারা নিজেদেরই ভাষা। পূর্বপ্রান্তের খোন্দেরা উড়িয়া ভাষাভাষী, উড়িয়াদের মতোই আচার ব্যবহার।

খোন্দেরা বোধহয় এসেছিল গয়া থেকে বিতাড়িত

হয়ে ছোট নাগপুর আর গোণ্ডোয়ানার মধ্যদিয়ে। খোন্দ শব্দটি এল তামিল ভাষার কিণ্ডি আর তেলেগুর কণ্ডা থেকে। কণ্ডা অর্থ পাহাড়িয়া জাতি। মাল' কথাটা উড়িয়া, অর্থ পাহাড়িয়া অকল। এরা নিজেদের বলে কুই লোকু (কুই লোক), ভাষার নাম 'কুই কথা'। 'কুই' অর্থ উচ্চ। সবদিক থেকেই তাদের পাহাড়িয়া বলে মনে হয়। সাধারণ উপাধি এদের মালিকা, কাহারেরা, কাহর, জানি প্রভৃতি। মালিকা উপাধি প্রাচীন বংশের, কাহারেরা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বা নিম্নবংশের।

এদের একটি শাখা জিমরার নামে পরিচিত। বাউদ-এর রাজা এই উপাধি তাদের দিয়েছিলেন। জিমরার কথাটি বোধহয় জমিদার থেকে এসেছে। জিমরার অর্থ গৃহস্থ চাষী। গৃহস্থ চাষী আখ্যাটি তাদের আভিজাত্যের। কারণ 'গৃহস্থ চাষী' হলেই তারা উড়িষ্যাবাসীর বা সমাজের সমান মর্যাদা পেতে পারে।

এদেরও পিতৃতন্ত্র প্রথার সমাজ। বৃত্তি হিসাবে শ্রেণীভেদ আছে, যেমন কুমারেরা (কুমোর), তেজিনাক (লোহার), গাতিয়াঙ্গা (গোয়ালা)। কুমোরদের তারা সামাজিক মর্যাদা দেয়, কিন্তু অন্য দুটি সম্প্রদায়কে নয়।

পূর্বাঞ্চলের লোকে গোরু-শূকর প্রভৃতি খাওয়া উঠিয়ে দিয়াছে, চালানী কাপড় পরে, চুল ছাঁটে। হরিবংশ পুঁথি পড়ে, মেয়েরা কপালে উলকি কাটে না। এরাই জিমদার।

কোন মন্দির নেই। ভূমি দেবতা আর পাহাড় দেবতার পাথরের প্রতীক স্থাপন করে মাত্র। কৃষিকাজের বৃত্ত অনুযায়ী উৎসব-অনুষ্ঠান। এককালে এরা যাযাবরই ছিল, মাঝেমাঝে জঙ্গের জমি দখল করত, অরণ্য পরিষ্কার করে জমি তৈরী করত।

এরা যার যার বাড়ী নিজে তৈরী করে। কাঠেরই বাড়ী। ছুতোরের কাজ এরা সবাই জানে। কাঠের কাজে লোহার পেরেকও ব্যবহার করে না, কাঠেরই দম। দু বছর ধরে বাড়ী করে, ২০।২৫ বছর টেকে।

রঙীন তুলি-শাড়ী পরিধেয়। লাল আর নীল রঙ পছন্দ। চুল কাটে না, মাথায় চুড়ো করে বাঁধে।

অস্ত্রের মধ্যে প্রধান হচ্ছে টাঙ্গি। জীবিকার মধ্যে দুইতরাজ করা আর শিকার করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে হিন্দুরা পাক করলে খাবে, কিন্তু লোহার, গোয়ালা বা ধোবার হাতে খাবে না।

এরা কখনও ভিক্ষা করে না। কারও দাসও খাটবে না। দাস খাটানোকে তারা অপমানকর মনে করে। সরকার এদের কৃষিঋণ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যান করল। কারণ তারা মনে করল, এই টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে কিনে নেওয়া, তাদেরকে চাকর বানানো।

১৮৭৭ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত করপ্রথার একটি নীতিই ছিল। এরা সোজাসুজি সরকারের অধীনে। খোন্দদলদের জমি নিষ্কর। কিন্তু লাঙল প্রতি ৩ আনা খাজনা ধার্য হল। শস্যের অর্ধেক বা ¼ অংশ সরকার নিত। এদের স্থায়ী স্বত্ব নেই, ব্যক্তিগত স্বত্ব নেই। মালিকানা যৌথ।

মজুরীর হার কি? রাজমিস্ত্রীর দৈনিক মজুরী ৫।৭ আনা, কর্মকারের ৩ আনা, ছুতোরের ৩।৭ আনা, সাধারণ কুলীর ২।৩ আনা দৈনিক। এই হল তথাকথিত কারিগরদের।

চাষীদের দুটি শ্রেণী। মুলিয়া আর হালিয়া। মুলিয়াদের শস্যের ভাগ দেওয়া হত। হালিয়ারা গৃহস্থের ঘরে খাটলে, বছরে ১½ মণ চাল পায়, বন্ধোবস্তের সময় ১৫ মণ চাল, ২ খানা কাপড়, ১টা টাকা। বাৎসরিক টাকার হিসাবে ৩০৲ টাকা।

আর সরকারী রাজস্ব কেমন বাড়ছে? অমূল মহকুমাতেই—১৮৯২-৯৩ সালে ৬০,০০০৲ টাকা থেকে ১৯০৬-৭ সালে ৮৫০০০৲ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে চাল-গমের দাম।

অতুল মহকুমায় খোদ্দমালদের জন্য প্রাথমিক ইস্কুল ১২টি, ছাত্র সংখ্যা ১৯০৭এ ৭২৮ জন। গোন্দদের জন্য ৩টি ইস্কুল। পান-দের নিম্ন প্রাথমিক ১৫টি। উড়িষ্যার ঢেনকানল, কালাহাণ্ডি, কেউঝর প্রভৃতি রাজ্যে ছাত্র (আদিবাসী) ৬৩৪২। এদের জন্য বিশেষ ইস্কুলই আছে (১৯০৭-০৮ সালে)।

সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আমরা পরে বলছি। (ক্রমশঃ)

জলছবি

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

কাঙালীবাবু

কাঙালীবাবুর পরলোকগমনের খবর নিতান্ত পরিচিত যাঁহারা তাঁহাদের ছাড়া কাহারও জানিবার কথা নহে। আমিও জানিতে পারিতাম না, যদি না আমি তাঁহার ছাত্রপ্রতিম না হইতাম, বা আহরী হাই স্কুল কমিটির জাইস-প্রেসিডেন্ট না হইতাম। কিন্তু বিস্মিত হইলাম পরদিন সংবাদপত্র খুলিয়া। বিজ্ঞাপনরাজির মাঝখানে তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ তাঁহার ফটোসহ বেশ ঘটা করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; তাঁহার বিবিধ গুণাবলীর কথা তাহাতে শোভা পাইতেছে। তাঁহার সব পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এমন কি শোকার্ত পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতিনীদের নাম পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে। শুধু তিনি যে আহরী হাইস্কুলে ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে পড়াইতেন, সেই পরিচয়টাই চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমার জন্মেরও পূর্বে, এই স্কুলটির শৈশবকালে, কাঙালীবাবু অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। শুনিয়াছি, কাঙালীবাবু এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার পূর্বে টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া আর পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সাংসারিক অবস্থা এমন ছিল না যে আর এক বৎসর অপেক্ষা করেন; সুস্থ হইয়াই তাঁহাকে কর্মের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। তখনকার দিনে কর্ম সংস্থান, বিশেষ করিয়া সহায়-সম্বলবিহীন প্রবেশিকায় অনুত্তীর্ণ কিশোরের পক্ষে এত সহজ ছিল না। সুতরাং অনেক চেষ্টার পর কোন এক গ্রামের এক মাইনর স্কুলে দশ টাকা মাহিনায় চাকরী পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। তাহার পর যখন কলিকাতার এক প্রান্তে স্কুলটি স্থাপিত হইল, নিম্নতম ক্লাসে বাংলা ও অঙ্ক পড়াইবার জন্য স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় তাঁহাকে আনয়ন করেন। প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের অল্প মাহিনায় অভাবগ্রস্ত অথচ কর্মদক্ষ লোক খুঁজিয়া আনিবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। তখনকার দিনে আইনের নাগপাশও ছিল না, স্কুলটা ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হিসাবে চলিত, এবং শিক্ষক মহাশয়দের ডিগ্রী ডিপ্লোমা লইয়া এত কড়াকড়িও ছিল না। নিতান্ত উঁচু ক্লাসে ডিগ্রীধারী শিক্ষকের প্রয়োজন হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি, আমরা প্রবেশিকা ক্লাসেও এমন দু'একজন শিক্ষকের কাছে পড়িয়াছি যাঁহারা বি-এ পাশও ছিলেনই না, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ছিলেন কিনা সন্দেহ; কিন্তু তাঁহারা যে রকম পড়াইতেন, অনেক এম্‌-এ, বি-টি ও তাহার ধারে কাছে পারিবেন না। তাঁহারা যাহা শিখাইয়াছেন এই বয়সেও তাহা মনে আছে এবং তাহারই জোরে করিয়া খাইতেছি।

যাহা হউক, কাঙালীবাবু আঠার টাকায় এই

চাকরী পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছিলেন। কাছেই তাঁহার একটা বাসাও জোগাড় হইল, তখনকার দিনে চার পাঁচ টাকা ভাড়া। প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় কয়েকটা টিউশনীও তাঁহাকে জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার বিবাহও হইয়া গিয়াছিল। এখন পরিবারবর্গ তিনি কলিকাতায় আনাইয়া ফেলিলেন এবং কায়ক্লেশে দিনও গুজরান হইতে লাগিল।

আমি যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, তখন কাঙালী বাবুর বয়েকটি বছর এই স্কুলে কাটিয়াছে। দুই টাকা increment পাইয়া তাঁহার বেতনও কুড়ি টাকা হইয়াছে। (শেষ পর্য্যন্ত এই মাহিনা ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।) আমি অবশ্য তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্র নই, একটু উপরের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। কিন্তু তবুও তাঁহাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনের কথা মনে আছে। চুলগুলোকে আঁচড়াইয়া বাগ মানাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে—সেই চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়াই যেন খোঁচা খোঁচা চুলগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তৈলাক্ত চুলের আগায় ঘর্মবিন্দু চলচল্ করিতেছে। চোখে অত্যন্ত পুরু পয়কলার চশমা। সেই বয়সেই কপালে বলি ও মুখে রেখা পড়িতে সুরু করিয়াছে। খোঁচা খোঁচা গোঁফ ও একমুখ দাড়ি। পরনে একটা আদময়লা ছিটের হাতকাটা সার্ট ও খাটো বহরের ধুতি এবং পায়ে অত্যন্ত জীর্ণ ক্যাম্বিসের জুতা, ফাঁক দিয়া দুই পায়ের কড়ে আঙুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হাতে ডাবের একটি শীষ। তখনকার দিনে এক পয়সায় ডাব পাওয়া আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। পরে শুনিয়াছিলাম, অঘরনের ব্যামরাম বলিয়া প্রত্যহ এক পয়সার একটি ডাব তিনি খাইতেন। ডাবের জলে তাঁহার পানীয়, জলযোগ ও ঔষধ তিনের কাজ হইত, উপরন্তু কাউ পাওয়া যাইত ওই শীষ গাছটা,—যাহা তিনি বেতের পরিবর্তে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এই আকৃতির কখনও পরিবর্তন হয় নাই। নূতন সার্ট, নূতন ধুতি বা নূতন জুতা জোড়া পরিতে তাঁহাকে দেখি নাই; পরিবর্তন যাহা দেখিয়াছি তাহা শুধু আস্তে আস্তে তাঁহার কালো চুল কাঁচায় পাকায় ও শেষে বিলকুল পাকায় পরিণত হইতে, খোঁচা খোঁচা খোঁফে ক্রমশঃ পাকা খেজুরের রঙ ধরিতে—মাষ্টার মহাশয় বড় তামাকু প্রিয় ছিলেন—এবং বিশীর্ণ আননে বলিরেখায় ভরিয়া যাইতে। আর দেখিয়াছি, ডাবের শীষ শুরু হইতে শুরুতর হইতে, কারণ শেষের দিকে উক্ত মূল্যে ডাব খাইবার সঙ্গতি আর তাঁহার ছিল না।

ঘরের অভাব বশতঃ স্কুলের একতলার বারান্দাতেই শিশুশ্রেণী বসিত। তাহার পাশ দিয়া দোতলায় আপিস ঘরে যাইবার সিঁড়ি। বাবা আমাকে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন, কাঙালী বাবু লক্ষ্য করিলেন। পাড়ার একমাত্র স্কুল, কাজেই মাষ্টার মহাশয়দের সকলে চিনিতেন, মাষ্টার মহাশয়রাও সকলকে চিনিতেন। বাবা এ পাড়ার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা ছিলেন, তাঁহাকে তো চিনিবারই কথা। আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তিনি যখন ফিরিতেছিলেন, শুনিলাম, কাঙালী বাবু গেট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া ছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন—সেই তাঁহার প্রথম আসা। এমনি যেন দেখা করিয়া আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতে ও আমাকে উৎসাহ দিতে আসিয়াছেন—কিন্তু মনের গোপন কোণে বোধ হয় আমার গৃহশিক্ষকতার আশা ছিল। বাবা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেও একেবারে নিরাশ করেন নাই—আমাদের অনেকগুলি ফুটফুটে ছোট ছোট ভাইবোন ছিল, তাহাদের অ আ শিখাইবার ভার দিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি আসিতেন, উহাদের লইয়া ঘণ্টাখানেক বসিতেন, একটু খবরের কাগজ পড়িতেন, মাতা ঠাকুরাণী একবাটি চা ও ঠাকুরের বৈকালী প্রসাদ কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন

পাঠাইয়া দিতেন, সেটুকু পরম তৃপ্তির সহিত খাইতেন ও তাহার পর ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেন অন্য ছাত্রের বাড়ী। স্কুলে পড়াইবার সময় তাঁহার তর্জনগর্জন, তবল বেঞ্চির উপর নারিকেল শীষ আছড়ানোর শব্দ বহু শুনিয়াছি, যদিও প্রহার করিতে বিশেষ কাহাকেও দেখি নাই। কিন্তু বাড়ীতে তাঁহাকে কখনও তর্জনগর্জন করিতে শুনি নাই। সেই সময় তিনি সকাল সন্ধ্যা বিলাইয়া পাঁচছয়টা টিউশনী করিতেন—হাসিয়া বলিতেন, আমার হল উড়ে ঠাকুরের গলেশ পূজো, দোকানে ঘুরে ফুল তুলে যাওয়া। আমাদের বাড়ীতে তিনি বহুকাল পড়াইয়া ছিলেন, সেই ভাই-বোনগুলি বড় হইলে তাহার পরের গুলিকে, তাহার পর তাহার পরের গুলিকে, শেষে আমার পুত্র কন্যাদের পর্যন্ত।

কাঙালীবাবুর স্ত্রী একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। কাঙালীবাবুর মা সেই নাতিটিকে লইয়া সংসার আঁকড়াইয়া রহিলেন। কাঙালীবাবুর ভাই ছিল না, কয়েকটি কলহপ্রিয়া বোন ছিল, তাহারা কখনও কখনও কিছু দিনের জন্য কাঙালীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া থাকিত, কলহকোন্দল করিয়া কিছু টাকা পয়সা শাড়ী ইত্যাদি লইয়া চলিয়া যাইত। ইহাদের অনেকগুলির বিবাহ কাঙালীবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। এই বোনগুলির দ্বারা তিনি কোনও দিন কোন সাহায্য পান নাই, বরং বোন-ভগ্নিপতিদের তোয়াজ করিতে তাঁহার অবস্থার পক্ষে অতিরিক্ত অর্থব্যয় ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার বুড়ীমা অনেকদিন জীবিত ছিলেন। শেষের দিকে তিনি একেবারে অথর্ব ও শেষে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ কাঙালীবাবুকে একা রান্নাবান্না কাজকর্ম ছাত্র-পড়ানো সব কিছুর সঙ্গে মায়ের অক্লান্ত সেবা করিতে দেখিয়াছি। লোক রাখিবার বা খরচ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না; তবে এই পাড়ার অধিকাংশই তাঁহার ছাত্র, সুতরাং ডাক্তার বৈদ্য ঔষধ-পত্রের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

কাঙালীবাবুর ছেলেটি বড় ভাল ছেলে ছিল। মেধিতে সে মন্দ ছিল না, সে মায়ের আকৃতি পাইয়াছিল। পড়াশুনায় তাহার বিশেষ প্রতিভা ছিল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী হইলেও হৃদয়-হীন ছিলেন না, সুতরাং বিনা বেতনে পড়াশুনায় তাহার কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। সে আমাদের চেয়ে দু' এক ক্লাস নীচে পড়িত, কাজেই আমাদের নিকট চাহিয়া চিন্তিয়া বইও জোগাড় হইত। কাঙালীবাবুর পুত্র বলিয়া অন্যান্য শিক্ষকেরা তাহাকে স্নেহ করিতেন এবং পড়াশুনায় সাহায্য করিতেন। এইভাবে প্রথম দ্বিতীয় হইতে হইতে সে বৃত্তি লইয়া প্রবেশিকা ইন্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পাশ করিল এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করিয়া বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিল। কাঙালীবাবুর তখন আনন্দ রাখে কে! তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, হাকিম ছেলের বাপ হইয়া তিনি মোটর চড়িতেছেন, আর্দেক রাজত্ব লইয়া রাজকন্যা পুত্রবধূ তাঁহার ঘরে আসিয়াছেন এবং শ্বশুরের সেবা যত্নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। স্কুল তিনি তো ছাড়িয়া দিয়াছেনই। স্কুলের সহকর্মিগণ তাঁহার এই কাল্পনিক সুখের কথা শুনিতে শুনিতে কাবাপালা হইয়া গেলেন। আমরাও এত শুনিতে আরম্ভ করিলাম যে তাঁহাকে দেখিলেই পাশ কাটাইয়া যাইতাম। মনে মনে অবশ্য আমরা সকলেই তাঁহার এই সৌভাগ্যে সুখী।

অবশেষে সত্য সত্যই অর্ধেক রাজত্ব লইয়া রাজকন্যা তাঁহার ঘরে আসিল। কাঙালীবাবু দরিদ্রতম হইলেও কৌলীন্য মর্যাদায় নাকি তাঁহাদের সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এইরূপ কুলীনের সর্বগুণান্বিত পুত্রকে জামাই করিতে কাঙালীবাবুর বাড়ীতে মোটরের আনাগোনা সুরু হইল এবং নিলামের ডাক চড়াইয়া অবশেষে এক মোটরওয়ালা

ছেলেটিকে কিনিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন ঐ পর্যন্ত সফল হইয়া ঘর ফলিল না। বিবাহের পরদিন বরবধূ আসিবার কথা, কিন্তু বধূ সেই ভাঙা ঘর দেখিয়া মোটর হইতে নামিতে অস্বীকার করিলেন। অগত্যা শ্বশুর মহাশয়কে জামাতা ও কন্যাকে ঘুলাপাড়ে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া অন্যত্র বাসা ঠিক করিতে হইল: কয়েকদিন পরে বাবাজীবন কর্মস্থলে নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলেন। যাইবার আগে অবশ্য পিতার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিলেন এবং নববধূকেও বুঝাইয়া সুঝাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর আসিবার বোধ হয় সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কলিকাতাতে যে না আসিয়াছেন তাহা নয়, তবে কাজে-কর্মে দেখা-সাক্ষাতে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে ও পাড়ায় যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিত না। তবে পোষ্টকার্ডে মাসে মাসে সংবাদ আসিত ও যাইত। বলিতে ভুলিয়াছি, যৌতুকের টাকা বাবাজীবন আগে নিজেই লইয়াছিলেন, বৃদ্ধের কিছু মিলে নাই।

ইহাই নিয়ম—এইরূপই হইয়া থাকে। বৃদ্ধ যে তাহা না জানিতেন তাহা নহে,—তবুও অন্ধ স্নেহ সে কথা মানিতে চাহে নাই। আশা করিয়াছিলেন, পুত্র জানে তিনি কি ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, বড় মানুষের মেয়ে হইয়াও পুত্রবধূও তাহা বুঝিবে, তাঁহার হৃদয়ের দিকে তাকাইবে। মনে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যথা তিনি মনের ভিতরই রাখিয়াছিলেন, কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। বরং পুত্র ও পুত্রবধূ যখন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গেল, তখন বড় লোকের বড় ঘরের মেয়ে হইয়াও বৌমা কিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার নোংরা জামা কাপড়, ততোধিক নোংরা তামাক টিকে ছড়ানো ঘর, এ সব দেখিয়াও তাহারা ঘৃণা করিল না, তাঁহাকে কিরূপ ভক্তিভরে প্রণাম করিল, কিরূপে সর্বদা পত্র লিখিতে অনুরোধ করিল ও সময় পাইলে পুত্রের কর্মস্থলে যাইতে বলিল, তাহাই সানন্দচিত্তে সোৎসাহে গল্প করিতেন, তাঁহার ক্লান্তি হইত না। তিনি নেহাৎ আমাদের ভালবাসেন বলিয়া যাইতেছেন না, মতে পুত্র এখনই তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিতে চায়। বৌমার শরীর তেমন ভাল নয়; এখানে কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি নিজেই তাঁহাকে মানা করিয়াছেন আসিতে, এসব গল্প কত যে শুনিয়াছি! কিন্তু একটি জিনিস তিনি বুঝিতে পারিতেন না; গল্প বলিবার সময় তাঁহার চশমার পুরু পরকলার অন্তরালে একবিন্দু জলের উপর আলো পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি!

ইতিমধ্যে স্কুলের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হইতে লাগিল। প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রেরা স্কুলের স্বত্ব লইয়া মামলা মোকর্দমা সুরু করিল। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল, তাঁহারা প্রোপ্রাইটারী স্কুলের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে নানারূপ আইন জারী করিলেন। বলা বাহুল্য আমাদের স্কুলকেও সেই আইনের যূপ কাষ্ঠে বলি দিতে হইল। তাহার recognition কাড়িয়া লওয়া হইল। স্কুলটি একরূপ উঠিয়াই গেল বলিলে হয়। সে আজ প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বছর আগেকার কথা। নেহাৎ পাড়ার ধারে কাছে আর কোনও স্কুল ছিল না। তাই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বজায় রাখিয়া কোনও ক্রমে উহা টিম্ টিম্ করিয়া চলিতে লাগিল। যে কয়জন পুরাণো শিক্ষক টিকিয়া রহিলেন, তাহাদের মধ্যে কাঙালী বাবু অন্যতম। কাঙালী বাবুর না ছাড়িয়া যাইবার মূলে তাঁহার প্রবেশিকা না পাশ করাও একটা কারণ ছিল, কারণ অন্যত্র তাঁহার পক্ষে চাকরি দুর্লভ। আর কুড়ি বছর মাষ্টারি করিয়া এখন অন্য কাজ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই সময় কাঙালীবাবুর বড় দুঃসময় গিয়াছে। স্কুল হইতে

সাধারণ বর্ষ পনের টাকা পাওয়া যায়, আর হইলে তবেতো বেতন। আর যা দু' একটা টিউশনী। আজকাল পাশ করা ছেলের এত ছড়াছড়ি যে তাঁহাকে কেহ ডাকিতেও চাহে না, পুরানো বলিয়া যা দু' একটা আছে, যাহারা তাঁহার মূল্য জানে। পুত্রের নিকট চাহিলে কিছু মিলিত, কিন্তু কেন জানি না, বৃদ্ধের সে মতি কখনও হয় নাই, শত কষ্টেও পুত্রের নিকট হাত পাতেন নাই। পুত্রের নিকট যাইতেও চাহেন নাই, কারণ জানিতেন পুত্র পোষ্টকার্ডে যাহাই লিখুক, পুত্রের নিকট তাঁহার অবস্থান পুত্রবধূ খুব ভালভাবে গ্রহণ করিবেন না। বহুদিন শিক্ষকতা করিলেও এইটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁহার যায় নাই।

একদিন হয়তো ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার বাসায় গিয়া পড়িয়াছি। তিনি প্রথম আসিয়া যে বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই বাসাতেই ছিলেন—বাড়ীওয়ালার পুত্র তাঁহার ছাত্র ছিল, বর্তমানে সে-ই বাড়ীওয়ালা; কাজেই দরিদ্র শিক্ষককে উৎখাত করিতে তাহার বিবেকে বাধিয়াছিল—যদিও সে তাহার কাছে যাহা পাইত, আজকাল তাহার পাঁচগুণ পাইতে পারিত। গিয়া দেখি, এককোণে চারিটি চিঁড়া জলে ভিজানো, একটুকরা লেবু, একটু নুন ও একটু গুড়। আমাকে দেখিয়া হয়তো বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইতেন; তাহার পর ব্যাপারটা ঢাকিবার জন্য কাল্পনিক পেট গরমের অবতারণা করিয়া চিঁড়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেন; আমি বুঝিতাম, হয় বৃদ্ধের সংস্থান, নয় রাঁধিবার উৎসাহ, নয় রাঁধিবার মত শারীরিক পটুত্ব, অথবা তিনটিরই অভাব; তাই এই চিঁড়াভেজার ব্যবস্থা। কখনও হয়তো বিকালে গিয়া পড়িয়াছি, দাওয়ায় বসিয়া রুটি বানাইতেছেন,—আমাকে দেখিয়া ঘরের ভিতর হইতে কালো মাটির একটা ভাঁড় বাহির করিয়া আনিলেন ও তিনি যে কেমন পরোটা ভাজিতে পারেন তাহা বহুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া সেই ভাঁড় হইতে কয়েকটি গুড় বাহির করিয়া রুটীতে মাখাইতে মাখাইতে উহা পরোটায় পরিণত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেদিন কিছুই জুটিত না সেদিন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপবাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতে হইত। এমন বলা বাহুল্য, আমার ও তাঁহার অন্যান্য ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের বাড়ীতে মাসাধিক কাল্পনিক বারব্রত পূজা আচার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত;—এখনি খাইতে বলিলে তিনি একদিন দু'দিন আসিতে পারেন, রোজ আসিবেন না। তবে হয়তো পড়িয়া যে পাইতাম না তাহা নহে. একবার চতুর্দশীতে যে ব্রত হইবার কথা অষ্টমীর দিন সে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম মনে আছে। হয়তো পড়িয়া কি কৈফিয়ৎ দিয়াছিলাম মনে নাই। খাইতে আসিলে ছাত্রদের গৃহিণীরা তাঁহাকে যে যত্ন করিত তাহাতে তিনি নীরবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেন, পুত্রবধূর কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িত বোধ হয়।

ইতিমধ্যে recognised স্কুলের অভাবে বাড়ীর বড় অসুবিধা হইতে লাগিল, পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর আসিয়া আবেদন করিলেন। জাহ্নবী হাইস্কুলকে ভাঙিয়া গড়া হইল, নূতন কমিটি হইল। আমরা কিছু টাকা দিলাম, কিছু টাকা চাঁদা উঠিল। আমি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, সুতরাং আমাকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইতে হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া সাময়িক ভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ছাত্র প্রেরণের অনুমতি পাইলাম। স্কুলের পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে তখন মাত্র কাঙালীবাবুই ছিলেন। তাঁহার ত্রিশ টাকা মাহিনা ধার্য হইল।

তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে নাই, সুতরাং ত্রিশ টাকা মাহিনায় কাঙালীবাবুর ও তাঁহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের একরূপ চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু গোল বাধিল অন্যদিক দিয়া। কাঙালীবাবু "Unqualified", এই অনুহাতে

একদল লোক আন্দোলন সুরু করিল উঁহাকে সরাইতে। পাড়ার তখন নূতন লোকে ভরিয়া গিয়াছে, পাড়ার সে একান্নবর্ত্তী আর নাই। আমরা প্রবাদ গণিলাম। কারণ ভাহুরী হাইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে কাঙালীবাবুও আমাদের কাছে একটা Institution হইয়া গিয়াছেন। অনেক কাঠ খড় পুড়াইয়া উঁহাকে আপাততঃ রাখা গেল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখা যাইবে কিনা সন্দেহ রহিল। তাহার উপর অপর পক্ষ রটনা করিতে লাগিল উঁহার পুত্র এখন জেলার হাকিম, উঁহার কি অভাব, পুত্রের কাছে যান না কেন? শেষ পর্যন্ত তিনিই আমাদের চিন্তা হইতে মুক্তি দিলেন পরলোকগমন করিয়া।

সামান্য অসুখ, তাহাতেই যে এমন হইবে ভাবিতে পারি নাই। একটু জ্বর, একটু পরীষ খারাপ, দিন দুই ভোগ, তাহার পর—ব্যস। উঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডাক্তার ছিল, তাহারাও দেখিল, আমরাও যথাসাধ্য করিলাম। কিন্তু ফল কিছু হইল না। উঁহার পুত্রকে খবর দিলাম। দিন দুই পরে সেও আসিয়া পৌঁছিল। তখন সব শেষ। উঁহার বাসার নিকটে একটি বড় বাড়ী লইয়া শ্রাদ্ধবাসর হইয়াছে। বিরাট প্যাণ্ডাল বাঁধিয়া মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছে, বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া গান গাহিতেছেন। অনূন পঁচশত লোক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পাইয়াছে, আমিও পাইয়াছি। শ্রাদ্ধবাসরের সম্মুখে মোটরের ভিড়। খবরের কাগজেও ফটোসহ খবর বাহির হইয়াছে। দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তবুও কাঙালীবাবু কাঙালী থাকিয়াই গেলেন, এই কথাটাই বারে বারে মনে পড়িতেছে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৬৭ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

এ মাসের বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ক্ষমতা বলে ১লা জুলাই হইতে হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ৩১টি কলেজ উহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। শ্রীসুকুমার সেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীসেন পরিশাসনে অভিজ্ঞ, এবং সমগ্র স্বাধীন ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহার ব্যবস্থায় নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গতিপথ সহজ হইবে।

একত্রিশটি কলেজের মধ্যে হুগলীতে তেরটি, বর্ধমানে নয়টি, বীরভূমে চারটি, বাঁকুড়ায় তিনটি ও পুরুলিয়ায় দুইটি।

হুগলীর কলেজগুলির মধ্যে হুগলীতেই তিনটি—তাহার মধ্যে আবার একটি মেয়েদের, একটি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়; আরামবাগে দুইটি; বাগাটি, ইটাচোনা, কামারপুকুর, চন্দননগর, নবগ্রাম, শ্রীরামপুর, রিষড়া ও উত্তরপাড়ায় এক একটি করিয়া।

বর্ধমানের কলেজগুলির মধ্যে বর্ধমান শহরেই দুইটি, তাহার মধ্যে একটি হইল মেয়েদের জন্য; আসানসোলে দুইটি, তাহার মধ্যে একটি মেয়েদের জন্য; কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, দুর্গাপুর, মানকরে—এক একটি করিয়া।

বীরভূম জেলার চারটি কলেজ—বোলপুর, হেতমপুর, রামপুরহাট ও সিউড়ি—প্রত্যেক স্থানে এক একটি করিয়া।

বাঁকুড়ার তিনটি কলেজের দুইটিই হইল বাঁকুড়ায়, একটি বিষ্ণুপুরে; পুরুলিয়ার দুইটি কলেজই পুরুলিয়ায়।

এতদিন ধরিয়া কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কয়েক বৎসর পূর্বে পুরুলিয়ার কলেজ দুইটি বিচার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—উচ্চ শিক্ষার

ব্যাপক ও গভীর প্রসার হওয়া চাই। আমরা আশা করিব যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষার যথার্থ বিস্তারণ হইবে।

পরীক্ষার ফলাফল

বৎসরের এই সময়ে পরীক্ষার ফল জানিবার জন্ত লোকের উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক। পরীক্ষা আমাদের নিকটে শুধু অর্থোপার্জনের পথ খুলিয়া দেয় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করে। আর ইহাতে শুধু ছেলেরাই নয়, তাহাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অভিভাবক সকলেরই মনে হোলা লেগে—অর্থাৎ পরীক্ষার ফল জানিবার জন্ত বহু লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

বিশেষ করিয়া এইবার স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক দুইটি পরীক্ষার ফলই গুরুত্বপূর্ণ। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রবেশ করিবে তাহাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই—ভারতবর্ষের সর্বত্র এই প্রথা চলিতেছে; আর যাহারা স্কুল ফাইন্যাল দিয়াছে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে আরও এক বৎসর পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবার দিয়াছে ১০,০৮৯ জন। আর স্কুল ফাইন্যালে পরীক্ষা দিয়াছে ১,০২,৪৭৬ জন—উচ্চ মাধ্যমিক অপেক্ষা সংখ্যায় দশগুণ বেশী। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে শ্রীমান কল্যাণবিকাশ সিংহ হিন্দু স্কুল হইতে, আর স্কুল ফাইন্যালে প্রথম হইয়াছে শ্রীমান মুকুলকুমার মজুমদার, হেয়ার স্কুল হইতে।

যাহারা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং যাহারা সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সকলকেই অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করি। কল্যাণ হোক।

পুস্তক প্রকাশ

প্রথী জনতি পণ্ডিতঃ। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, যার যত বই সে তত পণ্ডিত; কথাটা অবশ্য উপহাসের। তাহা হইলেও যে দেশে যত বই প্রকাশিত হইয়াছে সে দেশে বিদ্যার তত আদর, এরূপ মনে না করিবারও কোনও কারণ নাই। অন্ত দিক দিয়া যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার আমাদের কোনও সাধনও তো নাই।

১৯৫৮ সালে কোন দেশে কত বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটা হিসাব UNESCO হইতে প্রকাশিত এক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে; তাহা এইরূপ:

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে	৬৩,৩৪১
জাপান	২৪,১৮৩
যুক্তরাষ্ট্র (U.K.)	২২,১৪৩
পশ্চিম জার্মানী	১৯,৬১৮
ভারত ,,	১৭,৪৩৩
যুক্তরাজ্য (U.S.A.),,	১৩,৪৬২
ফ্রান্স	১১৭২৪

ভারতকে বিদ্যা প্রসারের ব্যাপারে—হউক তা পুস্তকের মাধ্যমে—আরও অগ্রসর হইতে হইবে, আরও অগ্রসর।

ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা

(শ্রীশীরেন্দু সান্যাল)

ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে যে এ বিষয়ে বলার মত নূতন কথা নাই বলিলেও চলে। সাময়িক পত্রাদিতে বহু আলোচনা হইয়াছে, কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ একক ভাবে ও সমবেত ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠ্যসূচীর দোষ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির দোষ, শিক্ষকগণের অযোগ্যতা, ছাত্রছাত্রীগণের উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব, বেকার সমস্যাজনিত ব্যর্থতাবোধ, যুগের হাওয়া—প্রভৃতি এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণরূপে উপস্থত হইয়াছে। অনেকের আলোচনার ধারা দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন না, অথবা জানিয়াও অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা পরিহার করিয়াছেন।

বীজের নিকৃষ্টতা, সারের অল্পতা, সুচারু বৃষ্টির অভাব, কৃষকের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতা, বলদের দুর্বলতা প্রভৃতি কৃষিকার্যের ব্যর্থতার হেতু, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যর্থতার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে জমির স্বরূপ সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হয়। জমি যদি পাষাণ বা বালুকাময় হয়, তাহা হইলে অন্য কোন হেতু না থাকিলেও কৃষির ব্যর্থতা অনিবার্য।

শিক্ষাক্ষেত্রের জমি, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীগণ, আলোচনা হইতে প্রায় বাদ গিয়াছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার সময়ে ফলের শোচনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় সকল পত্রিকায় যে সকল সত্তানুগতিক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা পড়িয়া ছাত্রেরা মনে করে যে ফলের শোচনীয়তার জন্য পাঠ্যসূচী, প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষকগণই দায়ী—ছাত্রদের কোন দায়িত্ব নাই। এই সকল সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাত্রগণকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে উৎসাহিতই করে।

এখন দেখা যাউক, ছাত্রগণের স্বরূপ কি।

অবৈতনিক প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা কিছুই শিখিতেছে না—ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। শুভঙ্করাচার্যগণের দ্বারা পরিচালিত অধুনালুপ্ত পাঠশালাগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছুই শিখিত, ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অথচ এই পাঠশালাগুলির পরিচালনার জন্য সরকারকে অতি সামান্য অর্থই ব্যয় করিতে হইত। জনসাধারণকেও শিক্ষাকর দিতে হইত না।

আধুনিক প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইতেছে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতেও এই সকল অযোগ্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি না করিয়া উপায় নাই। কারণ বেঞ্চিগুলিকে খালি রাখা চলে না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরাজি পড়ান বন্ধ হইয়াছে। পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীগণকে এ বি সি ডি শেখান হইতেছে। দুই বৎসর ইংরাজি পড়িয়াই তাহারা সপ্তম শ্রেণীর পূর্বতন পাঠ্যসূচীর সম্মুখীন হইতেছে। পূর্বে চারি বৎসর (কলিকাতা অঞ্চলে আরও অধিক কাল) ইংরাজি পড়িয়া ছেলেমেয়েরা সপ্তম শ্রেণীতে উঠিত। এখন দুই বৎসর ইংরাজি পড়িয়া (অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর) ছাত্রছাত্রীগণকে সপ্তম শ্রেণীর ইংরাজির পাঠ দেওয়া হইতেছে। এইরূপ

অবিবেচনা প্রসূত ব্যবস্থার ফল যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইতেছে। কোনরূপে ব্যাখ্যানি মুখস্থ করিয়া এবং পরীক্ষাগৃহে অর্থপুস্তকের ছেঁড়া পাতার সাহায্য লইয়া অথবা বাহির হইতে আমদানী করা উত্তরের নকল করিয়া ছেলেমেয়েরা কিছু নম্বর পাইতেছে। তাহাদিগকে কিছু ইংরাজি শেখান সম্ভব হইলে হয়তো এত অন্যায় হইত না। অঙ্কের বিষয় সম্বন্ধেও একই কথা। ব্যর্থতাবোধের পরিণতি স্বরূপ নিজেদের প্রতি অশ্রদ্ধাবুদ্ধির উদয় হওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাহারা এতই সন্দিহান যে পরীক্ষার বহু পূর্ব হইতেই তাহারা অবৈধ সাহায্য প্রাপ্তির নানারূপ ব্যবস্থা করে। কোন কোন শিক্ষকও তাঁহাদের প্রাইভেট ছাত্র ও পুত্রাদির উপকারার্থে এই সকল অশুচি ব্যবস্থার সহিত জড়িত থাকেন বলিয়াও শোনা যায়। নম্বর পাউক বা না পাউক, কতকগুলি ছেলেমেয়েকে উচ্চতর শ্রেণীতে তোলা হয়। সেখানে অজ্ঞতার বোঝা লইয়া তাহারা আরও গভীর অকূল দাগরে পড়ে। ব্যর্থতাবোধ বাড়ে। শিক্ষক পড়াইয়া যান, তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। অভিভাবকের খরচ বাড়ে, ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়ে, কিন্তু জ্ঞান বাড়ে না। এই ভাবে তাহারা স্কুলের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত যায়।

আর এক সমস্যা ভূমিয়ার হাই স্কুলগুলিকে লইয়া। যে সকল অঞ্চলে স্কুল পরিচালনার জন্য সর্বনিম্নসংখ্যক ছাত্র নাই, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার অর্থ নাই, দলাদলির ফলে স্কুলের সুপরিচালনা অসম্ভব—সাধারণত সেই সকল অঞ্চলে এই স্কুলগুলি স্থাপিত হয়। সহজ প্রোমোশন ও স্ত্রী দেওয়ার লোভ দেখাইয়া অন্য স্কুল হইতে ছাত্র আকৃষ্ট করা হয়। অন্য স্কুলের প্রোমোশন না পাওয়া ছেলেকে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। স্কুলের শেষে কোন কেন্দ্রপরীক্ষা না থাকায় এই সকল স্কুল হইতে অষ্টম শ্রেণীর প্রায় সকল ছেলেকেই নবম শ্রেণীতে উঠিয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকের দশম শ্রেণীতে পড়ার যোগ্যতাও থাকে না। হাই স্কুলগুলিও বেকি পূরণের জন্য এই সকল ছাত্রদের অন্ততঃ অনেকগুলিকে ভর্তি করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের অধিকাংশই অযোগ্য ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহাদেরও অনেকগুলি সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত যায়।

শেষ পরীক্ষা আসে। না শিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সহায়ক অনেক পুস্তক পাওয়া যায়। অযোগ্য ছেলেমেয়েরা এই সকল পুস্তক হইতে সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে। কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে অবৈধ উপায় অবলম্বনের কোন বাধা নাই। পরীক্ষার পূর্বে অনেক প্রশ্ন জানা যায়। প্রকাশ্য ভাবে প্রশ্নপত্র বিক্রয়ও হয়। গ্রেস মার্ক আদির সুবিধাও আছে। অগত্যা অনেক ছাত্রছাত্রী কিছু না শিখিয়াও পাশ করিয়া যায়। কিন্তু কলেজে পড়ার নিম্নতম যোগ্যতাও তাহাদের থাকে না।

কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজীয় অশন-বসন-চাল-চলন আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় না। ফুটবল, সিনেমা, অশ্লীল সাহিত্য, অভোজ্য ভোজন, প্রভৃতির নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করার ফলে মলিন বুদ্ধির শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা লোপ পায়। আবার পরীক্ষা আসে। পূর্বাভ্যস্ত উপায়গুলির সাহায্যে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া টেবিল চেয়ার ভাঙ্গে, অন্য পরীক্ষার্থীর খাতা কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া দেয়। ইহা ব্যর্থতাবোধ-প্রণোদিত, উন্মার্গগমনশীল, অনিয়ন্ত্রিত যুবশক্তির উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি।

এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য পাঠ্যসূচী, শিক্ষক, শিক্ষাদান প্রণালী ও পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতিকে—এমন কি ছাত্রগণকেও দায়ী করিলে চলিবে না। দায়ী করিতে হইবে সেই শিথিল ব্যবস্থাকে যে ব্যবস্থায়

ফলে যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিয়াও ছাত্রছাত্রীগণ বৎসরের পর বৎসর উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে।

ইহার উপর শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পাশমার্ক কমাইয়া দিয়া, এগ্রিগেট কমাইয়া দিয়া, তাহার উপরেও গ্রেসমার্ক দিয়া, পুনঃ পরীক্ষার অন্তিমর করিয়া অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে পাশ করানর উৎকট চেষ্টা করিতেছেন। আবার টেবিল চেয়ার ভাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইতেছে। এই পাপচক্রের শেষ কোথায়?

পরীক্ষায় চুরি করিয়া ধরা পড়িলে পরীক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়। তাহার কারণ যোগ্যতা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীর যাহা প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা সে অধিক নম্বর পাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। গ্রেসমার্ক দিলেও পরীক্ষার্থীকে তাহার যোগ্য অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়। অতএব গ্রেসমার্ক দিলে যে অন্যায় হয় তাহার সহিত পরীক্ষায় চুরি করিয়া বেশী নম্বর পাওয়া রূপ অন্যায়ের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। তবে এই অন্যায় কর্তৃপক্ষ করেন বলিয়া উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। সূক্ষ্ম বিচারে দুইটিই সমান।

এই সকল শিথিল ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা ও পরিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ভাল ছেলের অমর্যাদা হইতেছে, বাংলার বাহিরে বাঙালীর সুনাম নষ্ট হইতেছে এবং অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হইতেছে। অযোগ্য পরীক্ষার্থীর পাশ হওয়া, যোগ্য পরীক্ষার্থীর ফেল হওয়ার মতই অশোভন ও বেদনা দায়ক।

যে দেশে নিকেলের মুদ্রাকে টাকা বলা হয় সে দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ডিগ্রীধারী বলায় হয়তো দোষ নাই!

———

মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

মহাভারতের আলোচনায় অনেক বিদুষী রমণীর কথা জানা যায়, কিন্তু গ্রন্থকার মহর্ষি শুধু দ্রৌপদী ও উত্তরা ব্যতীত অন্য কাহারও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিতে দেন নাই।

যাঁহাদের বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা, তাঁহারা নিজেই পরিবারের কন্যাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন স্থলে গৃহশিক্ষকের কথাও পাওয়া যায়।

আচার্য গৌতম শিষ্য উতঙ্কের সমাবর্তনের সময় বলিতেছেন, "আমার এই কন্যা ছাড়া অপর কোন কুমারী তোমার পত্নী হইবার যোগ্য নহে।" উতঙ্ক দীর্ঘকাল আচার্যগৃহে বাস করিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, সম্ভবতঃ আচার্য এই শিষ্যটির হাতে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত কন্যাটিকে শিষ্যের উপযুক্ত সহধর্মিনী হইবার মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই উদাহরণে শিষ্যাই যে বালিকার শিক্ষক ছিলেন, ইহা বোঝা যাইতেছে।

তাপসীবেশধারিণী কুমারী শকুন্তলা পিতার আদেশে অতিথি সৎকারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমাগত অতিথি দুষ্মন্তকে যথাশাস্ত্র পাদ্যাদি প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। কণ্ব তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে পতিবংশের কল্যাণ ও ধর্মে চিত্তের স্থিরতা প্রার্থনা করিয়াছেন। অন্য কোন বর চাহেন নাই। হস্তিনাপুরীর রাজসভায় দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার যে-সকল কথাবার্তা হয়, তাহাও বিশেষ

পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায়, তিনিও একজন বিদুষী ছিলেন। তেজস্বিতার সহিত ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ শকুন্তলা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বিদুলা নামে ক্ষাত্রধর্মরতা দীর্ঘদর্শিনী এক নারীর তেজস্বিতা মহাভারতের পাঠককে বিস্মিত করে। তাঁহার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজকর্তৃক পরাভূত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। জননী পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে নানা উদ্দীপক উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, তুষাগ্নির ন্যায় মুহূর্মুহু ধূমায়িত হইও না, বেশী না পারিলেও এক মুহূর্ত কাল দাবাগ্নির মত শিখা বিস্তার করিয়া জগৎকে দেখাও, তুমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান, কাপুরুষের মত বাঁচিয়া থাকায় কি ফল? শৌর্যবীর্যহীন সন্তানের জননী সমাজে লজ্জিত হইয়া মৃতকল্প অবস্থায় কাল যাপন করেন। বিদুলার পুত্রানুশাসন অধ্যায় হইতে তাঁহার রাজধর্ম-জ্ঞানের যেরূপ প্রখরতা দেখা যায়, অশিক্ষিতা নারীর কাছে তাহা আশা করা যায় না।

সাবিত্রীর উপাখ্যান পুরাবৃত্ত হিসাবেই মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার চরিত্র সকলেই জানেন। নারদ ও অশ্বপতি কর্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি মনে মনে সত্যবান্ পতিকে বরণ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। তৎকালে এই দুই তত্ত্ববাক্তির সহিত এবং পরে যমরাজের সহিত তিনি যে-সকল শাস্ত্রীয় কথাবার্তা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার এক উক্তি হইতেও জানা যায়, সাবিত্রী শিক্ষিতা ছিলেন।

বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়েও কোন কোন মহিলার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বিবরে মহাভারতে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সুলভা নামে একজন যোগিনী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মোক্ষবিদ্যা আলোচনার নিমিত্ত তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। মিথিলাপতি ধর্মধ্বজ জনকের সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি যে যোগৈশ্বর্য ও অধ্যাত্মবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শান্তিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ভিক্ষুকীর বেশে মিথিলার রাজসভায় প্রবেশ করেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার যোগজ দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্মিত হন। যোগিনী সুলভা যথারীতি সৎকৃত হইয়া রাজর্ষির যৌগিক সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজের বুদ্ধ্যাদি বৃত্তি দ্বারা রাজর্ষির বুদ্ধ্যাদিকে গ্রস্ত করিতে চাহিলেন। রাজর্ষিও যোগপ্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিচলিত না হইয়া নানাপ্রকার অপ্রিয় প্রশ্নে সুলভাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগিনীর মোক্ষবিদ্যার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাজর্ষি শ্রদ্ধায় শির অবনত করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি সিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেখানে ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা তপস্যায় নিরত থাকিতেন। তাঁহারও যোগশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল।

শিবা-নাম্নী একজন ব্রাহ্মণকন্যা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বেদাদিশাস্ত্রে সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও তপস্বিনী ছিলেন।

হরিবংশ হইতে জানা যায়, বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগসিদ্ধা ছিলেন। তিনি নানা স্থানে পর্যটন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

অনুশাসন পর্বের গোড়াতেই গৌতমী নামে এক অসাধারণ মনস্বিনীর দর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে কালপ্রাপ্ত হইলে তিনি মৃত্যুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শুধু দ্বিতীয় জীবন্মুক্তের পক্ষেই সম্ভবপর।

মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী আচার্যা অরুন্ধতী ছিলেন বশিষ্ঠেরই 'সমানব্রতা' এবং পরম বিদুষী। ঋষিগণও তাঁহার মুখ হইতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইতেন। সমাগত বিদ্যার্থিগণের শ্রদ্ধা ও জ্ঞান পিপাসা সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সেই মহীয়সী আচার্যা কোন উপদেশ দিতেন না।

শাণ্ডিলী নামে একজন পতিব্রতা নারী পাতিব্রত্য ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশগুলি অতি চিত্তাকর্ষক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই বিষয়ে তিনিও একজন আচার্যা ছিলেন।

ব্রাহ্মণগীতায় দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। পত্নী প্রশ্ন করিতেছেন, আর স্বামী উত্তর দিতেছেন। প্রশ্নের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শিখণ্ডীর উপাখ্যান অতি অদ্ভুত। তিনি দ্রুপদরাজের কন্যারূপে জন্মিয়া পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। কন্যা অবস্থাতেই তিনি ধনুর্বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন। ধনুর্বিদ্যায় আচার্য দ্রোণ তাঁহার গুরু। তিনি পুরুষ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। ইহাতে অনুমিত হয়, গুরুগৃহে যাইয়াই ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুর পর সত্যবতীর বুদ্ধিবলেই নষ্টপ্রায় কুরুবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সত্যবতী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্মের রহস্য অবগত ছিলেন। কোথায় কিরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না।

মহাভারতের নারীগণের মধ্যে গান্ধারীর স্থান অতি উচ্চে। গ্রন্থকার মহর্ষি বলিয়াছেন, গান্ধারী মহাপ্রজ্ঞা, বুদ্ধিমতী, ধর্মার্থদর্শিনী এবং জ্ঞানমন্ত বিবেচনায় নিপুণা। ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রমুখ প্রাজ্ঞ পুরুষগণও গান্ধারীকে দীর্ঘদর্শিনী বলিয়া সম্মান করিতেন। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি ও তেজস্বিতার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কি উপায়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

কুন্তীর চরিত্র আলোচনা করিলেও মনে হয় তিনিও অশিক্ষিতা ছিলেন না।

দ্রৌপদী এক পণ্ডিত গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতা, ধর্মজ্ঞা, ধর্মদর্শিনী প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহাকেও ভূষিত করা হইয়াছে। বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার কথোপকথনে দেখা যায়, তিনি পুরাণের অনেক উপাখ্যান এবং রাজধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। দূতরূপে কুরুসভায় কৃষ্ণের যাত্রার পূর্বে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার রাজনীতিতে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যভামার সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময়েও তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, হাজার হাজার লোকের খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি তাঁহাকেই করিতে হইত। অসংখ্য দাসদাসীর কাজকর্মের দেখাশোনা করা, যথাকালে তাহাদের বেতন দেওয়া, তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধান, এইগুলিও ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম। রাজকোষের আয় ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখিবার দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি একাই এই সকল কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। এরূপ পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতা মহাভারতে আর কোন গৃহিণীর মধ্যে দেখা যায় না।

বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা ও তাঁহার সহচরীগণ বৃহন্নলা (অর্জুন) হইতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাল অর্জুন বিরাট রাজার পুরীতে আপনাকে সঙ্গীত শিক্ষক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এবং রাজান্তঃপুরে বালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যযাতি রাজার কন্যা মাধবী সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞা ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার উপায় সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না।

ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

উপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি আমরা ধারণা পেলাম এই, নানাভাবে আদিবাসী আর অবজাতদের প্রাচীন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের শিক্ষতান্ত্রিক প্রথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের যা সংস্কৃতি তা অবজ্ঞাত আর পরিত্যক্ত, তাদের যা অধিকার তা আর স্বীকৃত নয়, তাদের যা ব্যবসায় তা আর আদৃত নয়। এরা কেবল বঞ্চিতই নয়, এরা অসন্তুষ্ট আর মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি, এখন থেকে তারা অনুন্নত। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি চরিত্র-সৃষ্টি হয় তবে তাদের সামাজিক ব্যবস্থায় তো চরিত্রের কোনো গ্লানির দিক দেখতে পাইনি। সমাজের কাজকর্ম করা যদি সামাজিকতা হয়, তবে তারা তো তৎকালের সামাজিক কাজে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। তা হলে কোন্ শিক্ষা তাদের দিতে হচ্ছে! এক ধর্মের বদলে অন্য ধর্মে এলেই কি কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যায়! খ্রীষ্টান ধর্ম কুসংস্কার থেকে মুক্ত, তা তো ভলটেয়ার পড়লে কেউ মনে করবে না, বর্তমানকালে পায় লাগার্কভিস্ট বা ল্যাকসনেস-এর গ্রন্থ পড়লেও মনে করা যায় না। সমাজতত্ত্ববিদ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন-এর আলোচনার পর ধর্মে কুসংস্কার যে কি বস্তু তা আবিষ্কার করতে বিলম্ব হতে হয়।

তা হলে নতুন শিক্ষার করণীয় হচ্ছে—বৈজ্ঞানিক ব্যবসায় আর প্রবঞ্চনার রাজনীতির সমুখীন হয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকা আর শক্তিশালী জাতির কাছে দাস হয়ে আত্মবিক্রয় করতে শেখা। তাই যদি হয়, তবে সে শিক্ষা অনুমোদনযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, অবজ্ঞাত বা অস্পৃশ্য জাতি কেবল হিন্দুরই সৃষ্টি নয়। এই অস্পৃশ্যতা বা অবজ্ঞা আদিবাসীর সমাজ-ব্যবস্থাতেও আছে। অর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তারা যখন সাহেবদের কাছ থেকে শুনতে পেল, 'তোদের অস্পৃশ্য রেখে ওরা কেমন বড় হচ্ছে দেখ। তোরা টাকা পয়সা করে বড় হতে গেলে ওদের চোখ টাটায়' তখন সমাজযোগে ভাঙন ধরে গেল। যে অভাব সৃষ্টি করেছে সেই যদি খেতে দিয়ে কুপরামর্শ দেয়, তবে তা সৎপরামর্শ বলেই মনে হয়। এই নীতিতে ইংরেজ, সমাজের ঐক্য এবং সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্ক-নিয়ম ধ্বংস করে দিল, আর এদেরকে কারখানার কুলির কাজে আনা সহজসাধ্য হল। ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় এই জন্য যে, অন্তত আধুনিক ভারতে একজনও এই দিকটি ধরতে পেরেছিলেন, তাই শিক্ষার মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, এবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করি, ভারতবর্ষে আদিবাসী আর অবজ্ঞাত বা অনুন্নতদের শিক্ষা সম্পর্কে কি করা হয়েছে। এ কথা আবার বলতে হচ্ছে যে, ১৮৮০-৮১ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্তও এই দুইটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে একত্রে হিসেব করা হয়েছে, অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষার চরিত্রে কোন পার্থক্য করা হয় নি। যেন দুটি সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামো আর মর্যাদার বেগ বা গতি এক! যে দেশে ব্রাহ্মণদের জন্য সম্ভ্রান্তের ছেলেদের জন্য মধ্যবিত্তদের থেকে পৃথক ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হল, সেদেশে এমন দুর্যোগ ঘটল কেন জানিনা। হয়ত এই দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর গবেষণার অভাব।

১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের বাংলাদেশের হিসাবে এই দুই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বলা হয়েছে ২৫,৫২, ২৯৩। এদের মধ্যে সাঁওতাল ১৩,৮৭,২০২ ; কোল ৮,৭১,৬৬৬ ; পশ্চিম আদিবাসী ৪,৬৯,৬২২ ; পূর্ব আদিবাসী ৮৮,৩৯৯ ; আর অবশীকৃত ৩৪,৪০৪ জন। পশ্চিম আদিবাসীরা থাকে পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায়, ছোটনাগপুর এবং অন্যান্য সামন্ত রাজ্যে ; পূর্ব আদিবাসীরা থাকে পূর্ব-হিমালয়ে প্রভৃতি অঞ্চলে ; পশ্চিম আদিবাসীর মধ্যে ওঁরাও এবং মাল্লড়েরাও আছে। পূর্ব আদিবাসীর মধ্যে আছে গারো, খাসি, মণিপুরী, কুকী, মেচ, চাকমা প্রভৃতি।

এ সব অঞ্চলে যাতায়াতের বড় অসুবিধা। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা করাও সরকারের বড়ই অসুবিধা। উদ্যোগী একমাত্র মিশনরীরা। তখনকার হিসাব-পত্তরের কাগজে এমন শীর্ষ ছিল না যাতে এদের ছাত্রসংখ্যা সঠিক ধরা যায়। যাই হোক, আনুমানিক ছাত্রসংখ্যা বাংলাতে তখন ২৮,২৫৯ জন।

নিম্নপ্রাথমিকে ছাত্র সংখ্যা বেশি ; ঢাকা, পাটনা, ভাগলপুর অঞ্চলে মেয়েরাও পড়ছে। উড়িষ্যার করদরাজ্যে (বোধ হয় ২৪টি) মেয়েদের সংখ্যা বেশ বেশি। যশোর থেকে সেবার একটি ছেলে নিম্নবৃত্তি পাশ করল, কলকাতার ২৮টি ছেলে মেথর সম্প্রদায়ের। বর্ধমানে ১০০টি ইস্কুল এদের জন্য, বীরভূমে ১৭, বাঁকুড়ায় ১০, মেদিনীপুরে ৭৩। ছাত্র সব সাঁওতাল। রাজসাহীতে ৭১৫টি ছাত্রের মধ্যে ৬৭ জন মেচ, ৪১ জন ভুটিয়া, ১২ জন গারো, ৪ জন লেপচা, ২ জন নেপালী। চাকায় আছে মণিপুরী ছেলেমেয়ে, ময়মনসিংহে হজাং, হড্ডি, বাসাই, বাথাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ছেলে। এমনি সব অঞ্চলের হিসাব আছে।

ছোটনাগপুরের শিক্ষাব্যবস্থা মিশনরীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বার্লিন মিশন পড়ায় ১৪৫৮ জন, এস. পি. জি মিশন ১০৫৭, ফ্রেঞ্চ চার্চ ৪৭১, জেসুইট ১৫৬ জনকে।

বার্লিন আর এংলিকান উভয় মিশনেরই হেড-কোয়ার্টার ইস্কুল রাঁচিতে। গ্রাম থেকে ছেলেদের এনে দু'বছরের জন্য (ন্যূনপক্ষে) পড়ায়। এই ইস্কুল বোর্ডিং ইস্কুল। গান বা প্রার্থনা-সঙ্গীতে এদের খুব নাম।

পরের বছরে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াল ৩০,১৫১ জন। ইস্কুল সংখ্যা ১৯টি। প্রতি ইস্কুলে ৬৲ টাকা করে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয় ; ভালো ফল দেখালে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারী গ্রান্ট থেকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। বেতন দিতে হয় না, বই শ্লেট কিনতে হয় না। খরচ সর্বসাকুল্যে ১৩৩৮ টাকা। বাঁকুড়ায় ৭টি। এই বছর Wesleyan Normal School খোলা থেকে সিলেটপুরে উঠে এল।

মেদিনীপুরে সাহায্যপ্রাপ্ত নর্মাল ইস্কুল একটি আছে। ৫২টি ভর্তী ইস্কুলের শিক্ষক সরবরাহ করা হয় এখান থেকে। এইসব ইস্কুল আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন চালায়।

দামিন-ই-কোহ্ স্কীমে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হল, যাতে মিশনরীদের সঙ্গে কোন সঙ্ঘর্ষ সরকারের বা আর কারো না বাধে। আইন-কানুন হল। ৮২টি নতুন ইস্কুল খোলা হল, ছাত্রসংখ্যা ১৯৩১ জন।

তার পর বছর ছাত্র সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল ২৭,২০১ জন। ছাত্রী সংখ্যা নাকি বাড়ছে। মিশনরী ইস্কুল সংখ্যা ১৮৮৫-৮৬ সালে ছিল ১৪০, এখন হল ১৭১টি। ছাত্র সংখ্যা ৩৪১৭ থেকে ৩৫৪০-এ দাঁড়াল, মিশন কিন্তু খরচ করে ২২,৯৫৩ টাকা ; সরকার দেয়, ৭,৭৯২ টাকা।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয় একবার আদমসুমারী হয়। সেই থেকে নির্ণয় করা হয়েছে, সমগ্র ভারতে এই লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার। তার মধ্যে বাংলাদেশে (তৎকালীন বিভাগ অনুযায়ী)

আছে ⅛ অংশ, মধ্যপ্রদেশে ⅛ অংশ, আসামে ৳ অংশ, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া এজেন্সী ½ অংশ, মাদ্রাজে ১/৯ অংশ, রাজপুতানা, বেরার, বরোদা, বর্মাতে প্রায় ১০ লক্ষ।

শিক্ষা প্রাপ্তের সংখ্যা ১০ হাজারের মধ্যে বোম্বাইতে ১০৪, বেরারে ১৮, বাংলা ও আসামে ৮১, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে ৪৭ এবং ৪০ যথাক্রমে।

ভারত সরকার এদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন নিম্ন পদ্ধতিতে—(১) বিশেষ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে, (২) বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে, (৩) এই সম্প্রদায়ের শিক্ষকে বিশেষ শিক্ষণ দেওয়া হবে, (৪) মিশনরীদের পর্যাপ্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

সমগ্র ভারতে এই সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ৯১,০০০ (১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রেসিডেন্সীতে খোঁজ নিতে গেলে ১৯০১-২তে দেখি :

মাদ্রাজের আদিবাসীদের ৩টি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে : (১) গঞ্জাম, ভিজাগ এবং গোদাবরী এজেন্সীর আদিবাসী অর্থাৎ খোণ্ড (প্রায় ৩১৭০০০) শবর বা সওর (১৮৩০০০)। (২) নীলগিরির বাডাগা বা বড়গা অর্থাৎ তেলেগু লোক, এরা কৃষিজীবী। (৩) অন্যান্য, যেমন লম্বড়ি—এরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পশুপালন করে, কৃষিজীবী ; চেনচু—তেলেগুতে কথা বলে কিন্তু শিকারী এবং সংগ্রহী ; কোটা—নীলগিরি পাহাড়ের কারিগর এবং বাদক ; টোডা—পশুচারক প্রভৃতি।

মাদ্রাজ সরকার এদের জন্য প্রাথমিক ইস্কুল এবং কিছু মিশ্র মাধ্যমিক ইস্কুল খুলেছেন ; ফলাফলের উপর সাহায্য নির্ভর করে, তা ছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ইস্কুলের সংখ্যা গঞ্জামে ১৩৭, ভিজাগে ১৪০, গোদাবরীতে ৭২, এই ৩৪৯টি ইস্কুলের মধ্যে ১৬৪টি সরকারী, ৭৭টি সাহায্যপ্রাপ্ত, ৬০টি সাহায্য পায় না, ৪৮টি দেশী প্রথায়। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩৪৬১। বিশেষ ইস্কুল যথা বড়গা, লম্বড়ি, চেনচু প্রভৃতির জন্যও আছে। সালোম চৌড়াদের জন্য চার্চ মিশনারী সোসাইটির ইস্কুল আছে।

বোম্বাই অঞ্চলের আদিবাসীরা কোলি, ভীল, ঠাকুর, তাঞ্জারি, আহির প্রভৃতি, আর আছে সুরতের কালিপরজ। পুণাতে আছে কোলিদের ইস্কুল, খান্দেশে ভীলদের, সুরতে কালিপরজের। ছাত্র সংখ্যা ১৯০১-০২ তে ৭৬৬৩।

বাংলাদেশের আদিবাসীর শ্রেণী সম্পর্কে পূর্বে বলেছি। এই বছরে তিন রকমের ইস্কুলের কথা জানা যায় : (১) ছোটনাগপুরের মিশনরী ইস্কুল, (২) সাঁওতাল পরগণার মিশনরী এবং অন্য ইস্কুল, আর (৩) কয়লা-খনির সন্নিকটস্থ ইস্কুল। রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রামে সরকার দুই ইস্কুলও স্থাপন করেছে। মিশনরী ইস্কুলের সংখ্যা এখন ২৩৭, ছাত্র ৬৭৬৬। সাঁওতালদের মধ্যে দু'রকমের ইস্কুল ; (১) মিশনরী এবং (২) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে গ্রামবাসীদের পৃষ্ঠপোষণায় স্থাপিত। এই দুই ধরণের ইস্কুলেই সরকার সাহায্য করে। মিশনের মধ্যে নাম দেখা যায়—চার্চ অব ইংলণ্ড মিশনারী সোসাইটি, স্কাণ্ডিনেভিয়ান মিশন।

দুমকাতে সাঁওতালদের জন্য বিশেষ আবাসিক বিদ্যালয় সরকার স্থাপন করেছে। এখানে বিশেষ ডেপুটী ইন্‌সপেকটর, সাঁওতালী সরকারী ইন্‌সপেকটর এবং পণ্ডিত। গিরিডিতে ৪০টি বিশেষ ইস্কুল আছে ; এখানে কয়লা খাদের শ্রমিকদের ছেলেরা পড়ে। এই শ্রমিকেরা প্রায় সবাই আদিবাসী। সরকার এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এই সব ইস্কুলের ব্যয় বহন করে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৬৬১। এ ছাড়া সর্বরীতে (মানভূমে) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল কোল কোম্পানীও ছোট অথচ সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল স্থাপন করেছে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নজাতি অচ্ছুতদের শিক্ষার কথা একটু বলি।

মাদ্রাজেই এর প্রাবল্য বেশি। উচ্চবর্ণের ঔদাসীন্যেই নাকি তাদের দারিদ্র্য আর অশিক্ষা। তাই সরকার বিশেষ ইস্কুল খুলবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু সবই মিশনারীর সহায়তায়। আদিবাসীর আর নিম্নজাতির ইস্কুলের চরিত্র প্রায় একই প্রকার। মাদ্রাজের পঞ্চম শ্রেণীর লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষের উপর। তৎকালে এদের সেই ১৮৯৩ সালের ব্যাপারটা কাটা ছিল নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষণ বিদ্যালয়ের পঞ্চম ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হ'ল। মাদ্রাজে তাদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

(২) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ দেওয়া হল যে, পঞ্চমদের বস্তীতে বিশেষ ইস্কুল স্থাপন করতে হবে।

(৩) পঞ্চম ইস্কুলের জমির খাজানা মকুব।

(৪) নির্ধারিত সাহায্য অপেক্ষা বেশি সাহায্য দেওয়া হবে, ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে (শতকরা ৫০ এর বেশি অধিকতর সাহায্য বরাদ্দ হল)।

(৫) বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হল।

(৬) নৈশ ইস্কুল স্থাপিত হল।

প্রাথমিক ইস্কুলের সংখ্যা ৩০০০; ছেলেদের জন্য ৬টি ও মেয়েদের জন্য ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছাত্রসংখ্যা ৪৪১৫০, ছাত্রী ৮৩২৮, শতকরা (ইস্কুলে যোগদান করার বয়সী ছেলেমেয়েদের) ১৫·৭ এবং ২·৬ ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকের পর তারা আর বিশেষ লেখাপড়া করে না। সরকার এতটা উৎসাহ চালও না বোধ হয়।

অন্যত্র নিম্নবর্ণীয় আর আদিবাসীর মধ্যে বিভেদ টানা হয় নি।

১৯০৭ থেকে ১৯১২ সালের ভারতের হিসাবে আদিবাসীর ছাত্রসংখ্যা ১,৫৯,২৪৪। বোম্বাইতে—১৮,৭৪০, বাংলায় ৫৩,০৩৬, মাদ্রাজে ৪,৬৩০। মধ্যপ্রদেশে ১৬,১৭১ (গোণ্ডদের)।

এই সময় বোম্বাইয়ের ভীলদের কাছ থেকে একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে। তারা চায় না তাদের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে ইস্কুল মাস্টার হোক। কারণ শিক্ষকের আয় বড় কম। ঐ আয়ে জীবন যাত্রা চলে না। সরকার টীকা জুড়ল যে, তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অবস্থা এমন তালো যে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের কাছে কিন্তু এ একটা ভাববার মতো কথা। শিক্ষকতা আদিবাসীরাও ঘৃণা করে! শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অন্ধ্রদের মুনো জাতির কাছেও নেই। ইংরেজি শিক্ষার পরিণামের এই সহজ ফরমুলা নতুন শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত এই ভদ্রলোক সমাজও তৈরী করতে পারে নি। আজ আমরা তাই বুঝি দুর্ভোগ ভুগছি।

আসামের মুসাই, খাসি আর জয়ন্তিয়ার সব ইস্কুলই মিশনারীদের। সরকারের কাছ থেকে তারা এককালীন সাহায্য পায়; বছরে প্রায় ১৮০০০ টাকা অনেক সময় মিশনারীরাই ইস্কুল পরিদর্শক নিয়োগ করে। মিশনারীরা হচ্ছে খাসিতে—ওয়েল্‌স ক্যালভিনিস্টিক মিশন ৫টি মিডল ইস্কুল, ৪২৮টি প্রাথমিক; ছাত্র ১৩০৪। একটি শিক্ষণ বিদ্যালয়, একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল, একটি হাই।

গারো পাহাড়ে—আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন; ১টি মিডল, ১১০টি প্রাথমিক, ১টি সরকারী শিক্ষণ বিদ্যালয়, ৪০টি সরকারী প্রাথমিক। মিশনের সাহায্য প্রায় ১২ হাজার টাকা।

নাগা পাহাড়ে—সরকারী ইস্কুলের সঙ্গে কিছু মিশনারীও আছে। পাঠ্যতালিকায় আছে ইংরেজি, আসাম-এর ভাষা, আর অঙ্কাদি। সাধারণ শিক্ষা এরা চায় না, এদের দাবী মিটাতে কোহিমাতে একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল খোলা হল।

লুসাই পাহাড়ে—ওয়েল্‌স প্রেসবিটেরিয়ান এবং ইংলিশ ব্যাপটিস্ট। উত্তর পাহাড়ে ওয়েল্‌স ক্যালভিনিস্টিক মিশনের ৪টি স্কুল। হাকলতে একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল খোলার কথা উঠেছে।

মিকির পাহাড়ে—মিশনরীদের ১২টি ইস্কুল।

এই সময়ে নিম্নবর্গের হিন্দুদের (Depressed class) শিক্ষার হিসাবে সমগ্র ভারতে ছাত্র সংখ্যা—৯, ১৭, ৬২১ ; মাদ্রাজেই সবচেয়ে বেশি ; তারপর বাংলাদেশে। মাদ্রাজে বিশেষ ইস্কুলের মধ্যে ২টি শিক্ষণ বিদ্যালয়, ৪৩৯টি ছাত্রাবাস-যুক্ত ইস্কুল। মিশনরীদের প্রাথমিক ইস্কুল যেমন বাড়ছে, তেমনি মাধ্যমিক উঠে যাচ্ছে। মাদ্রাজে ছাত্রসংখ্যা ১,০০,০০০, বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যা ৭৩, ৭৫১, পাঞ্জাবে চাষাদের জন্য ২৭টি ইস্কুল আছে তার মধ্যে ২৩টিই মিশনরীদের। মধ্য প্রদেশে ছাত্রসংখ্যা ১৬,২৩১

সেন্ট্রাল ডিভিসন থেকে জানানো হয়েছে যে, সাহিত্যশিক্ষা থেকে তারা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলের শিক্ষাই বেশি চায়।

এদের (আদিবাসীদের এবং অনুন্নতদের) শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিম্নরূপ ধার্য হল :

(১) বেতন মকুব, বৃত্তি এবং পুরস্কার ব্যবস্থা।
(২) বিশেষ ছাত্রাবাস থাকবে।
(৩) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলের ব্যবস্থা করা হবে।
(৪) বিশেষ শিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে।
(৫) আদিবাসীদের মাতৃভাষায় বই লেখা হবে।
(৬) বিশেষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা হবে।

এখানে দুটি কথা এসে পড়ছে। একটি পাহাড়িয়াদের মাতৃভাষা আর একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল।

প্রায় প্রথম থেকেই দেখা গেছে আদিবাসীরা তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, বাংলা হিন্দী বা আসামী পড়তে চায় না। কেউ বলে 'কথা' পড়ব, কেউ 'সাঁওতালী', কেউ 'অলাচি'। তারা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতেই পারে না। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে গ্রন্থ লিখবারও চেষ্টা চলল। মিশনরীরা এ বিষয়ে অগ্রণী। রোমান হরফে তারা সেই ভাষা লিখতে সুরু করে। উদ্দেশ্য যে খোল আনা সাধুই ছিল তা কিন্তু নয়। তা যে নয় তার একটা কারণ, ১৯৩৫।৩৬ এ আসামে মিশনরীদের বিরুদ্ধে সেখানকার আদিবাসীর তীব্র অসন্তোষ। তারা বলে, লেখাপড়া শেখা যদি তো ধর্ম বর্জন নয়, নয় কুলাচার বিসর্জন। সেইজন্য সেখানে সরকারী প্রচেষ্টা হল মিশনরীদের হাত থেকে কি করে আসামের আদিবাসীর শিক্ষাকে মুক্ত করা যায়। কাজেই তারা যে মিশনরীদের প্রতি খুব সদয় ছিল তা নয়। দ্বিতীয় কথা, উন্নত আঞ্চলিক ভাষা তারা শিখতে চায় না, এ যেমন বড় বড় করে লেখা হচ্ছে, তেমনি ইংরেজি ভাষার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া কি, তা লেখা হচ্ছে না। ইংরেজিটা থাকছেই। মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষা চলতে পারে না (তা সে ভাষা উন্নতই হোক আর অনুন্নতই হোক), এ কথা আমরা মানি। কিন্তু ইংরেজের উদ্দেশ্যটির মধ্যে কোথায় যেন দেশের ক্ষতিকর চিন্তা আছে সেই কথাই মনে হচ্ছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল সম্পর্কে চিন্তা প্রকৃতপক্ষে এসেছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের পর। কারিগরি শিক্ষার জন্য তখন তিনটি শ্রেণী করা হয়েছিল। টেকনলজি (যার মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পড়ে), কারিগরি (ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই), আর এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল। তার মধ্যে টেকনলজির সংখ্যা ইংরেজ বাড়াতে চায় না ; কারণ এই শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার দরকার, অর্থাৎ বৈদেশিক তথা বিলেতের ইস্কুল-গুলোর আয়ের কথা বলা হল। দ্বিতীয় ধরণের ইস্কুল সম-সম করে সারা হবে। অতএব তৃতীয় ধরণের ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক যত্র তত্র। এলাহাবাদ কনফারেন্সে ১৯১১ সালে এই নীতিই মেনে নেওয়া হল।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা ও যুবসেবা

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন দেশের তরুণ নাগরিকের স্বাধীন জীবন বিকাশের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার অভাব আছে। দেশের ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ প্রায়ই কাগজে দেখা যায়, এবং এ বিষয়ের সমাধানের চিন্তাও সরকারীভাবে হইতেছে। কিন্তু বেসরকারীভাবে অভিভাবকদের মধ্যে এ বিষয়ে তৎপরতা এখনও দেখা যাইতেছে না। আমার নিজের বিদ্যালয়ের জীবনের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। একটি মফঃস্বল শহরের হাইস্কুলে পড়িতাম। সেই শহরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে প্রতিসন্ধ্যায় ও রবিবারে প্রার্থনা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পঠন-পাঠন হইত। সেই শহরে যুবসেবার অন্য কোন সংস্থা ছিল না। আমরা একদল ছেলে নিয়মিত আশ্রমের পঠন-পাঠন ক্লাসে যোগ দিতাম। ইহার প্রভাবে আমাদের ছেলেদের একটি অবৈতনিক সমাজ-সেবা সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। শহরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য এলাকায় কোন বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে আমরা পালা করিয়া রোগীদের সেবা করিতাম। দরিদ্র পরিবারের জন্য ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতাম। এরূপ সেবার কাজ হইতে আমরা প্রচুর আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতাম। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের জীবনের বাহিরে এরূপ সমাজ-সেবা আমাদের অবসর বিনোদন করিত। আজও সে সকল কথা মনে হইলে আনন্দ হয়। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিস্তার প্রতিরোধ এইভাবে আমরা আয়ত্ত করিয়াছিলাম।

বিদ্যালয়ের জীবনের বাহিরে তরুণ-তরুণীদের অবসর বিনোদন ও সেবাব্যবস্থা দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বাস্তব-জীবন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ স্বাধীনতা তরুণ-তরুণীর অন্নই আছে এবং তাহাদের জীবন গঠনের বেসরকারী উদ্যোগ আয়োজন তেমন এখনও দেখা যাইতেছে না। সকল বিষয়েই আমরা সরকারী উদ্যোগের অপেক্ষায় থাকি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারকে গালি দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করি। এ দেশের সমাজগঠনমূলক কাজের নির্দেশ সরকারকেই দিতে হয়। ডেমক্রেটিক সমাজ গঠনের পক্ষে তাহা আদর্শ অবস্থা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের যুবসেবা ও তাহাদের অবসরকালীন কার্য-তৎপরতার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যুক্তরাজ্যে (U. K.) ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক যুবকদের অবসর যাপনের ব্যবস্থা করিবার বহু সংস্থা আছে। সে দেশের স্কাউট আন্দোলন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের দেশেও স্কাউট আন্দোলন বেশ প্রবল। তাহাড়া পল্লী ও শহরগুলিতে এমন বহুবিধ সংস্থা আছে যাহাদের উদ্দেশ্য স্থানীয় তরুণ-তরুণীর বিশেষ অভাব দূরীকরণ, অর্থাৎ কোন পল্লীতে বা শহরের কোন অঞ্চলে কোন সমস্যা দেখা দিলেই সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সংস্থা গড়িয়া উঠে, আবার সমস্যার সমাধান হইলেই সংস্থাও তুলিয়া দেওয়া হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা-প্রিয় যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের যুবসেবার এই উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিতে তাহারা তরুণতরুণীর স্বাধীন জীবন বিকাশে সহায়তা করে। অর্থনীতীর উপর কাজ করিতেছে, এমন সংস্কৃতি সেদেশে আছে। প্রধানতঃ তরুণও যুবকযুবতীর উপযুক্ত ভাবে অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে 'যুবসেবা' আন্দোলন সবৃদ্ধ ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের বেসরকারী উদ্যোগের ফলেই এই আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়া এখন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ যুক্তরাজ্যের শিক্ষাবিভাগ যুব-

দেবা সমিতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিভাগ (Ministry of Education) Youth Advisory Council নামক একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ ছিল—"যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য যুবসেবার মূলনীতি ও পদ্ধতি নির্ণয়।" পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এই রিপোর্টের প্রথম ও প্রধান কথা এই ছিল যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সকল অবস্থায় স্বীকার করিতে হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন কার্যে বাধ্য করা চলিবে না। স্বেচ্ছায় যে কোন তরুণ তরুণী যে কোন কাজ অবসর সময়ে শিখিতে বা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই সুযোগ দিতে হইবে। কমিটির মতে বাধ্যতামূলক কাজে আকর্ষণ আছে—যে আকর্ষণে অনিচ্ছুকও দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ফলে স্বাধীন ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না, এবং স্বাধীন শুভ বিচারশক্তি এই বয়সে বিকশিত না হইতে পারিলে ব্যক্তিস্বাধীনতারও কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করিলে সেই বয়সের উপযোগী বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষার ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থাও সরকারকেই করিতে হইবে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত এই ছিল যে—এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যে যে বিষয়ে উৎসাহী এবং অবকাশ সময়ে যাহা করিতে বা শিখিতে চায়, তাহা করার সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে।—"It is of the first importance that we should start from the young people themselves and their interest. It is essential to remember that young people are not alike. There are in fact wider differences of temperament and interest in the young people between the ages 14 and 18 than in younger childern or in older men and women. For these years therefore, the widest possible variety of interests must be provided. For we want tastes developed as fully as possible. We do not want them to be indistinguishable in their opinions and interests." মানুষের চারিত্রিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে আছে।

শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগের ফলে 'যুবসেবা' (youth service) দেশের সর্বত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনা সংস্থা মাত্রেরই "যুবসমিতি" (youth committe) আছে। দেশের বিস্তৃত অবৈতনিক যুব-সঙ্ঘের (voluntary youth organisation) সহায়তায় স্থানীয় যুব-সমিতি বিভিন্ন বিষয় শিখাইবার শিক্ষক, ঘরবাড়ী ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন তরুণতরুণী স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত যুবসমিতির সদস্য। রাজ্যের রাষ্ট্রকোষ হইতে এই সকল সংস্থা অর্থ সাহায্য পায় এবং ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ তরুণ তরুণীর অবসর কালের উপযোগী শিক্ষা ও বিনোদন ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ডেমক্রেটিক সমাজের মূলকথা ব্যক্তিস্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে তরুণতরুণীর জীবন বিকশিত করিবার সুযোগ সুবিধা চাই, এভাবে ডেমক্রেটিক সমাজের ভিত্তি দৃঢ় না করিলেই একনায়কত্বের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ডেনমার্কে এমন ব্যবস্থা আছে যে কমপক্ষে মাত্র পাঁচজন একসঙ্গে যে কোন বিষয় শিখিতে ইচ্ছুক হয়, তাহারা সেই বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক দাবী করিতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থাও সরকার হইতে করা হয়। ১৯৩৯ সালে ডেনমার্কে যুব-বিদ্যালয় কমিশন বসিয়াছিল। ইহার ফলে ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য 'যুব বিদ্যালয়'

স্থাপন করা আইনসিদ্ধ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ—"It was obvious that there was double purpose behind the move: a desire to help young unskilled workers in their struggle for a living and to make them feel that the community was not solely interested in skilled people; and in view of the fact that these young people spent practically all their time in the streets, there was a further desire to provide a meeting place for them where, on leaving the elementary school, they might preserve contact with the adult community and possibly find opportunities for good comaradeship and valuable use for their leisure" (Ref: "Scandinavian Adult Education", Chapter—Schools for young unskilled workers). প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার মূল সমস্যা আছে কিন্তু আজ ডেমক্রেটিক রাষ্ট্রমাত্রেই এ বিষয়ে অতি সচেতন। এ দেশের অভিভাবক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের চিন্তা না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল না হইবার উপায় উদ্ভাবন করা ও তাহাদের জীবনবিকাশে সহায়তা করা আজ আমাদের প্রধান বিবেচনার বস্তু হওয়া প্রয়োজন।

ছেলেবেলার কথা

সেনাম

বর্ণপরিচয়ের মান।

অক্ষর—শব্দ লিখন ও উচ্চারণ।

গুরুমশায় অতি বড়া মেজাজের—অল্পদিনেই অনেক কিছু শিখাইয়া দিতে পারেন বলিয়া নাম। ছাত্র মাত্র অক্ষরগুলি চিনিয়াছে, অমনি হুকুম হইল, বাবাকে একখানি চিঠি লেখ। ছাত্র লিখিয়া আনিল—

"স্বপয় চরণ নমসকরণ খরচপতর পঠবত পঠত ম পঠবত তত তত মরয়।"

শুধু যতটা সম্ভব, শব্দ গঠন করিয়াছে।

সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে সুরু করার পর, বর্ণ পরিচয় পরীক্ষার জন্য ছাত্রকে আদেশ হইল, 'বই থেকে পড়'। ছাত্র পড়িল—

'মহারাণী, রাণী, ভরাণী'—এইমাত্র পড়িয়া, তারপর ছাত্র বলিল 'দেরা না দেরা' ঠিক করিতে পারিতেছি না।

দেখা গেল যে বর্ণপরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় নাই।

বর্ণপরিচয়ের পরে শুদ্ধভাবে শব্দগঠন ও বিশ্লেষণ দেখা দরকার। তাই গুরুমশায় ক্লাসে ডিক্টেশন দিলেন। একটি ছাত্র লিখিল—

'নিত্যসা ফুতেনা দিয়াযা ঝিলেখা কেতাল'।

কথাগুলি কি হেঁয়ালীর মত বোধ হয় না? শুদ্ধভাবে এইরকম লেখা উচিত ছিল—

'নিত্য সাফ তেনা* দিয়া মাজিলে থাকে ভাল'।

আর একটি হেঁয়ালী কাগজে বাহির হইয়াছিল—'হবর্তাবা কহিপ্তাসো টজেগে নশকে ডুএ'।

উল্টাইয়া পড়িয়া গেলেই অর্থ বোঝা যায়।

কোন কথা ছাত্রের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের নানা রকম উপায় ছিল। প্রশ্ন হইত—

* তেনা অর্থ কাপড়ের টুকরা।

'মোগলের পূর্বে কোন জাতি ভারত শাসন করিত ?'.....পাঠান।

'শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দিলে কি হয় ?'...

'তিব্বতের রাজধানী কি রে ?'.....লাসা

'উল্টাইয়া পড়িলে কি হয় ?'

এই প্রসঙ্গে ইংরেজী অক্ষরের উচ্চারণের একটি উদাহরণ উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা গেল না। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল গৌরচন্দ্র ধর। ছাত্রদের খাতা শুদ্ধ করিয়া ইংরাজীতে স্বাক্ষর করিতেন, জি. ধর। ছাত্রেরা সবসময়েই অলক্ষিতে মাষ্টারকে বলিত, 'গিধর' সার। 'গিধর' অর্থ শিয়াল।

কোন মৌখিক পরীক্ষার ফল শুধু একটি শব্দ উচ্চারণে কিরূপে নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত কৌতুকজনক।

হাবা নামক একটি ছেলে তাহার সহপাঠিদের ও মাষ্টারের অতিশয় প্রিয় ছিল। সে সরল প্রকৃতির ভালমানুষ বলিয়া তাহাকে সকলেই ভালবাসিত। তাহারা সকলেই হাবার (প্রমোশন) পরীক্ষায় সাফল্য কামনা করিতেছিল। কিন্তু সে লিখিত পরীক্ষায় ফেল করিয়া বসিল। প্রমোশন পাইতে তাহাকে মৌখিক পরীক্ষা ভাল ভাবে পাশ করিতে হইবে। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে নিয়মিত কার্যকরী, স্থষ্ট, কিছুর নাম করিতে বলিলেন। হাবা কোনদিন এরূপ কিছু শোনে নাই। মাষ্টার তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার চারদিকে কি দেখিতেছ ?" হাবা বলিল। "কেন, টেবিল, চেয়ার, চক, ইট, বালু (স্কুল বেরাময় হইতেছিল), সবই দেখিতেছি" আরও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের উত্তর পছন্দ না হওয়াতে, তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে ইহাদের জীবন নাই। অর্থাৎ ইহারা জন্মিয়া, নিজে নিজে বড় হয় না, অথবা ইহাদের সময়ে কোন পরিবর্তন হয় না। "যাহা জন্মে, বা বড় হয়, এমন কিছু জান কি ?" মাষ্টার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাবা বলিল—"কেন, এই গোলাপ ফুল, ঐ মাঠে গাছ, ফুলের দালান, শুক্লপক্ষের চাঁদ" আরও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাহাকে বাধা দিলেন। তিনি চান এমন কিছু যাহা বাড়ে এবং স্বেচ্ছায় চলাচল করে। এবার কোনই উত্তর আসিল না। মাষ্টার বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হাবার বুদ্ধি আছে কিনা, এবং ক্লাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এখানে কার বুদ্ধি আছে ? সকল ছাত্রই দাঁড়াইয়া উঠিল। মাষ্টার হাঁকিলেন—"তোমরা বস।" তবুও ধৈর্য সহকারে হাবাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "মানুষ ব্যতিরেকে আর কে বুদ্ধির পরিচয় দেয় ?" হাবা নিরুত্তর। ছাত্রেরা তাহার সাহায্যার্থে, চুপি চুপি, "মিউ মিউ", "ঘেউ ঘেউ", "চিঁহিঁহিঁ", "হাম্বা হাম্বা" ইত্যাদি আওয়াজ করিতে লাগিল। তবুও হাবার কোন সাড়া নাই। মাষ্টার একবার শেষ চেষ্টায়, হাবাকে মাথা খাটাইতে বলিলেন। হাবা চিন্তাই করিতে লাগিল এবং হঠাৎ বলিয়া উঠিল "জন্তু"। মাষ্টার বলিলেন "উত্তম", মৌখিকের জন্য পূর্ণ নম্বর" এবং প্রমোশন দিয়া দিলেন।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

মা বিদ্যা কল্যাণকৃৎ কস্যচিদ্ দুর্গতির্ভবতু পুত্রক

১৮শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬৭ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

শ্রাবণের বর্ষণ

এবার শ্রাবণের বর্ষণ প্রায় সর্বত্র প্রচুর হইয়াছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবেই, তবু ঠিক এইবার মনে হয় যেন আমরা প্রচুর পাইয়াছি। 'শ্রাবণের বারিধারা প্রায়' প্রবাদবাক্যের মত বলিবার কথায় দাঁড়াইয়াছে। রাজপুতবীর বাদলের দেহে যখন অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল তখন কবি তাহার সঙ্গত উপমা পাইলেন শ্রাবণের বারিধারায়। মোট কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে, অন্য বৎসরের তুলনায় কি দাঁড়াইয়াছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি কিরূপ হইয়াছে, এসব কথা অবশ্য আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা অনায়াসে বলিতে পারিবেন। কিন্তু গতবারের অতিবৃষ্টি আমাদিগকে ইতিমধ্যেই ভীত করিয়া তুলিয়াছে। এবারও কি গতবারের মত বন্যা আসিয়া কৃষকের পরিশ্রমের ফল ও গৃহস্থের ঘরবাড়ি সমস্তই তছনছ করিয়া ফেলিবে?

২২শে শ্রাবণ

বাঙ্গালীর মনে ২২ শ্রাবণ তারিখের মত এখনও তুলনা নাই। এই দিনে সে রবীন্দ্রনাথকে হারাইয়াছিল। যত দিন যায় সেই ক্ষতির অনুভূতি ততই বাড়িতে থাকে, যদি না হইবার চাপে জাতি সেই অনুভূতির শক্তিও হারাইয়া ফেলে। আমাদের সকল সংকটেই তিনি তো আগাইয়া আসিয়া হাল ধরিয়াছেন, আইবাণ করিয়াছেন, সকল সমস্যাই তিনি গভীর চিন্তা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া সমাধানের পথও খুলিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে যে তাঁহার মনীষার কখনও মৃত্যু নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহার জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ পবিত্রই থাকিবে, কিন্তু তবু ২২শে শ্রাবণও ভুলিবার নয়।

ভেজেশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী ভেজেশচন্দ্রের পরলোক গমনের কথা স্মরণ করি। এই শ্রাবণে তিনিও গেলেন; সহকর্মী—তা বয়সের, শক্তির, কর্মধারার যতই পার্থক্য থাক। তিনি আসিয়াছিলেন তরুণ বয়সে, থাকিতেই আসিয়াছিলেন, ক্রমে শান্তি-নিকেতনের পাঠভবনে কিছু পড়াইবার ভারও

লইলেন। শান্ত নীরবকর্মী ভেঙেশচন্দ্র সারাজীবন নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, নীরবেই তিনি প্রস্থান করিলেন। তাঁহার 'তালধ্বজ' সতর্ক প্রহরী রূপে শান্তিনিকেতনের মন্দির ও উত্তরায়ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। সেই তালধ্বজ এখন শূন্য। সেবাব্রতীর ব্রত উদ্‌যাপন হইয়াছে।

সু-বাবু

শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীর একটি সেবাকর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রজীবনীর সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রভাতকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার ও সদাজাগ্রত সরস প্রাণ সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনিও শিক্ষক ছিলেন, জীবনে ও আচরণে। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

সু-বাবুর নাম সার্থক ছিল: তিনি সকলের সুহৃদ ছিলেন। শান্তিনিকেতনের পল্লী তাঁহার শূন্যস্থান কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে?

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

৮৭ বৎসর বয়সে ইন্দিরা দেবী শান্তিনিকেতন-বাসীদের ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা, প্রমথবাবুর সহধর্মিণী—কিন্তু স্বীয় প্রতিভায়, কর্ম-কুশলতায়, শক্তির তারুণ্যে সতই সমুজ্জ্বল। সঙ্গীতে সাহিত্যে শিক্ষায় সংগঠনে তাঁহার প্রতিভা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। বর্ষের পরিমাপ তাঁহার জন্য ছিল না। পল্লীবাসী সকলের খোঁজ খবর লওয়া, যাহার জন্য যতটুকু পারেন ততটুকু করা, বয়সে প্রবীণ হইয়াও নবীনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, বালা ও কৈশোরের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—এমন আর কোথায় দেখা যাইবে? শিক্ষার জন্য তিনি কিছু লেখা নিজের মুক্তার লিপিতে লিখিয়াও ছিলেন, এবং একথাও বলিয়াছিলেন বটে যে এই বয়সে কি আর কেহ নূতন করিয়া শিখিতে পারে! তথাপি তাঁহার লেখনীর বিরাম ছিল না। তাঁহার উৎসাহে শান্তি-নিকেতনে যে মহিলাসমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার শক্তি এখন তাঁহার সঙ্গে অনেকখানি চলিয়া গেল। যজনারীর প্রতি তাঁহার উপদেশ স্মরণীয়—"সেই মধ্যপথ ধরে যাও, যেখানে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী একত্র মিলিত হয়েছে, সেই পবিত্র সংগমে মুক্তি স্নান করে নবকলেবর নবশক্তি ধারণ কর। সেই দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, সেই কমলা দুঃখহারিণী, সেই বাণী বিদ্যাদায়িনীর ত্রিমূর্তি একত্র সমাবেশ কর, সাধনা কর, অবশ্য সিদ্ধিলাভ হবে।"

আসামে ভাষা বিভীষিকা

আসামের ভাষা বিভীষিকার উল্লেখ এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ে। আমরা যে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব বোধ করি এবং আমাদের ছাত্রেরা যে সংস্কৃতির ধারক হইবে বলিয়া আশা করি, সেই সংস্কৃতির বা সভ্যতার সংকট সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় দেখা গিয়াছে। লোকে বাংলা ভাষা বলে বলিয়া যে তাহার বাড়িঘর পোড়াইতে হইবে, সম্পত্তি নষ্ট করিতে হইবে, এবং নানাপ্রকার অকথ্য অত্যাচার করিতে হইবে, কোনও সভ্য বা সংস্কৃতিবান মনুষ্য-সমাজে তাহা দেখা যায় নাই—ধর্মের জন্য উন্মত্ততা ইতিহাসে বারবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু ভাষাগত উন্মত্ততার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। আমাদের দুঃখ, আমাদের ছাত্রেরাও এই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন, এমন কি অগ্রণী ছিলেন বলিয়াও শোনা যাইতেছে। ইহার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ যাহাদের হাতে সেই ছাত্রদের মধ্যেই যদি এরূপ দুষ্কৃতকারী থাকে, তবে যাহাতে সেই দুষ্কৃতের বীজ সমূলে নষ্ট হয় সেইমত প্রতিবিধান করা উচিত। শুধু Forgive and Forget বলিলে চলিবে না—

যতই সহানুভূতি ও প্রীতি থাকুক, দোষত্রুটি ভুলিতে পারা উচিতই নয়, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকিতো তো হইবে, এবং দোষীকে দণ্ড দিতে না পারিলেও দোষকে ক্ষমা করা কখনই উচিত নয়।

কিন্তু কেন? আমাদের ছাত্রসমাজের কিরূপে এই অনুদার, অমানুষ মনোবৃত্তি সম্ভব হয়? কেন আমাদের নেতারা সর্বকর্মে ও সব সুকর্মে ছাত্র-সমাজকে এমনি করিয়া টানেন, ইহাই আজ বার বার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে।

শ্রীঅরবিন্দ ও আন্তরাত্মিক শিক্ষা

শ্রীমতী বকুলমালা সেন

শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণতঃ যে জাতীয় শিক্ষার কথা বুঝে থাকি, সেই ধারণা-কল্পনার মধ্যে আন্তরাত্মিক শিক্ষার কোন স্থান নাই। অথচ শিক্ষার এই ক্ষেত্রে এসে পৌঁছানোর জন্যই পূর্ববর্তী স্তরের শিক্ষাগুলি গ্রহণীয়, এই সহজ কথাটি আমরা ভুলে যাই অথবা চিন্তা করি না। ইতিপূর্বে শ্রীঅরবিন্দের দৈহিক, প্রাণিক ও মানসিক শিক্ষার নীতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। আজ তার পরবর্তী স্তরের যে শিক্ষা, আন্তরাত্মিক শিক্ষা—সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার দুঃসাহস মনে জেগেছে। দুঃসাহস কথাটি যে অতি বিনয়ের বশবর্তী হয়ে ব্যবহার করছি না, সেকথা প্রতিপন্ন করার জন্য বেশী বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দুঃসাহস দুদিক দিয়ে—প্রথমতঃ এযাবৎকাল বিরচিত কোন শিক্ষানীতিতে যার স্থান হয় নাই, শুধু তাই নয়, বর্তমানের বহির্মুখী জগতে অন্তর্লোকের কথা যখন অবাস্তবের পর্যায়ে প'ড়ে মুমূর্ষু, সেই বিশেষ ক্ষণে আন্তরাত্মিক শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা—দুঃসাহস নিঃসন্দেহ। পাঠকজনের দিক থেকে আশঙ্কা, তাঁরা হয় তো শ্লেষাত্মক বাক্যে বলতে পারেন, রঘুরাজি অহরীদের সিন্ধুকে বন্দী ছিল, সেই তো ছিল ভাল। সাবোতাজের পাত্রে পরিবেশনের অপচেষ্টা কেন? দ্বিতীয়তঃ আন্তরাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে সেই শিক্ষার নিজের অন্ততঃ কিছু পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে চাপরাশ পাওয়ার কথা বলেছিলেন, সে অবশ্য খুব বড় কথা, কিন্তু আন্তরাত্মিক শিক্ষার প্রথম পরিক্ষেপও যার হয় নাই, সে যদি সে সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা করে, তাকে বিনা দ্বিধায় অতিবড় দুঃসাহস বলা চলে। আমি এই উভয় প্রকার দুঃসাহসের জন্যই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

বিষয়টিকে শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত করে প্রকাশ করা যে শক্ত, তা প্রচেষ্টার আরম্ভেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করছি। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে সত্তার যে সকল অংশের শিক্ষার কথা আলোচনা করেছি—দেহ, প্রাণ ও মন—এগুলি মানবীয় বৃত্তিসমূহের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কতকাংশে পরিস্ফুট, তাই সে সম্বন্ধে আলোচনাও সহজ। এই সকল শিক্ষা যে সব শিশুর পক্ষেই প্রয়োজন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ না ঘটবারই সম্ভাবনা। কিন্তু প্রকৃত ও সামগ্রিক শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হ'তে হলে এখানে এসে থেমে থাকা চলে না। কেন, সে কথাই আগে একটু বলে নেওয়া দরকার।

মানুষ যে পূর্ণ নয়, তার যে আছে একটা বিপুল

সম্ভাবনাবোধ ভবিষ্যৎ, এ বোধ কম বেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্ফুট বা অস্ফুট রূপে জেগে আছে। এই বোধ আছে বলেই মানুষ কাজ করে। কাজে সফলতা আসে, বিফলতাও আসে। কখনও সমুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের সুযোগ যে ঘটে না, তা নয়, আবার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলার সঙ্গে ধূলা হয়েও মিশে যেতে হয় জীবনের চলার পথে কতবার। সব রকম অভিজ্ঞতাই মানুষের জীবনে বার বার আসে যায়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই একটা জিনিস থাকে তার সামনে ধ্রুব হয়ে—এই শেষ নয়। আরও আছে, আছে সমুচ্চ শৃঙ্গের পরেও উচ্চতর শৃঙ্গ, আছে ধূলিকণার ও সাগর-তলের সম্ভাবনা। এই অবিচলিত প্রত্যয় স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে মানব-চরিত্রের মূল-দেশে রস সিঞ্চন করে বলেই মানুষ কাজ করে।

মানুষের অপূর্ণতার বোধই তাকে পূর্ণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এমনি করে অবিরাম প্রেরণা দিচ্ছে। মূলতঃ এই প্রেরণাতেই মানুষ চলেছে—কখনও সচেতন ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে, কখনও অজ্ঞাতসারে অবচেতনের অন্তরাল থেকে চলেছে অন্ধের মত। সে পড়ছে হয়তো অন্ধকারে, হয়তো বা যে পথ লক্ষ্যের অভিমুখী নয়, সেই পথের সোনক ধাঁধাতেই ঘুরে মরছে চিরকাল। এই অন্ধতা ঘুচাবার জন্য—মানুষের এই যে স্বাভাবিক প্রেরণা, পূর্ণকে জানবার, পূর্ণত্ব পাওয়ার এই যে অভীপ্সা, যা সাধারণতঃ প্রকৃতির আবরণে অবগুণ্ঠিত থাকে, তাকে জাগিয়ে তুলে সত্য পথের সন্ধান দেওয়াই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য। দেহ-মন-প্রাণের শিক্ষায় এ অভীপ্সা যখন পূর্ণ তেজে জেগে ওঠে, তখনই তো প্রয়োজন হয় সত্য পথের দিকে নির্ভুল অঙ্গুলি নির্দেশের। আন্তরাত্মিক শিক্ষায় এই নির্দেশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে অবিকম্প দীপশিখার আলোয়। আমরা জীবনের কোন অর্থ যদি খুঁজে নিতে চাই, তবে এ আলোকে অবহেলা করতে পারি না। আন্তরাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলে আমাদের জীবনকে স্রোতের ফুলে পরিণত করা হবে। এই জন্যই অরবিন্দের শিক্ষা-নীতিতে আন্তরাত্মিক শিক্ষা অপরিহার্য।

একটা বিশালতর উচ্চতর জীবনের অভীপ্সা। তাকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করাই আন্তরাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। সংগুপ্ত যে চেতনাকে অবলম্বন করে এই অভীপ্সা স্ফূর্তিলাভ করে, সেই চেতনাকে সর্বাগ্রে খুঁজে নিতে হবে—তারপর হবে চলার সুরু। মানুষের দেহ মন প্রাণ যা জানে না, এই চেতনা তা জানে, দেহ-মন-প্রাণে অবিরাম যে সব ভুল করে চলেছে, এই চেতনা সে ভুল সংশোধন করে। অনেক সময় শিশুদের মধ্যে এই চেতনার কিছুটা প্রকাশ দেখা যায়; কিন্তু মন-প্রাণ দ্বারা প্রভাবিত জগতে তা অস্বাভাবিক বোধ হয় বলে প্রায়ই পিতা-মাতার কাছে সে চেতনা কোন মর্যাদা পায় না। তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁরা অনেক সময় তাকে দমিত করার দিকেই বিশেষ রূপে নজর দেন।

মন প্রাণ ও দেহের শিক্ষায় বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ অনিবার্য। এই শিক্ষাতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তবে এ শিক্ষা দিতে হবে এমন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যেন বাহ্য বস্তুর মধ্যেই শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ করে না রাখে। লক্ষ্য রাখতে হবে সে শিক্ষা যেন তাকে আত্মসচেতন হওয়ার পথে নিয়ে যায়। এই ভাবেই সাধিত হবে আন্তরাত্মিক শিক্ষার প্রস্তুতি। প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হলে এই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের মুখে দাঁড়িয়ে তখন সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে লক্ষ্য স্থির করা। কি করতে আমি এসেছি, কোন পথে কোন কাজে সার্থক হবে আমার জীবন? সে সার্থকতার মূল্য আমার ব্যক্তিগত জীবনেই বা কতটুকু এবং বিপুল বিশ্বেই বা তার স্থান কোথায়? কতটুকু তার স্থায়িত্ব? অনন্তের মধ্যে সান্তের আত্মসমর্পণ—কি সে বস্তু, কি তার ফল? সকল প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বিচার করে,

আপনার প্রকৃতির মূল ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেছে নিতে হবে লক্ষ্য। এই লক্ষ্য দেশ কাল পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। এই লক্ষ্যকে কেউ ভগবান বলে গ্রহণ করবে অথবা অপর কোন দার্শনিক ধারণানুযায়ী কিছু স্থির করে নেবে, তা গৌণ বস্তু। কারণ এ সকল মানসিক ধারণাকে আন্তরাত্মিক শিক্ষায় অতিক্রম করে যেতে হবে। উপলব্ধিই আসল জিনিস, উপলব্ধিই সত্যকার ভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায়। সেখানে দেশ কাল পরিবেশ পার্থক্যে কোন বিভিন্নতাই থাকে না।

কিন্তু যে অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের আবরণ উন্মোচনের জন্য শিক্ষার কথা আমরা আলোচনা করবো, সেটি কি বস্তু আগে জানা দরকার। অন্য কথায় বলতে গেলে সৃষ্টির আদি উৎস থেকে যা কিছু ভাগবত লীলায় দেশকালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে, ব্যষ্টি-নিয়মের আইন মেনে নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে গড়ে উঠেছে—তারই নাম অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ। এই চৈত্যপুরুষকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির গঠন।

আমাদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যে চৈত্য-পুরুষ থাকে আবরণের অন্তরালে। অপর মানুষ বা বাহিরের অবস্থার উপর তার ক্রিয়াবলী প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে পারে না। অবগুণ্ঠিত চৈত্যপুরুষের কার্যাবলী প্রকাশ্য জগতে যখন এসে পৌঁছায় তার সেই বিকৃত রূপ থেকে সত্যবস্তুর ধারণা করা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় আমাদের একমাত্র চৈত্যপুরুষের মাধ্যমেই হতে পারে। যাঁরা এর কার্যাবলীর ধারা ও অর্থ বুঝতে পারেন, তাঁদের চলার পথে ভুল কখনই হয় না। তাঁরা নিজেদের অদৃষ্ট নিজেরা গড়ে নিতে পারেন। এই অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের ক্রিয়াবলীর অর্থ নির্ভুল রূপে বুঝতে পারার শিক্ষাই আন্তরাত্মিক শিক্ষা।

এ শিক্ষা গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ ব্যক্তিগত সত্তার —দৃঢ় এবং অবিচলিত। এযাবৎকাল শিক্ষানীতিতে চৈত্যপুরুষ আবিষ্কারের কোন স্থান ছিল না। সুতরাং এ পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক সর্বত্রই যে পাওয়া যাবে, সে সম্ভাবনা কম। তেমন লোকের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ যারা পেয়েছে, তাদের পক্ষে পথ অনেকাংশে সুগম হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অপর সকলকে নিজের অদম্য ইচ্ছা ও অপরাজেয় অধ্যবসায়কে পাথেয় করেই পথ চলতে হবে।

যারা এই শিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের এবার খোঁজার পালা সুরু হবে। খুঁজতে হবে নিজের অভ্যন্তরে সেই বস্তু যা কোন অবস্থার অধীন নয়, দেশ-কাল যার ব্যতিক্রম ঘটায় না, কোন ঘটনার প্রভাবে যা প্রভাবান্বিত হয় না। তাকে খুঁজে পেলে বোধ হবে একটা অনন্তের শাশ্বতের বিশালত্বের উপলব্ধি। যাঁরা এ পথে আগে চলে গেছেন, তাঁদের কারো সহায়তা পেলে ভাল, না পেলেও চলা যাবে না তা নয়। আমাদের আগ্রহ যদি হয় আন্তরিক, আস্পৃহা যদি হয় অনন্ত, আমাদের নিষ্ঠা যদি থাকে অবিচলিত, তবে তার আলোতেই পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

একেবারে সত্তার কেন্দ্রে চলে যাওয়া। সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে। সেখানে পৌঁছে নিজেকে পূর্ণভাবে জেনে নিয়ে তখন আবার বাইরের দিকে আসা চলে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে। তখন ব্যষ্টির গণ্ডী ভেঙ্গে গেছে, অতিক্রান্ত হওয়া গেছে সব সীমার সঙ্কীর্ণতা। তখন আর কেউ পর নয়, সবার সুখেই সুখ, সবার দুঃখেই দুঃখ। তখন সকলের সকল ভাব অন্তরে নির্ভুল স্পন্দনে অনুভূত হবে। মানুষ, পশু, পাখী, গাছপালা, সকলের ভিতর যে চেতনা ক্রিয়াবান, শিক্ষার সার্থকতায় নিয়ে আসবে তার উপলব্ধি। তখন অন্তঃপুরুষ আর অবগুণ্ঠিত থাকবে না, সকল আবরণ উন্মোচন করে আমাদের সমগ্র সত্তায়

সামনে এসে দাঁড়াবে কর্ণধারক্রপে। তখন সার্থক-কাম শিক্ষার্থীর জগতের রূপ যাবে বদলে, সকল আস্বাদ, সকল উপলব্ধির ঘটবে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সার্থকতার এ হলো একটি মাত্র দিক। আন্তরাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে, তার সিদ্ধির এটুকুই পূর্ণ পরিচয় নয়। তার প্রভাব ফল আসবে ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যরূপে—সেদিন অহমিকার পঙ্কী যাবে চূর্ণ হয়ে, কোন দুর্বলতা, কোন অক্ষমতা, কোন সঙ্কীর্ণতা সেদিন সামনে প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

পথটি যে সোজা নয় তা অনুমানেই বোঝা যায়। চেনা পথও নয়। প্রতি পদক্ষেপে আবিষ্কার করতে হবে পরবর্তী পদস্থাপনের স্থান। তা সত্ত্বেও গুটিকয়েক উপদেশ আমরা যাত্রাকালে ঝোলায় ভরে নিতে পারি, চলার পথে দিক্‌ভ্রান্তি ঘটে যদি, ঘনিই অন্ধকার ছেয়ে আসে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে, তখন হয়তো এগুলি প্রদীপশিখার মত পথের নির্দেশ দেবে।

শিক্ষার্থীকে—অথবা এখন থেকে আমরা শিক্ষার্থীকে পথিক বলেও অভিহিত করতে পারি—এ পথের পথিককে—সকল রকম আরাম, তৃপ্তি, অথবা ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। অবিমিশ্র, সর্ব অবস্থায় অনবনমিত দৃঢ় সঙ্কল্প রাখতে হবে এগিয়ে যাওয়ার। অগ্রসর হতে হবে আনন্দের সঙ্গে, কিন্তু আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়।

পথে আছে অনেক বাধা—বাহিরের এবং ভিতরের। সে বাধা যতই দুরতিক্রমণীয় মনে হোক না, কিছুতেই বিচলিত হবে না, উত্তেজিত হবে না, সর্ব অবস্থায় পূর্ণ শান্তি থাকবে অপ্রতিহত। সর্বদা সজাগ উন্মুখ থাকতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপের নির্ভুল স্থানটি আবিষ্কার করার জন্য। কোন ঘটনায় বা বস্তুর বাহিরের রূপ দেখে তাকে বিচার করার অভ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। অপরের স্বভাব বা ব্যবহার যেমনই থাক, তা নিয়ে কোন অভিযোগ বা অনুযোগ মনে জেগে উঠতে দেবে না। যখন যে কাজেই লিপ্ত থাক না কেন, সম্মুখে থাকবে প্রোজ্জ্বল হয়ে তোমার লক্ষ্য। এ পথের পথিককে কোন ঘটনা বা বস্তুকে ছোট অথবা বড় বলে ভাবলে চলবে না। সব কিছুকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে, কারণ সব কিছুই তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথের সহায় হতে পারে, আবার বাধাও হতে পারে।

তুমি যদি এই পথের পথিক হয়ে থাক, তোমার প্রচেষ্টা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজের ভিতর দিয়ে চলতে পারে। খাওয়া, ঘুমানো প্রভৃতি চিরাভ্যস্ত কাজগুলিও এর থেকে বাদ পড়বে না। খাদ্য গ্রহণ করার আগে তুমি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে পার যেন এই গৃহীত খাদ্য তোমার দেহকে সুদৃঢ় করে, এনে দেয় সেই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় যা লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ সুগম করবে। নিদ্রার আগে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে পার—এ নিদ্রা এনে দেবে তোমার সাধনার দিদ্ধিলাভের জন্য অপরিমিত বল, সব ক্লান্তি দূর করে এনে দেবে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্থিরতা। যে কোন কাজ তা যত তুচ্ছই হোক না, অথবা যদি কোন বৃহৎ কর্মই হয়, তার আরম্ভের পূর্বে নিবিষ্ট মনে চিন্তা কর যেন এ কাজ তোমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি না করে সহায় হতে পারে। কথা বলার আগে একটু নিবিষ্ট হও, এমন কথা ব'লো না যা এই সাধনার পথের সহায় নয়। অন্তত পক্ষে পথ চলায় বাধা সৃষ্টি করে যে সব কথা—যে আলোচনা—তা বর্জন করতে হবে। এমনি করেই প্রতি মুহূর্তে অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে চলার কথা, লক্ষ্যের কথা। আর সবকিছুই থাকবে নেপথ্যে।

এমনি করে চলতে চলতে একদিন দেখতে পাওয়া যাবে তন্দ্রী ভিত্তেছে এক জ্যোতির্লোকে। পথিক তার যাত্রাপথের শেষ সীমানায় এসে উপলব্ধি করবে তার স্বরূপ। উপলব্ধি করবে

শাশ্বত সে, পরিবর্তন হয় শুধু বাহিরে। প্রকৃতি কতকগুলো বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল, তারই ভারে চলছিল সে এতদিন শ্লথ হয়ে। এখন সে বোঝা থেকে সে মুক্ত হয়েছে; এখন আর কারো প্রয়োচনায় নয়, এখন থেকে সে নিজেই নিজেকে চালাবে।

এমনি করেই শিক্ষার্থী একদিন আন্তরাত্মিক শিক্ষার শেষ ধাপে এসে পৌঁছে যাবে। দেহের সকল রকম আসক্তি থেকে সেদিন ঘটবে মুক্তি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পর আছে দীর্ঘ পথ, ঊর্ধ্বমুখী সোপানশ্রেণীর অগণিত স্তর। তারই পাদদেশে এবার শিক্ষার্থী এসে পৌঁছালো! এই সোপানশ্রেণী অতিক্রমণের জন্য চাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

কিন্তু সে শিক্ষার কথা আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে, তবে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষানীতির পঞ্চম ও সর্বশেষ অংশের আলোচনা বারান্তরে করা যেতে পারে।

আন্তরাত্মিক শিক্ষার এ আলোচনা অনিবার্য কারণেই ত্রুটিপূর্ণ না হয়ে পারে না। তবু শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষানীতিকে কেন সামগ্রিক শিক্ষা বলা হয়, এ সম্বন্ধে সাধারণের জিজ্ঞাসার তৃপ্তি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। মহৎ কর্ম সাধনের জন্য যে প্রচেষ্টা, তাও মহৎ—যতই তা অক্ষম হোক না, এই মহাজন-বাক্যই আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের একমাত্র সম্বল।

— ——

ভারতের আদিবাসী ও অনুন্নতদের শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় সরকারী রিপোর্টে বলা হচ্ছে। আমরা এই অঞ্চল অধিকার করেছি, তার আগে আসামের নাগা এবং খাসিদের জন্য শিলং এবং কোহিমাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল খোলা হয়েছে। ভালো ফল দিয়েছে। হাফলঙেও খোলার চেষ্টা চলছে। অন্যত্রও খোলার দরকার। লুসাই পাহাড়ের একজন বিশেষজ্ঞের ধারণা, "আমার আশা যে, লুসাইতে আমাদের শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্বাহ করাতে অনুপযুক্ত হবে না। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন মোটের উপর কৃষিকার্য। ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে যদি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া যায় তবে খুব ভালো হয়। আমি এখানে বহুদিন আছি, লুসাইদের পাহাড়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানি। যখন থেকে তাদের কি জীবনযাত্রা ছিল তা আমি দেখেছি। আবার তাই দুঃখ হয় ভেবে যে, আমাদের শিক্ষার একটি কুফল হচ্ছে, যেখন অন্যত্র হয়েছে, তারা তাদের নিজেদের কাজকর্মকে ঘৃণা করতে শিখছে।"

এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি কে জানিনা, কিন্তু তাঁর উক্তি বা মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আর সরকার এই উক্তি মেনে নিয়ে কি করছেন? 'অন্য প্রদেশে শুনেছি প্রচেষ্টা চলছে, পাহাড়িয়াদের বয়নবিদ্যা শেখানোর চেষ্টা চলছে, উন্নতি ধরণের বয়নবিদ্যার পাঠ দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলাতে সম্বলপুরে তাঁতে শিক্ষার ঘাঁটি নির্মাণ করা হল।

একটা খবর এই, একজন গোণ্ড দম্বলপুরের শিক্ষা শিবিরে, তারপর শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে হুগলীর একটি কাপড়ের কলে কাজ করছে। এই কলের মালিকের কথা শুনে বহু গোণ্ড প্রস্তুত, তারাও এখন এই শিক্ষা পেতে চায়। বাংলাদেশের সারা জেলায় ৩টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুল আছে তোষদের জন্য। এখানে তারা ঝুড়ি বানাতে শিখছে, বাঁশের কাজ করছে, বেতের কাজ করছে। রাঁচিতেও মুণ্ডা আর ওরাওঁদের জন্য এমনি ইস্কুল আছে।'

গ্রামের কোন এক কারিগরিকে, বা যাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের জীবিকার জন্য কোন এক বৃত্তিকে, কেন্দ্র করে ইস্কুলগুলি পরিচালিত। ঠিক কেন্দ্র করে নয়, সেইটি একমাত্র শিক্ষণ। মিশনরীরা এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে, কারণ, তাদের আশ্রয়ের অনাথদের কিছু জীবিকার্জনের শিক্ষা দিতে হবে। তারা এখানে সেখানে লেস-তৈরী করতে, সেলাইয়ের কাজ করতে। মাদ্রাজের ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজ মন্তব্য করেছেন (১৯১২ সালে) 'বর্তমান কালের কারিগরি নৈপুণ্য অর্থ বৃত্তিকরী কাজ ছাড়া আরও কিছু ; সময় এবং বস্তুকে এমনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন, যাতে বাণিজ্য লাভজনক হয়, সেগুলি কিন্তুর উপযোগী হয়, আর সে শিক্ষা এমন প্রতিষ্ঠানেই হতে পারে যেখানে প্রকৃত উৎপন্ন দ্রব্য লাভের ব্যবসায় হিসাবে প্রস্তুত করা হয়। কাজেই এদের এই শিক্ষায় কেবল কতকগুলি অপরিণত গোষ্ঠী তৈরী হয়, যাদের সঙ্গে প্রকৃত শিল্প-কারখানার কোন পরিচয়ই ঘটে না।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে নয়া-কারখানা-সম্মত শিক্ষা এ নয়। এই সব শিক্ষা কেবল অকেজো নয়, যুগধর্মবিরোধীও বটে। যে-শিক্ষা আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে দিলে উপকার হ'ত, সে শিক্ষা কালকে ডিঙিয়ে সেই কারিগরদের বিধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছে শতাব্দীতে চলতে পারে না। মিশনরীরা ভুল করে নি। তারা নিরুপায় হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছিল। একদিকে মিশনরীর বিরুদ্ধে এই নতুন খ্রীষ্টানেরা দাঁড়াচ্ছে, আর একদিকে বাধ্য বা বশংবদেরা রুজি-রোজগার চাইছে। মিশনরীদের বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে তারা গেছে অর্থনৈতিক কারণেই। সেই অর্থনৈতিক তালিবাতি না করলে মিশনরীদের টিকে থাকা অসম্ভব। কাজেই এই দুর্বিপাক।

এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলের স্বভাবের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার অনেকটা মিল দেখা যায়। মিল ঐ আকৃতিতে কিছু থাকতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোনও মিলই নেই, বরং ইংরেজ সরকারের স্তরের কথা। তাই এ বিপ্লবাত্মক। গান্ধী নিজে এই শিক্ষাকে বিপজ্জনক এবং বৈপ্লবিক বলে অভিহিত করেছিলেন। যদি ঐ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলধর্মী শিক্ষাই বুনিয়াদির হত, তবে তিনি একথা বলতেন না। বুনিয়াদির প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের সমগ্র সমাজের সামগ্রিক উন্নতি করে নতুন সমাজ গঠন। পুরনো সমাজকে পুনরায় স্বস্থানে স্থাপিত করা নয়। এই সমাজকে ইংরেজ নানাভাবে ভেঙে ভেঙে ফেলেছিল, তিনি সেইগুলি একত্র ক'রে উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। আমরা যাকে বলি গণতন্ত্রের শিক্ষা, সেই ধর্মটিই তিনি অনুষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে অধিক শক্তিশালী ক'রে; একে বলা যেতে পারে ভারতের সামাজিক শিক্ষা ; ভারতের সমাজ-দেবতার পূজা, সমাজ অঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন, পদ্ধতির কথা ভাবতে সময় পাননি। তাঁর উদ্দেশ্যের কাছে এইটি প্রতিফলিত হয়েছিল, কুটির শিল্পে যন্ত্র দিতে দিতে হবে, যন্ত্রদানবতা বর্জন করতে হবে। কালের ধর্মে তা যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, কালকে যদি বর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে আমরা সে সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করতে পারি। কিন্তু তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য

থেকে আমাদের বিচ্যুত হওয়া চলে না, বিচ্যুত হলে ভারতে গণতন্ত্রের শিকাও হবে না, শিকা সর্বজনীনও হবে না। পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, মনোবিদ্যা, Statistical Correlation বিভাগই পণ্ডিতী কথা; এ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই সব মিলছে না বলেই এখনও বিনোবা এ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী শিক্ষাদর্শনের উদ্ভাবক, শিক্ষাদর্শনের ভারতের উপযোগী একটি সূত্রকেই দিয়েছেন, সেইখানেই তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই সূত্র সিদ্ধ করতে হলে যে ব্যবস্থা করা দরকার তা দেশের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, তার দায়িত্ব তিনি নেন নি। যে ভাবেই হোক, গান্ধীজীর সূত্রটি সিদ্ধ হলেই তা হবে বুনিয়াদি শিক্ষা। এই জন্যই এই শিক্ষা ইংরাজ স্বার্থের বিরোধী, বিত্তশালীদের স্বার্থবিরোধী, সমাজ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বার্থপরের মতো আর্থিক উন্নতি ঘটিয়েছে তাদেরও স্বার্থের বিরোধী।

পরিশেষে আমরা স্বাধীনোত্তর যুগে (১৯৫৫-৫৬) এই সম্প্রদায়ের শিক্ষায় কি উন্নতি ঘটেছে তা বলব।

এই সনে ১৫, ৬৮২ টি ইস্কুল আছে তপশীলভুক্ত জাতি এবং আদিবাসীর জন্য, ছাত্রসংখ্যা—১, ০২, ৩৪, ৪৭১ (ছেলে—৭১, ১৪, ৪৭১ এবং মেয়ে ২২, ৩৯, ১৭০)। খরচ—৩, ১০, ৪১, ১৬৯ টাকা, বৃত্তি পায় ১১, ৯৪, ২৮৩ জন ছেলেমেয়ে; অন্যান্য খরচ ৪, ১০, ০২, ৫৩১ টাকা।

আর এদের শিক্ষার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা হল এই:

(১) এদের জন্য বিশেষ ইস্কুল চালানোর ভার গ্রহণ;

(২) অন্য ইস্কুলেও এদের আসন সংরক্ষণ;

(৩) বৃত্তি দেওয়া;

(৪) বেতন, পরীক্ষার বেতন, আবাসিক খরচ সরকার বহন করিবেন;

(৫) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে টাকা দেওয়া হবে যাতে তারা এদের জন্য ইস্কুল পরিচালনা করে;

(৬) দুপুরের খাওয়া দেওয়া হবে।

পূর্বকাল থেকে এখনকার পার্থক্য: অনেক ইস্কুল বেড়েছে, অনেক ছাত্র বেড়েছে; আর পরিকল্পনার মধ্যে দুপুরের খাওয়ার কথা উঠেছে। নতুন ধর্মের দিক দিয়ে একই থাকল। মুনালিয়ার শিক্ষণ আয়োগে এদের কথা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না (পাঠক মার্জনা করবেন, বইটি এখন হাতের কাছে নাই)। মনে হয়, বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। অর্থাৎ যা এতকাল চলছিল তাই চলছে, এসম্পর্কে নতুন ভাবনা আসেনি।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে ভারত সরকার এক পরিকল্পনা করেছেন। একটি সংসদ গঠিত হয়েছে। সেখানে ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও আছেন। দেখা যাক তার পরিণতি কি। এখনও আলোচনার সময় আসে নি।

তবে নতুন কিছু পরিকল্পনা নিলেই কয়েকটি কথা ভাবতে হবে।

(১) বর্তমান যুগে নানা পরিকল্পনা নিয়ে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষার দিকে ঝোঁক চলেছে। এই গতির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এগোতে পারছে না। এমন অবস্থায় এদের ব্যবস্থা কি হতে পারে, কি হওয়া উচিত।

(২) আদিবাসীর সমাজ বড় পুরনো। তাদের রীতি-নীতি অনেকটাই পিতৃতান্ত্রিক। অথচ আমরা এখনই স্বতন্ত্রবাদীদের ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি মেনে নিয়েছি। এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় কি ভাবে মেটানো যায়।

(৩) এরা তত্ত্ব পছন্দ করে না, কর্ম পছন্দ করে। এরা প্রকৃতির ছায়ার মানুষ, শহর গড়তে চায় না। এরা সর্দারকে মান্য করে, ব্যক্তিকে নয়। আমাদের গণতন্ত্র কিন্তু ব্যক্তিমুখীন, আমাদের বুদ্ধি কিন্তু শহরমুখো।

(৪) আদিবাসীদের মাতৃভাষা সম্পর্কে আমরা শুধাকথিত মাতৃভাষা-ভাষী বর্গও কিন্তু উদাসীন।

এই চারটি দিক বড় কঠিন সমস্যার বলেই উল্লেখ করলাম।

সমাপ্ত

শিশুজীবনের আত্মবিকাশ

শ্রীমতী মীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন বিষয়ের ধারণাকে ফলবতী রূপে অধিকারে পাইতে হইলে আত্মপ্রকাশের সোপানাবলী ধীরে ধীরে পার হইয়া তবেই অগ্রসর হইতে হয়—নতুবা ধারণাশক্তির পূর্ণতালাভ ঘটেনা। সেই কারণেই বলা হয় 'Expression is the best impresaion' কোন বিষয়ে সৌষ্ঠবপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া সে বিষয়ের ভাবপ্রকাশ করাই হইতেছে আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে ইচ্ছাই হইল আত্মপ্রকাশ। যে ভাব বা শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি তাহা যখন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই তখনই সেই শিক্ষা বা ভাবগ্রহণ করা সম্পূর্ণ এবং সার্থক হয়। এইরূপ সম্পূর্ণতার জন্যই আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন।

আমাদের দেশের প্রাইমারী শ্রেণীতে সাধারণত পাঁচ ছয় বৎসর হইতে নয় দশ বৎসরের শিশুরাই পড়াশোনা করে। প্রাইমারী স্কুল সাধারণত চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত থাকে; সুতরাং নয় দশ বৎসর বয়স কালের মধ্যেই প্রায় সব শিশুরাই প্রাইমারী শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন প্রাইমারী স্কুলে কিণ্ডারগার্টেনও থাকে। পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুরাই প্রাইমারী সেকসনের ছাত্রছাত্রীরূপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। কাজেই শিশুদের ঐরূপ প্রথম শৈশবকাল হইতেই আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তিকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। 'Education is nothing but bringing out what is lying dormant in man'.

পূর্বকালে আমাদের দেশে সমাজের বা গৃহস্থালীর দৈনন্দিন সকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গৃহেই নির্মিত হইত এবং তাহাতে ছোট ছোট শিশুরা অল্প বয়স হইতেই সকল রকম কাজ দেখিতে এবং হাতে হাতে শিখিতে সুযোগ পাইত এবং শিখিত। ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে গৃহে নানাপ্রকারের কাজকর্ম দেখার কোন সুযোগ সুবিধা তাহারা পায় না। বিশেষ করিয়া সহরাঞ্চলের শিশুরাতো এইরূপ শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সুতরাং বিদ্যালয়েই এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শিশুর আত্মপ্রকাশে কোন বাধা না হয়, বরং আত্মপ্রকাশের তাহাদের প্রকৃত সুযোগ ও সুবিধা ঘটে। বর্তমানে ভারত সরকার এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই 'সর্বার্থসাধক' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সেইরূপ শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণকে সর্ববিষয়ে সার্থক শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হইয়া সেই প্রচেষ্টায় বহু অর্থব্যয় ও ঐকান্তিক আন্তরিকতার সহিত রত হইয়াছেন। শিশুদের এবং ছাত্রদের পক্ষে, জাতীয় ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক হইতে ইহা এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা। এই যুগটাকে প্রধানত শিশুযুগ বলা যাইতে পারে—শিশুদেরই যুগ, ভবিষ্যতের যুগ। আজ যাহা নিদ্রিতরূপে আছে, অচির ভবিষ্যতে তাহাই আত্মপ্রকাশে সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ শিক্ষাদানে আমরা যদি শিশুগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্রটিও হইয়া উঠিবে মহিমময়।

পাঁচ হইতে সাত বৎসরের শিশুগণ সংশোধিত বাক্য বলিতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু কখনো কখনো তাহাদের বাক্যের ধারা ঠিক বজায় থাকে না—উপযুক্ত বাক্যদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

কথোপকথনের সুযোগ দান করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাহাদের বাক্য সংশোধন করিয়া দিলে তাহা খুবই কার্য্যকরী হইবে। শিশুরা ছড়া গল্প প্রভৃতি শুনিতে ও বলিতে খুবই ভালবাসে এবং নূতন ছড়া বা গল্প শুনিয়া তাহা পুনঃপ্রকাশের সময় তাহারা সেইসঙ্গে নিজের মনের ভাবও প্রকাশ করিয়া ফেলে। এই বয়সে শিশুরা নিজেদের মনের বিরক্তি, ক্রোধ, সন্তোষ প্রভৃতিও প্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের বিভিন্ন ধরণের গল্প ও ছড়া বিভিন্ন ধরণের খেলা শুনাইতে ও শিখাইতে হইবে। নানাপ্রকার গল্প ও খেলার মধ্য দিয়া তাহাদের মনের ভাব প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত ছবি দেখা এবং নানাপ্রকার হাতের কাজের ভিতর দিয়াও শিশুমনের রুচি ও পছন্দ বুঝিতে পারা যায় এবং এই সবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাহাদের আত্মার উন্মেষও হইতে থাকে।

আবার তাহাদের মধ্যেই কিছু অধিক বয়স্ক শিশুদের, যেমন ৮।৯ বৎসর বয়সের শিশুদের, জন্য চিত্রাঙ্কন, কবিতাপাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিলে তাহাদের সম্যক্ আত্মপ্রকাশ হইতে পারে। শিক্ষামূলক ভ্রমণে, ঐকতান সঙ্গীতের মধ্য দিয়া শিশুরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। কাজেই বিদ্যালয়ে এই সকল ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কথোপ-কথনের ভিতর দিয়া ছোট ছোট বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করাইলে তাহারা তাহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়া থাকে।

মানব জীবনের প্রথম সোপানই হইতেছে তাহার শৈশবকাল। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে 'morning shows the day', এই কথাটা মানব জীবনে অতি সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। কোন মানবের শৈশবাবস্থা দর্শনেই তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তবেই উপলব্ধি করা যাইতেছে যে মানবের শৈশব অবস্থাতে তাহাদের প্রকৃতি গড়িয়া তোলার কাজ অতীব দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

জন্মের পর শিশুদের দেহ মন প্রায় তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ইহার পরবর্তী তিনবৎসর কিন্তু খুব বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে প্রায় সকল শিশুরই সবকয়টি দাঁতেরই উদ্গম হইয়া থাকে এবং তাহারা পরিষ্কারভাবে কথা বলিতে সক্ষম হয়। এই বয়সে তাহারা নানারকম বাস্তব অবাস্তব কল্পনা করিতেও ভালবাসে। খেলা করাই অবশ্য এই সময়ে তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। শিশুর এই সময়কার মনের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। খেলা ভালবাসে বলিয়া তাহাকে সারাদিন ছুটাছুটি করিতে দেওয়া ঠিক নয়। সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ সঞ্চালন, কর্মসঙ্গীত—সুন্দর সুন্দর অর্থবোধক গানের সহিত নৃত্য—ইত্যাদি করিতে দিয়া তার এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দিতে হইবে।

এই সময় শিশুগণ বড়দের অনুকরণ করিতে ভালবাসে। শিশুর এই অনুকরণ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহার মানসিক শক্তির উন্মেষ লাভ ঘটে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, পরিষ্কার ও মার্জিত ভাষায় কথা বলিবেন, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসিবেন, সময় রক্ষা করিয়া শ্রেণীতে প্রবেশ করিবেন; তবেই ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাদের দেখিয়া এই সকল গুণ অনুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। এই বয়সে তাহাদের কৌতূহলও খুব বেশী থাকে, সর্বদা প্রশ্ন করিয়া নূতন নূতন বিষয় জানিতে আগ্রহ হয়। তাহাদের এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থতায় পরিবর্তিত করা যায় প্রকৃতিপাঠে, পরোক্ষভাবে ইতিহাস, ভূগোল,

বস্তু পাঠে ; পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়া নীতি-বোধক সৎশিক্ষা দানের শিক্ষা ইত্যাদি।

স্থূল বস্তুর সাহায্যে, মণ্টেসরি প্রবর্তিত উপকরণের সহায়তায় তাহাদের সংখ্যা-বিচার ধারণাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ছোট ছোট ছন্দময় ছড়াও আবৃত্তি করাইতে হইবে। এই নব প্রস্ফুটিত বয়সে তাহাদের কল্পনাশক্তি থাকে খুবই প্রবল, সুতরাং তাহাদের এই নূতন সৃজনী স্পৃহার সুযোগ অবলম্বনে তাহাদের দ্বারা নানারূপ হাতের কাজ, ড্রইং, মডেলিং ইত্যাদি শিক্ষায় তাহাদিগকে শিপ্ত, অনুরক্ত ও দক্ষ করিয়া তোলা খুবই সহজসাধ্য।

শিশুদের মনোযোগ এক বিষয়ে অধিককাল স্থায়ী হয় না, কাজেই বিশেষ কোন একটি বিষয়ে তাহাদিগকে অধিকক্ষণ শিক্ষা দেওয়ার ফল ভাল পাওয়া যায় না। এই বয়সে শিশুদের সত্য অসত্য ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় না। কাজেই বিচক্ষণ কৌশলে এমনভাবে নিয়ম প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মধ্যে নানাবিধ সৎগুণ ও সৎ অভ্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে। অন্যের কাজে ব্যাঘাত না করা, ঝগড়াঝাটি না করা, নিজের জিনিষপত্র সুশৃঙ্খলে গুছাইয়া রাখা এইরূপ নানাপ্রকার সৎগুণ তাহাদের অভ্যাগত হইয়া উঠিতে পারে। এইসব অভ্যাসের ফলে তাহাদের নৈতিক উন্নতিও সাধিত হইবে। বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবার শিক্ষা, গুণীজনের গুণগ্রাহী হইতে পারার শিক্ষা, স্নান, ভক্তি, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহার পর, অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুগণ যখন আরও একটু বড় হইয়া আট নয় বৎসরে উপনীত হয়, তখন আবার তাহাদের দেহমনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। এই সময় তাহারা খুব তাড়াতাড়ি প্রায় দুই ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হইয়া ওঠে। মানসিক বৃত্তিগুলিরও দ্রুত পরিপুষ্টি এবং বিকাশ সাধন হয়। এই সময় তাহাদের চঞ্চলতাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাহারা সর্বদাই খেলা বা অন্য কাজে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। এই বয়সে তাহাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মনো-যোগও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। কাজেই তাহাদের এই মনোযোগ এবং উন্নত স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বড় বড় মনীষীদের জীবনকাহিনীর আলোচনা দ্বারা উপকার পরিলক্ষিত হইতে পারে। এই সময় তাহারা নিজেরাই সত্য-মিথ্যা বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্যবিচার করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই বয়সের শিশুদের নিকট কোন কাল্পনিক কাহিনী না বলিয়া বরং বীরত্বের কাহিনী, অভিযানের কাহিনী সুন্দর বর্ণনার সাহায্যে ব্যক্ত করিতে পারিলে তাহার ফল স্থায়ী ও শুভ হয়।

এই বয়সটা ভাষা আয়ত্ত করার বয়স—নূতন নূতন শব্দ বা কথা গ্রহণ ও ব্যবহারে তাহারা উৎসুক হয়, আনন্দ লাভ করে। নিজেদের মনের ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করার আগ্রহে তাহারা তাহাদের পূর্বেকার অর্জনলব্ধ ভাষার সহিত নূতন নূতন শব্দ এবং কথা যোজনা করিয়া তাহাদের ভাষার ভাণ্ডারকে অতিক্রত সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলে।

তাহারা ছবি দেখিতেও খুব ভালবাসে এবং ছবি দেখিয়া সেই ছবির ভাষাকেও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। ছবি দেখিয়া তাহারা বহু নূতন কথা, নূতন গাছপালা প্রাণীদের নাম জানিতে পারে। দেশ-বিদেশের মানচিত্র, দেশী বিদেশী মানবগণের পোষাক ও আকৃতি, পাহাড় নদী আকাশ যানবাহন, নানাবিধ দ্রব্য ও উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। শিশুদের এই বয়সটাকে এই কারণেই অনেকে picture age ও বলিয়া থাকেন। কাজেই বিশেষ বিশেষ ধরণের ছবি দেখাইয়া সেই ছবির বর্ণিত জিনিস সম্পর্কে তাহাদের লিখিতে বা বলিতে উৎসাহ দিলে তাহাদের ভাব এবং ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকে।

এই বয়সে ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে আত্মিক-বোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে থাকে। তাহারা দলগতভাবে কাজ করিতে ভালবাসে। কাজেই দলবদ্ধ ভাবে তাহাদের ছোট ছোট সমাজ-সেবার কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা এই বয়স হইতে আরম্ভ করিতে হইবে যেন বড় হইয়া তাহারা দেশের ও দশের উপকার করিতে অভ্যস্ত হয়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে কেমন করিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, এবং তদ্দ্বারা সুশৃঙ্খলে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্ব স্ব শ্রেণীর কাজ বিদ্যালয়ের কাজ আদর্শ-যোগ্যরূপে তাহারা সম্পাদন করিতে উন্মুখ হয়, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাই যে দেশের, সমাজের ও জাতির মঙ্গলে নিয়োজিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়

"শ্রীজ্ঞানাদেবী"

[লেখকের পীত্র প্রকাশিতব্য "দেশ বিদেশের শিক্ষা" বইয়ের এক অধ্যায়।—সম্পাদক]

সূচনা :—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্র যত দূরেই থাকুক না, তাহার বাড়ী লোকালয় থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হোক না, তবু সে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় এবং ষোল বৎসর পর্যন্ত পড়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বারটা শ্রেণীতে শেষ হয়। ষোল বছরের পর পড়িলেও বেতন দিতে হয় না। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হয়; তাহার পরিমাণ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক সময়ে পনের বিশ গুণ বেশি।

আমেরিকা সংযুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত আমাদের দেশের ব্যবস্থার বলিতে গেলে কোন মিল নাই। সেইজন্য দেশবাসীকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। আবার সে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এক নয়, অনেক বিষয়ে বহু পার্থক্য, অনেক সাদৃশ্যও আছে। প্রধানত নিজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া লিখিতেছি। আমেরিকার শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশের সহায়ক।

হাই স্কুল পাশ করিয়া ভর্তির জন্য অনেক কলেজে পরীক্ষা দিতে হয়। ইহাকে প্রবেশিকা বা Admission Test বলে। এই পরীক্ষায় সাধারণতঃ মার্ক দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য কোন পরীক্ষায় মার্ক দিবার রীতি নাই; Grade (A, B, C, D) দেওয়া হয়। ৯০—১০০ মার্ক পাইবার মতো লেখা হইলে A, ৮০—৮৯ হইলে B, ৭০—৭৯ হইলে C, ৬০—৬৯ হইলে D এবং ৬০ এর কম হইলে E দেওয়া হয়, অর্থাৎ ফেল। কলেজে ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ঠিক করে, ভবিষ্যতে সে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। তাহা ঠিক করিলে সেই সকল বিষয়ে অধিক সংখ্যক Course (আমাদের দেশের পেপারের সমান) বাছিয়া লওয়ার বিষয়ে কলেজে তাহার পরামর্শদাতা শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিয়া থাকেন। এই পরামর্শ-দাতার উপদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রের যাইবার পথ নাই। তিনি ছাত্রের একজন শিক্ষক।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই সহশিক্ষা

প্রচলিত, এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকা একসাথে সবত্রই পড়াইয়া থাকেন। তবে স্কুলের নীচের শ্রেণীতে শিক্ষিকার আনুপাতিক সংখ্যা বড় বেশি, এবং উপরের শ্রেণীতে ঐ প্রকার কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কম, এবং উচ্চতম স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে ছাড়া অন্য বিষয়ে যে কয়জন থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা বলিতে গেলে আঙুলে গোণা যায়। স্কুল-কলেজে উপরের শ্রেণীতে যতই ছাত্রছাত্রীরা উঠিতে থাকে, ছাত্রীদের সংখ্যা ততই কমিতে থাকে। কারণ, তাহারা বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করে। তবে ঘরসংসার করিয়াও অনেক মহিলা কলেজে পড়াশুনা করেন। বহু পরিবেশ, গলিতদন্ত স্ত্রী-পুরুষ (যদিও এ বিষয়ে পুরুষের চাইতে স্ত্রীর সংখ্যা বেশি) আমাদের দেশের যুবক যুবতীর দৃষ্টান্ত স্থল। বোধ হয়, সময় কাটাইবার জন্যও বৃদ্ধ বয়সে কেহ কেহ পড়াশুনা করেন।

দেশে বে-সরকারী কলেজের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু আমাদের দেশের মতো জোড়া-তাড়া নাই। সেখানে শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ। শিক্ষকদের নিয়তম যোগ্যতা থাকা চাই। ছাত্রদের সুখ-সুবিধার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা আমাদের দেশের সরকারী কলেজগুলির চাইতেও অনেক ভাল। তবে ছাত্রগণকেও অনেক বেশি বেতন দিতে হয়। কিন্তু পড়িবার সময় আয় করিয়া বেতন দিবার সুবিধা আছে। বহুকলেজের যুনেটীনে এই সুবিধার কথা উল্লেখ থাকে। যুনেটীন (Prospectus) প্রতি বৎসর দুই বা তিন বা চার ছয় বার ছাপা হয়। চাহিবা মাত্র বিনা মূল্যে, বিনা ডাকমাশুলে পাওয়া যায়। কোন কোন যুনেটীনে ছয় শ' বা আট শ' পাতা থাকে।

ইংরাজরা প্রথমে আসিয়া আটলান্টিক মহা-সাগরের কূলে তেরটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই জন্য সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক মিল আছে। উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইবার পর ইংলণ্ডের উপর টান থাকিল না, সেখানকার শিক্ষার প্রতি আকর্ষণও কমিয়া গেল। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ উপলক্ষে যে গৃহযুদ্ধ হইয়া গেল তাহার পর আমেরিকার সুধীরা জার্মানীতে গিয়া সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন জার্মানীতে বিসমার্কের অভ্যুদয়। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর পৃথিবীতে তাঁহার জয়-জয়কার। পৃথিবীর লোক জার্মানীর সম্রাটের চাইতে তাঁহাকে বেশি জানিত। তাহারা মনে করিত যে বিসমার্কই জার্মানী, আর জার্মানীই বিসমার্ক। মধ্য এবং পশ্চিম অঞ্চলে তখনও আমেরিকানরা জার্মানীকে অনুসরণ করিয়া পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করিলেন। এই জন্য দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ মিল নাই, যে মিল এই পার্শ্ব-ভারত উপমহাদেশেও আছে। একশ বৎসর ধরিয়া আমরা ব্রিটেনকে অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে পরিবর্তন আসিয়াছে, যে উন্নতি হইয়াছে, গণতন্ত্রের যে মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা তাহা অনুসরণ করিতেছি না।

হারভার্ড কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়) ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইয়েল কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়) ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলেজের মোট সংখ্যা ছিল ১৭০; আর ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা ১৭০০ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কলেজ ধর্মপ্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইত। কলেজের বিষয়বস্তু নিম্নস্তরের ছিল। গবেষণার ব্যবস্থা ছিল না। একজন শিক্ষক অনেক সময় চার পাঁচটি বিষয় পড়াইতেন। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর স্নাতকোত্তর শিক্ষার উন্নতি আরম্ভ হইল। প্রাশিয়াকে ছাড়াইবার জন্য প্রথম 'আধুনিকতম বিজ্ঞান' শিক্ষার জন্য বহু কোটি টাকা খরচ করা হইতেছে।

কলেজের প্রথম বৎসরকে Freshman শ্রেণী,

দ্বিতীয় বৎসরকে Sophomor শ্রেণী, তৃতীয় বৎসরকে Junior শ্রেণী এবং চতুর্থ বৎসরকে Senior শ্রেণী বলে। তবে আমাদের দেশে পুরা এক বৎসর শেষ না হইলে শ্রেণীটি যেমন সমাপ্ত হইল না, আমেরিকায় তেমন কঠোরতা নাই। বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইতেছে।

এখন (১৯৬০) পঞ্চাশটি রাজ্য নিয়া আমেরিকা সংযুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)। দুই একটি বাদ দিলে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে অন্তত একটি সরকারী কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়) আছে। অধিকাংশ কলেজ বেসরকারী।

আমাদের দেশের মতোই শিক্ষা-বিষয় রাজ্য সরকারের অধীন। ইহার অর্থ এই নয় যে রাজ্য সরকার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করেন। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সকল প্রকার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারেরও কোন প্রকার দায়িত্ব নাই। তাঁহারা শিক্ষার জন্য সামান্য আর্থিক সাহায্য করেন, কিন্তু কোন প্রকার কর্তৃত্ব দেখাইতে যান না। তাঁহাদের নিজস্ব অল্প কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিচালনা ঃ—১৮৭৫ সালের আগে ট্রাস্টী বোর্ড, প্রেসিডেন্ট, এবং বিভিন্ন বিভাগের (Faculty) শিক্ষকগণ, ইহারাই কলেজ পরিচালনা করিতেন। তখন ছাত্রসংখ্যা বড়ই কম ছিল। ইহার পর ছাত্রসংখ্যা অনেক হইতে আরম্ভ করিল। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তখন রেজিষ্ট্রার, বিভিন্ন ডীন, ট্রেজারার (Business manager, Bursar, Secretary ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে) ও আরো কয়েকটি পদের সৃষ্টি হইল। এখন কোনও কোনও কলেজে তিন হাজারের বেশি শিক্ষক, বিশ ত্রিশ হাজার ছাত্র পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং সমস্যা দিন দিন জটিল হইতেছে। ইহার উপর ঘন ঘন শিক্ষক পরিবর্তন তো আছেই। অনেক কলেজের প্রেসিডেন্ট বহু শিক্ষককে চেনেন না।

(ক) কলেজ পরিচালনার জন্য শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টীগণ দায়ী। তাঁহাদিগকে কোথাও Directors, কোথাও Regents, কোথাও Board of Governors, বা অন্য নাম দেওয়া হয়।

ট্রাস্টীগণ কলেজের সকল প্রকার সম্পত্তির মালিক। তাঁহারা থাকেন (১৮৭২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বিশ হাজার ডলার ছিল; আর ১৯৪৯—৫০ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রায় চার কোটি ডলার ছিল) অনুমোদন, নীতি নির্ধারণ ও প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। তাহারা সকল বিষয়ে শেষ আপীল করিবার কোর্ট।

ট্রাস্টীদের সংখ্যা ৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত হইতে পারে। তাঁহারা প্রায়ই তাহাদের প্রেসিডেন্টের কাজকর্ম বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করিয়া যান। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ইচ্ছাই ইহার কারণ। তাঁহারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অর্থ, নিজেদের নির্বাচন ভুল হইয়াছে, তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা। কেহই এই প্রকার ভুল সহজে স্বীকার করেন না।

প্রত্যেক রাজ্যের গভর্ণর সরকারী কলেজগুলির ট্রাস্টী নিযুক্ত করেন। এই প্রকার নিয়োগের কারণ রাজনৈতিক। কোথাও কোথাও তাঁহারা শিক্ষক বা কলেজের পাশ করা ছাত্রের দ্বারা নির্বাচিত হন। অনেক বেসরকারী কলেজের ট্রাস্টীরা অর্থ ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজেরাই নূতন ট্রাস্টী নির্বাচিত করেন। মোটের উপর ট্রাস্টীরা যোগ্য এবং বিবেকবান।

ট্রাস্টীরা সাধারণতঃ তিন, পাঁচ, ছয়, সাত, নয় বৎসর বা আজীবনের জন্য নিযুক্ত হন।

(খ) ট্রাস্টী বোর্ডের সভাপতি যিনি, তিনি আবার বিভিন্ন Faculty বোর্ডের সভাপতি। যোগ্যতম ব্যক্তি ট্রাস্টী বোর্ডের সভাপতি হইবেন। তিনি আর্থিক এবং সকল প্রকার শিক্ষা সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার জন্য দায়ী। সকল প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি এবং বেতন সম্পর্কে তিনি ট্রাস্টীগণের নিকট সুপারিশ করেন। তাঁহার সহকারীগণ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, নতুবা তাঁহার একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভবপর নয়। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অসামান্য বিদ্বান, ভালো বক্তা এবং অর্থ নৈতিক বিশেষজ্ঞ। কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য একজন বিশিষ্ট জন-নায়ককে (যেমন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইজেন-হাওয়ার) প্রেসিডেন্ট করা হয়। তাঁহার যে এই সব গুণ থাকিবে, এমন কোন কথা নয়। তাঁহার বার্ষিক বেতন পাঁচ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার ডলার পর্যন্ত হয়। সাধারণতঃ বয়স পঞ্চাশের কম নয়; পঁয়ষট্টিতে অবসর গ্রহণ করিবার কথা।

বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ (Faculty) :— বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নিয়া বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ। পড়ানো ব্যতীত শিক্ষকগণ পাঠক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পর ফলাফল ঘোষণা এবং পাঠ্য বিষয়ের সকল প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। জুনিয়ার কলেজে (আমাদের দেশে Intermediate College-এর সমান—মাত্র দুই বৎসর পড়ানো হয়) বা ছোট ডিগ্রী কলেজে একটি মাত্র Faculty Board থাকে। বড় কলেজে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) Arts, Science, Medicine, Law, Education, Engineering, Agriculture, Dentistry, Theology, Graduate School (যেখানে Master এবং Doctor ডিগ্রীর জন্য পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে) ইত্যাদি বহু বিষয়ে Faculty Board থাকিতে পারে। এই প্রকার প্রত্যেক বোর্ডের সভাপতিকে ডীন বলে।

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো :

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে ও প্রত্যেক বিষয়ে যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াইয়া থাকেন তিনি সেই বিষয়ের প্রথম এবং শেষ পরীক্ষক।

প্রতি Course-এ এক বা একাধিক point থাকে—১,২,৩,৪,৫। ডিগ্রী পাইতে হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক points (অর্থাৎ course) সম্পূর্ণ করিতে হয়। যেখানে Term প্রথা প্রচলিত সেখানে ব্যাচিলার ডিগ্রী পাইবার জন্য কলেজ বিশেষে ১২২ বা ১৯৬ বা ১৯৮ বা ইহার কাছাকাছি Points যোগাড় করিতে হয়। সেখানে Semester প্রথা প্রচলিত সেখানে সাধারণতঃ ইহার তিন ভাগের দুই ভাগ প্রয়োজন হয়। যে ছাত্র ডিগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক Points-এর এক-চতুর্থাংশ যতদিন সংগ্রহ করিতে না পারে ততদিন সে Freshman (first year); ইহার পর যতদিন সে অর্ধাংশ সংগ্রহ করিতে না পারে ততদিন সে Sophomor (second year); এইভাবে চলিতে থাকে। এইজন্য উপরের শ্রেণীতে উঠিতে কঠোরতা নাই। কোন term বা semester শেষ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিয়া ছাত্র যদি আর না পড়ে তবে তাহার অর্জিত points নষ্ট হয় না। হয়তো সে মাত্র কুড়ি points সংগ্রহ করিয়াছিল; ইহার পর সে হয়তো ষোল বৎসর বসিয়া থাকিল—অর্থাৎ পড়াশুনা করিল না। ইহার পর হয়তো সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। ডিগ্রীর জন্য পূর্ণ সংখ্যক points পাইবার পক্ষে ঐ ষোল বৎসর আগেকার জমা কুড়ি points সাহায্য করে। এক কলেজ থেকে আর এক কলেজে গিয়া ভর্তি হইবার পক্ষে জমা সকল points সব সময়ে সাহায্য লাভ করিতে পারে। কোন কলেজ হয়ত বলিবে যে, অন্য কলেজ থেকে যে সকল points পাওয়া গিয়াছে, ডিগ্রী পরীক্ষার প্রয়োজনীয় points-এর জন্য এক তৃতীয়াংশ মাত্র তাহা থেকে গ্রহণ করা হইবে, বাকীটা গ্রহণ করা হইবে না—তা সেই points যে কোন বিশ্ববিখ্যাত কলেজের হোক না কেন, বা পরীক্ষার ফল যত ভালোই হোক না কেন। যেমন সাধারণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে term প্রথা প্রচলিত) হয়তো বলিবে যে, ব্যাচিলর ডিগ্রী পাইবার জন্য মোট ১৯০ points-এর প্রয়োজন। অন্য কলেজে সংগৃহীত মাত্র ৬০ points আমরা স্বীকার করিব, বাকি স্বীকার করিব না। (ক্রমশঃ)

CALCUTTA
CENTRAL

শিক্ষা

ম বি কল্যাণকৃৎ কল্পিত্ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৬৭ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

ছাত্র ও রাজনীতি

ছাত্রদের অধিকার সম্বন্ধে দেশের সকলেই আজ চিন্তিত, কি করিয়া ছাত্রদের বিনীত করা যায়। ছুর্বিনয় হইতে রক্ষা না করিলে বিসর্জন হইবে না। এই ধরণের যুক্তি শুনিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা মনে হয়। স্বদেশী আমলে প্রবীণেরা বলিতেন, ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ—তপস্যা কর গিয়া, অধ্যয়ন কর, তবে তো উপযুক্ত মানুষ হইবে—মানুষ হইয়া দেশের জন্য কাজ করিও। আমরা ভাগ্যদোষে গুরুজনের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু বহুলোকে শোনে নাই। আমাদের মনও কি এসব নিষেধবাণীতে সায় দিয়াছিল?

আমরা গোঁজামিল দিতে আরম্ভ করিলাম। অধ্যয়নের গণ্ডির বাহিরে কোন বিষয়? গান্ধীজীর অসহযোগ তো অন্য জিনিস। অন্যায়ের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প তার মূলে। কিন্তু আমরা তো সোজাসুজি ভাবিতে শিখি নাই।

অবশ্যই তখনকার ও এখনকার অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন যথেষ্ট। তবু অধ্যয়নকে খর্ব না করিয়া, রাজনীতি চর্চা—সক্রিয় যোগদান নয়—কি এতই মন্দ? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, যেখানে হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। সেই যেখানে হৃদয়, রাজনৈতিক কর্ম ও ভাবনার জন্য পিপাসু হৃদয়ের পিপাসা মিটিবে কি করিয়া? ইহাও একটা সমস্যা।

প্রজ্ঞেয়া ইন্দিরা দেবী স্মরণে

ঠাকুরবাড়ীর শেষ অগ্নিশিখা—ইন্দিরা দেবীর কথা এইভাবে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে তাঁহার শোকসভা ও স্মৃতিসভা হইতেছে। আমরা গত সংখ্যায় আমাদের প্রণতি জানাইয়াছি। দশ বৎসর পূর্বে শিক্ষা-সম্পাদিকা প্রবন্ধ চাহিয়া পাঠাইলে জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে তিনি লিখিয়া জানাইলেন, 'শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন কিছু লিখে দেবার সময় বা ক্ষমতা আমার নেই। ও বিষয়ে কিই বা জানি, আর কজন ছেলেকে পড়িয়েছি?' তবু আমাদের অনুরোধে তিনি কিছু পুরানো কাগজ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার একটি (কোনও নারীশিক্ষা মন্দিরের উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ) তাঁহারই

নির্দেশমত কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল। '৫০ বৎসরের বাসি মতামত এতদিন পরে চলবে, না চর্বিত চর্বণ হবে, সেটা বিবেচ্য।' শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকার মতামত বাসি হইয়াছে, এরূপ মনে করি না। আমাদের শিক্ষার প্রগতি এখনও এতদূর হয় নাই।

উপাচার্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত যখন কলিকাতার উপাচার্য হইয়া আসেন তখন তাঁহার মত একজন কর্মকুশলী, দিরদন্তিক কাণ্ডারীর বড়ই প্রয়োজন ছিল। আজকার দিনেও সে প্রয়োজন অবশ্য ফুরায় নাই। কিন্তু সেদিন যখন সিনেটে একজন অভিজ্ঞ কাণ্ডারীর বড়ই দরকার ছিল। উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁহার বন্ধুদের হতাশ করেন নাই। দক্ষতার সহিত সকলকে লইয়া কার্য করিয়াছেন এবং তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সও সকলের অনুমোদনসহ গ্রহণ করাইতে পারিয়াছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যশ বিস্তৃত হউক এবং নানা সমস্যাসঙ্কুল আমাদের শিক্ষাজগতে তাঁহার পরিচালনা কল্যাণপ্রসূ হউক, কামনা করি।

উপাচার্য—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিচারপতি ব্রজকান্ত গুহ মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের বিষয়। এক সময় রীতি ছিল—এখনও আছে—যে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। বিচারপতির নিরপেক্ষতা অবশ্যই কাম্য, এক্ষেত্রে বিচারপতি গুহমহাশয় শুধু পণ্ডিত নহেন, নিরভিমানীও বটেন, সুতরাং তাঁহার নায়কত্বে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রথম পদক্ষেপে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে ইহা অবশ্যই আশা করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন কি হইবে, এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করিয়া প্রবীণ অধ্যাপক গুহ মহাশয় স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং কোনও শিক্ষাবিদই মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, একথাও বলিয়াছেন। আমাদেরও অনেকের মনে এইরূপ ধারণা হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে আর না-ই উদ্ধৃত করিলাম। পরলোকগত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রবন্ধ হিসাবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত করা হইল।

বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

[বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিদ্যানিধি মহাশয় বিজ্ঞানশাখার সভাপতি রূপে দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধৃত। তাঁহার মতে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের প্রথম অন্তরায় দেশের দারিদ্র—ধনসাধ্য বিজ্ঞান দরিদ্র দেশে টিকিতে পারিতেছে না, দ্বিতীয় অন্তরায় শুধু অমূর্তবিজ্ঞানের সাধনা, তৃতীয় অন্তরায় বিদেশীভাষার মাধ্যমে শিক্ষা।]

দেশে বিজ্ঞান প্রচারের তৃতীয় অন্তরায়, বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা, এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে ; কাম্য বিজ্ঞান। চতুর্দিকের কণ্টকের বেষ্টন ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় পাইতেছে। ইহাও সহ্য হইত ; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে বা লিখিতে হইতেছে ; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দমূর্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভ্যসমিতি আপিস আদালতে যাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্য বেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুখবোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞান তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরাজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে এত অধিক সময় লাগিত না। এখানে এক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর আমাকে কটকের মেডিকেল ইস্কুলে কিমিতি বিজ্ঞান শিখাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। এখনকার আই এস সি পরীক্ষার নিম্নস্তর যতখানি আছে প্রায় ততখানি ছিল। ছিল না কর্মাভ্যাস। কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অধ্যাপনা শেষ করিতে হইত। আমরা কলেজে কত কুড়ি দিন দিয়া থাকি, তাহা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়েশে অন্যূন সাত কুড়ি দিন অধ্যাপনা করিতেছি। এই প্রভেদের প্রধান কারণ, ভাষার প্রভেদ। মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষিত। দেখিয়াছি, ইংরেজীতে যাহা একঘণ্টা বুঝাইয়া ছাত্রের হৃদ্‌গত করিতে পারি নাই, তাহা বাংলা কথায় তাহা অক্লেশে পারিয়াছি। জল কেন ছোঁকি, কি কাজে কেমন ছাঁকনি চাই, ইত্যাদি হাজার বলি, এক "ফিল্টার" শব্দে একটা বিদেশী অজানা অদেখা বস্তুর আব-ছায়া মনে ভাসিতে থাকে। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বয়সে যত বিদ্যা আয়ত্ত করে, সে বয়সে তত বিদ্যা আমাদের ছাত্রেরা পারে না। ইহার কারণ বিদেশী ভাষা। এই যে ভাষা-বিভীষিকা যাহার জন্য আমাদের ছাত্রদিগের দেহ মন জড়ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহার প্রতিকার কি হইবে না? ইংরেজী ভাষা বিদেশী ভাষা, শিখিলে হিত হয় না, কিংবা বিনয় অভ্যাস হয় না, এমন বলি না। বলি, কি মূল্য দিয়া এই হিত ক্রয় করিতেছি? মাতৃভাষায় শিখিলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মনে গাঁথা হইয়া যায়, বিদেশী ভাষায় গাঁথিতে বহু সময় লাগে। আরও দেখুন, বিদেশী ভাষা হেতু শিক্ষার ফল দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বিজ্ঞান জনকয়েকের অধিকৃত থাকিতেছে, সকলের ভোগে আসিতেছে না।

———

মেয়েদের শিক্ষা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

আজ এই বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার দেবার জন্য সাদরে ডেকে এনে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই উৎসবে যোগ দান করে আনন্দ অনুভব করছি।

আমরাও ছেলেবেলায় ইস্কুল গেছি, যদিও এখন দেখে সেকথা হয়তো তোমাদের বিশ্বাস হবে না। তাই ইস্কুল এবং ইস্কুলের মেয়েদের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান আছে। আমার মনে হয় এই সময়েই মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট সময়, তা সে বন্ধুনিই থাক আর পুরস্কার নাই পাক। বড় বয়সে দুঃখের বিষয় সুখের সংসার সকলের ভাগ্যে জোটে না, আর হাজার সুখের হলেও সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ভাবনা চিন্তা লেগেই থাকে। তাই বালিকা বয়সে এই আরামের সময়টুকু, এই হাঁফ ছাড়বার অবসর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া ইস্কুলে লেখাপড়ার রেষারেষি, খেলাধুলার নেশামেশি, গুরু শিষ্য ও সহপাঠীদের সঙ্গলাভে যে মাধুর্যরস আছে, বাড়িতে তা পাওয়া যায় না। আবার বাড়ীতে মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন পাড়া-পড়শীর কাছ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, ইস্কুলে তা পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়, বাড়ি ও ইস্কুল দুইয়ে মিলে তবে সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে ওঠে।

আমাদের আগেকার যে সামাজিক নিয়ম ছিল, তাতে হয়তো মেয়েদের ইস্কুল যাওয়ার বড় একটা স্থান ছিল না। প্রথমত এত অল্প বয়সে বিয়ে হোত যে লেখাপড়া শেখবার সময়ই পাওয়া যেত না। আমার মাতৃদেবীকে ৮ বৎসর বয়সে গৌরীদান করা হয়েছিল। তার আগে দেশের পাঠশালায় তাঁর সামান্য হাতে খড়ি মাত্র হয়েছিল। তবে যে পরে এত সুশিক্ষিতা হয়েছিলেন সে কেবল তাঁর নিজের চাড়ে এবং শ্বশুরবাড়ির সাহায্যে।

এখন তো আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়সের নিম্নসীমা ১৪ বৎসর করা হয়েছে। তাই শিক্ষার কিছু সময়ও পাওয়া গেছে। বড় মেয়েকে অলস ভাবে ঘরে বসিয়ে রাখার চেয়ে যে লেখাপড়া ও গৃহকর্মে নিয়তকর্মে ব্যাপৃত রাখা ঢের ভাল, একথা বোধ হয় সকলে স্বীকার করবেন। দেশের অবস্থা অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ব্যবস্থা বদলাতে না পারলে জাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব। তখনকার কালে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে এক গ্রামে বাসকালীন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রশস্ত ছিল, এখন বড় বড় সহরে থাকবার বা স্বামীর সঙ্গে কার্যোপলক্ষে দেশবিদেশে যাতায়াত করার দিনে যে সে শিক্ষার পরিবর্তন হওয়া দরকার একথা বেশি করে বলাই বাহুল্য। আর শিক্ষিত ছেলেরাও তাই আজকাল শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চায়। তাই, অন্য কারণে না হলে বিয়ের বাজারে দর ও আদর বাড়াবার জন্যেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে।

বাংলা দেশে বোধ হয় ৭০।৮০ বৎসর হল আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে, তার মধ্যে সে বিষয়ে এত বলা হয়েছে ও করা হয়েছে যে, এখনো তার পক্ষ নিয়ে ওকালতি যে করতে হয়, এইটেই আশ্চর্য। যাঁরা এতদিন পরেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অমনোযোগী বা বিরোধী, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, খুব স্থূলভাবে দেখলেও কি তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার কোনও সুবিধে

দেখতে পান না? আর কিছু না হোক, বাড়ীতে পুরুষ মানুষের অনুপস্থিতিকালে একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে পড়তে পারা, আবশ্যক হলে দূরদেশে চিঠি লিখতে পারা, খরচপত্রের হিসেব ও টাকার হিসেব লিখতে পারা, অবসর মত দুটো ভালো বই নিজে পড়া বা অপরকে পড়ে শোনাতে পারা, ছেলেদের পড়ার সাধ্যমত সাহায্য করতে পারা, এগুলির কি কোনই মূল্য নাই? আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে কূপমণ্ডুক না হয়ে থেকে স্বদেশে বিদেশে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার খোঁজ খবর রেখে মন উদার করা, স্বামী পুত্রের আলোচনায় যোগ দিতে পারা, গতানুগতিকতা ছেড়ে গৃহ ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতির চেষ্টায় যোগ দান করা—এসব সুফল তো স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে যত উচ্চস্তরে ওঠা যায় ততই লেখাপড়ার কদর বাড়তে থাকে। কেরাণীর স্ত্রীর যে শিক্ষা হলে চলে যায় আজকালকার দিনে হাইকোর্টের জজের স্ত্রীর তার চেয়ে কিছু বেশি না হলে সমাজে চলা বড় মুস্কিল হয়। তাঁদের স্বামীদেরও বেগ পেতে হয় বা ঘরে ঘরে মেম রেখে ক্ষতিপূরণ করতে হয়। বিয়েরূপ অনিশ্চিত দৈব-ঘটনার উপর মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবিধি যখন এতদূর নির্ভর করে তখন বাপমার উচিত সাধ্যমত মেয়ের শিক্ষার একটা গোড়াপত্তন করে রাখা, যাতে ভবিষ্যতে আবশ্যকমত সেই বনেদের উপর খাঁপুনি তুলতে পারা যায়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনুরক্ত তর্কের মধ্যে একদল লোককে প্রায়ই বলতে শুনি যে শিক্ষার জন্যই তাদের শেখানো উচিত, সুমাতা-সুগৃহিণী হবার জন্য নয়, কারণ ছেলেরা সু-পিতা হবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত হন না। যাঁরা এযুক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁরা ভুলে যান যে, পুরুষরা কিন্ডারগার্টেন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভ ক'রে পরে কোন পেশা বা জীবনের কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন; তেমনি সাধারণতঃ মেয়েদের জীবিকা বা জীবনের কাজ হ'চ্ছে ঘর-সংসার ও ছেলে মানুষ করা, এবং সে কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তাদেরও সাধারণ শিক্ষান্তে কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা-লাভ করা দরকার।

আমাদের মেয়েদের বিবাহপূর্ব শিক্ষার কাল এত সঙ্কীর্ণ বলে আমার মনে হয় ১৬ বৎসর বয়সকে অন্ধ্রসমাজের স্ত্রীশিক্ষার সাধারণ সীমারেখা বলে ধরে নিয়ে ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ও ছেলেদের একই বিদ্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যথা—বাঙ্গলা অঙ্ক ব্যাকরণ ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি, যাতে এসব বিষয়ে নিতান্ত আবশ্যকীয় প্রাথমিক জ্ঞানলাভটুকু হয়। তারপর ১১ থেকে ১৬ (অথবা বিবাহপূর্ব) পর্যন্ত মেয়েদের সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবন-যাত্রার অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত, যথা স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থবিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই, শিশুপালন, বিজ্ঞানায় গৃহস্থালী, হিসাব ইত্যাদি।

একটি বিদ্যামন্দির তাঁদের বিজ্ঞাপনে বলেছেন যে "আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য, শুধু কতকটা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করা নহে, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মে নিষ্ঠা, চরিত্র সংগঠন ও ভবিষ্য গৃহিণীর সর্বপ্রকার সাংসারিক কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়া···আদর্শ গৃহিণী পদবাচ্য হওয়াই যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার সার্থকতা। উপরন্তু আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী অসহায়া নারীগণের সুশিক্ষার সহিত শিল্প ও কারুকার্যের দ্বারা আর্থিক উন্নতিলাভে শিক্ষা দেওয়া এই মন্দিরের অন্যতম উদ্দেশ্য।"

এই বিদ্যামন্দির যদি এই আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করতে পারেন, তবে বাস্তবিকই তাঁরা বাঙ্গালী সমাজের একটা মস্ত উপকার সাধন করবেন। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এদেশে দেখতে পাই বড়ই শোচনীয় এবং স্বাস্থ্য ভিন্ন আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব; চিরকগ্ন শরীর যে নিজের ও পরের কত কষ্টের কারণ, তা বেশি

করে বলা বাহুল্য। আজকাল খুব ছোট ছোট মেয়েদের চোখেও চশমা দেখে দেখে এমন খারাপ লাগে যে কি বলব; আমাদের কালে যেন এমন ছিল না। আর কোন উপলক্ষে কোন স্ত্রীলতার গেলে স্বাস্থ্যশ্রীর অভাব দেখে মন দমে যায়। এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের ব্যায়ামের দিকেও দৃষ্টি দেন আশা করি। ডাক্তার না হয়েও বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে যথোচিত খাদ্য, খেলা ও খোলা বাতাসের উপর স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে, এবং সব সময় যে টাকার উপরেই সুখাদ্য নির্ভর করে তা নয়; সে বিষয় কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা চাই। গৃহের ভালমন্দ ব্যবস্থার উপর অবশ্য ইস্কুলের কোন হাত নেই, তবে এই ইস্কুলটি যে, "প্রচুর বায়ু ও আলোক সমন্বিত উন্মুক্ত স্থানে" স্থাপিত, সেটি সুখের বিষয়।

আশা করি এই বিদ্যামন্দিরের কর্ত্রীদের অধ্যবসায় ও উৎসাহ সার্থক হবে, এবং এখান থেকে শিখে গিয়ে মেয়েরা এমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে যাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হবে, বিরক্ত হবে না। যদি তারা কার্যতঃ দেখাতে পারে যে অশিক্ষার চেয়ে সুশিক্ষার ফল ভাল, তবেই স্ত্রীশিক্ষার প্রগতি হবে; শুধু উপদেশে কাজ হয় না, দৃষ্টান্ত চাই। আমি তো বরাবরই বলি যে, আমাদের শিক্ষিত মেয়েদের উপর এক মস্ত দায়িত্বের ভার রয়েছে, স্ত্রীশিক্ষার সম্মান তাঁদের বজায় রাখতে হবে। এ কথা যেন সর্বদাই তাঁদের মনে থাকে। তবে এতদিন ছেলেদের সঙ্গে ঠিক সমানভাবের শিক্ষা শেষ পর্যন্ত তাঁদের দিয়ে আমরা বোধহয় ভুলপথে গিয়েছি। সে ভুল সংশোধন করার লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। যার যেরকম ভবিষ্যত জীবন হওয়া সম্ভব, তা'কে সেই রকম শিক্ষা দেওয়াই যুক্তির কাজ। আর অধিকাংশ মেয়েকে যে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও মা হতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রতিষ্ঠান যদি সুগৃহিণী ও সুমাতা গড়ে তোলবার কিছু মাত্রও সহায়তা এবং সেই সঙ্গে নিঃসহায় বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তার অন্ন-সংস্থানের সদুপায় করতে পারে তবেই এর জন্ম সার্থক হবে। তাই যেন হয়—এই আশীর্বাদ করি।

———

এক শিক্ষক পরিবার

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

গল্প নয়, কাব্য নয়, সত্য ঘটনা বলছি।

বৈশাখের খরতাপে চারিদিক জ্বলে পুড়ে গেছে, আমরা দুই বন্ধুতে গৌড় দেখে পদব্রজে মালদহ সহরে প্রত্যাবর্তন করছি। উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে ঘুঘু-পাড়ানি ঘুঘু পাখীর সংগীতে মুখর-করা উদাসী প্রান্তরের পাশে চলা পথে চলেছি ঘর্মাক্ত শরীরে দ্রুতগতিতে। থেকে থেকে গরম বাতাস এসে মুখের উপর আছড়ে পড়ছে। দূরে ম্লান কালো ছায়া-ঘেরা রামকেলী গ্রাম—মরুভূমির বুকে মরুদ্যানের মত হাতছানি দিয়ে আমাদের যেন ডাকছে। যতই চলেছি মনে হয় যেন এপথে আর শেষ নাই। তবু চলেছি, বৈশাখের এই আগুনকে উপেক্ষা করে একটু আশ্রয়ের আশায়।

রামকেলীতে এসে পৌঁছালাম। বকুলের উগ্রগন্ধ ভেসে আসছে দুপুরের পাতা-ঝরা বাতাসের সাথে। সম্মুখের বাড়ির রোয়াকে বসে এক বৃদ্ধ হুঁকা টেনে চলেছেন একমনে। আমাদের দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে হুঁকাটি দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে অভ্যর্থনা করলেন।

পথশ্রমে ক্লান্ত অতিথিদের প্রতি গৌড়জনের কোন অভাবই রইল না। বাড়ির ভেতর বারান্দার এক পাশে বসবার জন্য মাদুর পেতে দিলেন, পাখার বাতাসে প্রাণ শীতল হল। এই দুপুরে গৃহকর্ত্রী আমাদের জন্য বিব্রত হয়ে উঠতে পারেন ভেবে তাঁদের অনুমতি নিয়ে নিজেদের সহর থেকে আনা খাবার বাহির করলাম। গৃহকর্তাকে আমাদের সঙ্গে খেতে আমন্ত্রণ জানাতে তিনি আপত্তি জানালেন। অনেক অনুরোধের পর তিনিও আমাদের সাথে খেতে বসলেন। শুনলাম, সন্ধ্যার পরে সহরে যাওয়ার একটা বাস পাওয়া যাবে। আমরা সেই বাসে যাব ঠিক করে খাওয়া শেষে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

তাঁর গৃহটি জীর্ণকুটীর বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরের চালের উপর বড় বড় ছিদ্র। বর্ষার জলে সমস্ত ঘর ভেসে যায়। ঘরের ভিতর কয়েকটি ভাঙ্গা হাঁড়ি কতকাল থেকে যেন অযত্নে পড়ে আছে। বারান্দার অপর প্রান্তে গৃহকর্ত্রী একটি মাদুর বুনছেন। কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় উঠানের বাঁশটার উপর পড়ে আছে। একটি ছোট মেয়ে পাতলা জামা গায়ে দিয়ে মায়ের কাছে বসে অল্প অল্প করে কাঁপছে। জীর্ণ শীর্ণ তার চেহারা। গৃহকর্তা হুঁকা হাতে মেয়েটির কাছে এসে বসলেন। আধ ময়লা পৈতাটা তাঁর কঙ্কালসার বুকের উপর দুলছে। আড় চোখে রান্নাঘরের দিকে কয়েকবার চেয়ে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল।

'ভয় নাই মা, ভাল হয়ে যাবি।'—রুদ্ধ স্বরে আশ্বাসবাণী বললেন পিতা।

গৃহকর্ত্রী মাদুর বোনা বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভাল আর এ জন্মে বাছা আমার হবে না। ভগবান আর কষ্ট না দিয়ে বুকে টেনে নিলেই ভাল। হাড় ক'খানা জ্বলে গেল ঐ পোড়ামুখির জন্য। আজ ক' দিন ধরে লাগা জ্বর, এক কোঁটা ওষুধ পড়েনা মুখে।'

কর্তা যেন আর সহ্য করতে পারলেন না! উঠানে নেমে এসে বাইরের দরজার চৌকাঠ ধরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম আকাশে মেঘ করে এল। প্রথমে নীল, পরে মেঘের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করল। প্রকৃতি চকিত। উঠানের করমচা গাছটাতে

ফুল ফুটেছে। আকাশ ভেঙে প্রবলধারায় বৃষ্টি আসছে। সেদিকে চেয়ে বৃদ্ধ অস্থির হয়ে উঠলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'সে কি আজ আসতে পারবে?'

গৃহকর্ত্রী রান্নাঘরে প্রবেশ করে কয়েকটা মাটীর হাঁড়ি ঝন্ ঝন্ করে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। বোধ হয় কিছু খুঁজে না পেয়ে তিনি উচ্চ হয়ে উঠেছেন। বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। শেষে স্পষ্ট করে বলে উঠলেন, 'এলে আর কি হবে? মরণও হয় না। ঘরে বালি, চাল, সব বাড়ন্ত। রাতে তোমারই বা কি হয় আর মেয়েটার পথ্যে—'

কর্ত্তা বাধা দিয়ে অন্যদিকে আমাদের দিকে চেয়ে জবাব দিলেন, 'চাল বাড়ন্ত কে বললে? তুমি সেই হাঁড়িটা বোধ হয় দেখ নি। আর পথ্যের জন্য ভেব না। আজ ২৬ শে তারিখ। গত মাসের বেতন আজ পিয়ন নিশ্চয়ই আনবে। দেখো, আজ সে আসবে।'

কর্ত্রী বারান্দায় এসে বসলেন। এক বিষণ্ণ মলিনতায় বড়ই করুণ দেখাচ্ছে তাঁকে। তিনি মাদুর বুনতে লাগছেন দ্রুতহস্তে। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'জন্ম ছাই চাকরীর মুখে লাথি মারি, আর আমার এই পোড়া কপালেও লাথি মারু। বাপ খুঁজে পাত্র পায় নি, এই স্কুল পণ্ডিতের সাথে বিয়ে দিয়েছে।'

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃদ্ধ কাশতে কাশতে গলাটা পরিষ্কার করে লজ্জিত মুখে মেয়েটির কাছে এসে বসলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভয় নাই মা, ভাল হয়ে যাবি। পিয়ন টাকা নিয়ে আসবেই।'

মেয়ে বাবার কোলে মাথা রেখে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, 'বৃষ্টি যে এল বাবা। এর ভিতর কি পিয়ন আসতে পারে? আমি দেখো আপনি ভাল হয়ে যাব।'

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল। আমরা বারান্দার এক পাশে গিয়ে কোন রকমে দাঁড়ালাম। গৃহকর্ত্রীর বাদুর খোলা আর হলনা। কপালে করাঘাত করে বললেন, 'মেয়ের এবেলার দাও আর হল না। ভাবলাম বাদুরটা শেষ করে পোস্টী মোড়লের বাড়ি দিয়ে টাকা পাঁচ সিকা আনব তা সবই এই কপাল।'

অসুবিধা হল ঐ মেয়েটিকে নিয়ে। গায়ে জ্বর। ওকে কোথায় রাখা যায়। সমস্ত ঘর বারান্দায় জল পড়ছে। মা তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন। বাবা তাঁর একমাত্র কম্বলটি এনে মেয়েকে ঢেকে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। মেয়ের গর্জনে ঐ দশম-বর্ষীয়া বালিকা ভীত কণ্ঠে বললে, 'মা, ভয় করছে। গায়ে যদি বাজ পড়ে।'

মা মেয়েকে বুকের ভেতর আরও জোরে জড়িয়ে ধরে জবাব দিলেন, 'রাম, রাম কর মা। কোন ভয় নাই।'

একটি সামান্য কথাতে শীতে জড়োই হয়ে সে বললে, 'মাগো বড় শীত। আর যে পারিনা মা।'

বৃদ্ধ পত্নীর দিকে চেয়ে বিমর্ষভাবে বললেন, 'কি হবে গো?

স্ত্রী কপালে করাঘাত করে উত্তর দিলেন, 'আমার কপাল হবে।"

বৃদ্ধ মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভয়ে উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'গরীবের ভগবান নাই গো— ভগবান নাই।'

স্ত্রী তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ভগবানের দোষ দিয়ে কি হবে? সবই আমাদের কর্ম্মের দোষ।'

ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টি থেমে গেল। আষাঢ়ের সন্ধ্যার পরে বাস। সুতরাং আরও কিছু সময় সেখানে কাটাতে হবে। বড়ই অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছি। বসবার উপায় নাই। জলে সমস্ত বারান্দা ভিজে গেছে।

গৃহকর্ত্রী মেয়েকে স্বামীর কাছে রেখে বাড়ির বাহিরে গেলেন। একটি ছেঁড়া আধ ময়লা কাপড়

ও কিছুটা শুকনা খড় নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। খড় বিছিয়ে কাপড়টা পেতে মেয়েকে শুইয়ে দিলেন।

বালিকা ক্ষীণ কণ্ঠে মায়ের গলা জড়িয়ে অতি কষ্টে মুখে হাসি টেনে বললে, 'আজ আর কিছু খাব না মা।'

কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে জননী তার মাথার কুঞ্চিত চুলগুলো আঙুল দিয়ে নেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেশ মা, তাই হবে। এতটা ঠাণ্ডা লাগল; রাতে আর খেয়ে শরীরে রস করে লাভ নাই।'

তারপর কর্তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওগো, মহেশের দোকান থেকে পোয়া সেরেক চাউল আর দুই পয়সার আলু নিয়ে এস। রাতের জন্য চারটি চাউল ফুটিয়ে রাখি।'

গৃহিণী স্বামীর শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় ওঁর শেষ সম্বল পয়সা কয়টি এনে দিলেন। গৃহকর্তা দোকান অভিমুখে রওনা হলেন। স্ত্রী উনুনে হাঁড়ি চাপালেন। হাঁড়িতে জল দিলেন, সেই জলও শুকিয়ে গেল। আবার জল দিলেন, সেই জলও শুকিয়ে গেল। উনুনের উপর থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বসলেন।

ঘণ্টা খানেক পর স্বামী এলেন রিক্ত হস্তে। পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন হতভাগিনী স্ত্রী। বললেন, 'হ্যাঁ গো, এত দেরী করতে হয়? ওদিকে যে অম্বলোকদের বারান্দায় বসিয়ে রেখেছ, ওঁদের মোটরের রাস্তাটা দেখাতে হবে না? বলি, তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে নাকি?'

আমরা এ পাশের বারান্দা থেকে হাঁ হাঁ করে উঠলাম। লজ্জিত কণ্ঠে কি বলতে গিয়ে আর মুখ থেকে কিছু বের হল্যে না। আমাদের বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ভীরু কণ্ঠে শোনা গেল, 'চালটা দাও। তোমার পিত্তি রেঁধে রাখি। সব দিক দিয়েই এই ক্যাত ঠাকুরাণীর বেটীর মরণ। যদি মরলি তো পাঠশালার পণ্ডিতের গলগ্রহ করে রাখলি কেন? হওয়ার সময় গলা টিপে দিতে পারিস্নি?'

আমাদের মাথা যেন নীচু হয়ে আসছে। পড়ি-মরি করে পিছন উঠানে এসে দাঁড়ালাম।

শিক্ষক মশাই শুষ্ক হয়ে উঠানের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। শিক্ষকপত্নী বারান্দার খুঁটিটা ছুলে নিয়ে সম্মুখে একটু এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, 'বলি বোবা, কালা, ছাংড়া তো নও। চালটা একটু এগিয়ে দিতে, কি কথার জবাব দিতে, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?'

এবার শিক্ষক মশায়ের কথায় চমকে উঠলাম। একটি অনুতপ্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওঁর বেদনার্ত হৃদয়ের গভীরতা থেকে। বললেন, 'মহেশ পয়সা কেটে নিল।'

ধপ্ করে আগুন নিভে গেল। কম্পিত কণ্ঠে বললেন পণ্ডিত গৃহিনী, 'তা হলে তোমায় যে উপোস করতে হবে গো! তোমার ঐ ভাঙা হাড় কটা কি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।'—শেষের দিকে বড়ই করুণ শোনাল তাঁর কথাগুলি।

শিক্ষক মশাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে স্ত্রীর একখানা হাত ধরে অতি কোমল কম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন—'বেন্থ—'

কৈশোরের কোন্ এক স্বপ্নভরা নাম ধরে শিক্ষক মশাই ডাকলেন জানি না, কিন্তু ঐ পণ্ডিতকের যুদ্ধের শীর্ণ বুকের উপর মাথা রেখে আজ অনেককাল পরেই বোধ হয় বেহুর দুই গণ্ডদেশ বয়ে ঝরে পড়ল অশ্রু।

অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম। আকাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়

"শ্রীভাসাদেবী"

[লেখকের নিম্ন প্রকাশিতব্য "বেশ বিদেশের শিক্ষা" বইয়ের এক অধ্যায়।—সম্পাদক]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রথা চালু থাকিবার জন্য ঐ ৫৩ point-কে তিন প্রতিষ্ঠান। সেখানে term প্রথা প্রচলিত। ভাগের দুই ভাগে পরিণত করিয়া ৩৬ point সেখানে কেহ যদি ১২০ point সংগ্রহ করিয়া ছাত্রের ভর্তির সময় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্য সাধারণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হইবে। বাকী semester point পড়িতে আসেন তবে তাঁহাকে বিশেষ কোন সুবিধা তাহাকে ঐখানে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দেওয়া হইবে না। তাহার মাত্র ৬৪ point প্রথার ব্যবস্থা সর্বত্র। term point থেকে স্বীকার করা হইবে; বাকী দুই-তৃতীয়াংশ point semester point ও semester point আবার পড়িয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে এক থেকে term point এই ভাবে যোগ বিয়োগ গুণ বিষয়ে সুবিধা সর্বত্র আছে। যেখানে semester ভাগ করিতে হয়। এইভাবে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রথা (১৮ সপ্তাহ) প্রচলিত, সেখানে term-এর থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার ইচ্ছামত (১২ সপ্তাহ) অর্ধেক সময় বেশি পড়ান হয়; সুযোগ সুবিধা পৃথিবীর অন্য দেশেই আছে। অর্থাৎ term-এ semester-এর তৃতীয়াংশ সময় Master ডিগ্রীর জন্য ৩৮ term point বা ৩২ কম পড়িতে হয়। সেইজন্য যেখানে semester semester point জোগাড় করিতে হয়। প্রথা চালু সেখানে term-এর প্রয়োজনীয় কলেজের তত্ত্বাবধানে বা কলেজের অনুমোদিত points-এর এক তৃতীয়াংশ কম point-এর প্রতিষ্ঠানের মারফত শিক্ষামূলক ভ্রমণের যাত্রী হইলে প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্য যে ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্য দুই পয়েন্ট পাওয়া যায়। কলেজে (যেখানে term প্রথা চালু আছে) ১৯৫ points-এর প্রয়োজন হইবে, semester প্রথা চালু থাকিবার জন্য অন্য কলেজে হয়তো ১৩০ point-এর প্রয়োজন হইবে। এই দুই কলেজের points-কে যথাক্রমে term points (বা hours) ও semester points (বা hours) বলা হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে semester প্রথা চালু আছে। কোন ছাত্র যদি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫৪ term point সংগ্রহ করিয়া ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে চায় তবে semester

ছাত্রের আর্থিক চিন্তা না থাকিলে, আংশিক সময়ে কাজ করিতে বাধ্য না হইলে এবং কিছু বুদ্ধি ও খাটিবার ক্ষমতা থাকিলে অনেক সময় চার বৎসরের জায়গায় তিন বৎসরে ব্যাচিলর ডিগ্রী এবং এক বৎসরে Master ডিগ্রী পাওয়া সম্ভব। অনেক কলেজে Ph. D. পড়িবার সময়ই Master ডিগ্রী দেয়। আবার কোন কোন কলেজে Master ডিগ্রী নাই; ব্যাচিলর ডিগ্রী পড়িয়া সোজা Ph.D. পড়িবার ব্যবস্থাও আছে।

Master ও Doctorate (Ph. D., D. Ed.,

P. D., ইত্যাদি) ডিগ্রীর জন্ত যে পাঠ্য বিষয় থাকে তাহাকে Graduate Study বলে। এই দুইয়ের জন্ত অধিকন্তু থীসিস দাখিল করিতে হয়। Master ডিগ্রীর জন্ত নিয়মিত পাঠ্যবিষয় আছেই, Doctorate-এর জন্তও কিছু কিছু পাঠ্যবিষয় পড়িতে হয়। ইহা একটা বৈশিষ্ট্য। কোন কোন কলেজে ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্তও থীসিস দাখিল করিয়া B. Phil. ডিগ্রী পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত affiliated কলেজ নাই, এক জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর থেকে শেষ বৎসর পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। তবে বিভিন্ন নাম, যেমন College of Liberal Arts, College of Liberal Science, College of Medicine, College of Education ইত্যাদি। প্রথমটায় আমাদের দেশের B. A., B. Com., M. A., M. Com., দ্বিতীয়টায় B. Sc., M. Sc., তৃতীয়টায় ডাক্তারী, চতুর্থটায় B. T., B. Ed., M. Ed., পড়ানো হয়। কিন্তু ডিগ্রীর নাম Bachelor বা Master in Arts, অথবা Bachelor বা Master in Science থাকে। Education বা Commerce নিয়া যিনি পাশ করিবেন ডিগ্রীতে তাহার উল্লেখ না হইয়া প্রায়ই Bachelor বা Master in Arts লেখা হয়। অনেক জায়গায় Education বা অন্ত কলা বিভার উপর Science ডিগ্রী পাওয়া যায়। আবার, এই সব ডিগ্রী দিবার জন্ত আমাদের দেশের মতো পৃথক কলেজ থাকে। পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশের কলেজ নিজস্ব ডিগ্রী দিতে পারে না। কারণ, তাহা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বাহিরের পরীক্ষা নিয়া পাশ করা ছাত্রদের ডিগ্রী দিবে। আর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে প্রত্যেক কলেজ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রত্যেক কলেজ পরীক্ষা নিয়া নিজস্ব ডিগ্রী দিতে পারে এবং দিয়াও থাকে। শুধু যার Junior College-গুলি ডিগ্রী দিতে পারে না। M. A. এবং Ph. D. পড়িবার কলেজকে প্রায়ই Graduate School বলে। 'স্কুল' নামের জন্ত কলেজের মান বোঝা যায় না। M. A. এবং Ph. D. ডিগ্রীর জন্ত ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ প্রভৃতি একটি বা দুইটি অতিরিক্ত ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে হয়; ইংরাজীকে মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে M. A.-র জন্ত বিদেশী ছাত্রকে কোথাও কোথাও রেহাই দেওয়া হয়, কিন্তু Ph. D.-র জন্ত রেহাই নাই।

Graduate Studies-এর জন্ত প্রত্যেক কলেজ ছাত্রের কমিটি থাকে, এবং তাহাতে একজন চেয়ারম্যান থাকেন। এই চেয়ারম্যান ছাত্রের থীসিস পরিচালনা করেন। ছাত্র হয়তো অন্ত সকল pointsই সংগ্রহ করিল; কিন্তু থীসিসের মৌখিক পরীক্ষায় সে যতক্ষণ পর্যন্ত পাশ না করিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ডিগ্রী পাইবে না। এই থীসিস টাইপ করিয়া অন্ততঃ দুই কপি দাখিল করিতে হয়। যদি টাইপ করিতে কোন পৃষ্ঠায় দুই তিনটির বেশী ভুল থাকে অথবা কাটাকুটি হয়, তবে সে থীসিস আবার টাইপ করিবার জন্ত হয়তো ফেরত দেওয়া হইবে। এই জন্ত বহু লোক দিয়া টাইপ করাইতে হয়। ডিনাই এক-চতুর্থাংশ কাগজে থীসিস টাইপ করা হয়। প্রতি পৃষ্ঠা টাইপ করিবার খরচ সাধারণতঃ পঁচিশ সেন্ট (আজকালকার একটাকা দুই আনা তিন পয়সা)। Humanities-এ ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্ত থীসিসের পৃষ্ঠার সংখ্যা সাধারণতঃ তিন শ' থেকে চার শ' পৃষ্ঠা পর্যন্ত হয়।

কোথাও কোথাও, যেমন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা থেকে অব্যাহতি দিবার জন্ত কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ধরণের ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়; যথা D. Ed. (Doctor of Education), P. D. (Doctor of Psychology), ইত্যাদি। ইহাতে বিদেশী ভাষা

শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু Ph. D. ইহাদের উপরের ডিগ্রী। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি যে, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, অঙ্ক, শিক্ষা, দর্শন, ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ভাষাকে Humanities বলে। ডক্টরেট বিষয়ে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশেষত্ব এই যে, কলেজ সীমার মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর বাস না করিলে থীসিস দাখিল করিবার যোগ্যতা অর্জন করা যাইবে না। এ বিষয়ে তাহারা বড়ই রক্ষণশীল।

দুই প্রকারের কলেজ আছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত কলেজ ও বেসরকারী কলেজ। এই প্রবন্ধে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত আমি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় একই অর্থে গ্রহণ করিতেছি। পনের বিশ হাজার ছাত্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, যাহা রাজ্য সরকার পরিচালিত, এবং যেখানে Ph. D. শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়েরও কোথাও কোথাও নাম থাকে কলেজ; যেমন মিশিগান স্টেট কলেজ। সাধারণ যে কলেজে Graduate Studies-এর কোন ব্যবস্থা নাই, সে কলেজেও ব্যাচিলর ডিগ্রী দিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ কলেজগুলি প্রায়ই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত (charter institutions)। প্রত্যেক সাধারণ কলেজ নিজেই চার বৎসর পড়াইয়া ডিগ্রী দেয় এবং তাহা প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত হয়। অবশ্য, এক শ্রেণীর কলেজ আছে যাহাকে Junior College বলে। সেখানে Freshman ও Sophomor ক্লাস চালু আছে। তাহা আমাদের দেশের Intermediate College-এর মতো। সেখানকার পড়া শেষ করিয়া Junior এবং Senior পড়িবার জন্য অন্যত্র যাইতে হয়। আমেরিকায় শিক্ষকদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ প্রতিষ্ঠান যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে স্বীকৃতি দিবে, আমেরিকান গভর্নমেন্ট সেগুলিকেও স্বীকার করিবে। ব্যবসা চালাইবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কোন মর্যাদা নাই; তাহারা স্বীকৃতি পায় না। যে সব দেশে বিদেশী ডিগ্রীর মোহ আছে, সেই সব দেশ থেকে টাকা আয় করিবার জন্য ঐ প্রকার কলেজ চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেয়। ডিগ্রীলোভী বিদেশীরা সেই সব ডিগ্রী সংগ্রহ করিয়া ধন্য হয়।

আমাদের দেশে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটিতে নিরক্ষর লোকও সভ্য হইতে পারেন, যদি তিনি মোটা টাকা দান করেন। কায়েমী স্বার্থের লোকজনও সেখানে জুটিয়া সকল অব্যয় হইয়া থাকেন। আমেরিকায় সেটা চলে না। ষ্টেট বোর্ড গভর্নিং বডির কাজ করিয়া থাকে। সভ্যগণ উচ্চ-শিক্ষিত হইবেন। তাঁহারা অন্য কাজ প্রায়ই করিতে করিতে পারেন না, সব সময় কলেজের কাজ নিয়া থাকিতে হয়; অবশ্য এজন্য তাঁহারা বেতন পান। কলেজ ভালো করিয়া চালানোই পরিচালকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য থাকে। কোনও রকম একটা কিছু খাড়া করিয়া তারপর তাহা ভাঙ্গাইয়া খাইব, এ উদ্দেশ্য আমেরিকানদের থাকে না। যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কলেজ চালান, তাহাদের মধ্যে ধর্ম-সম্প্রদায়ই বেশী। সরকারী ও বেসরকারী প্রত্যেক কলেজে দানের পরিমাণ অনেক। ইহার দ্বারা নানাবিধ বৃত্তি দেওয়া হয়। পাশ করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিলে ছাত্র কলেজকে ভুলিয়া যান না। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কলেজকে দান করেন। দান থেকে প্রাপ্ত কলেজগুলির মোট সম্পত্তির মূল্য হাজার কোটি টাকার বেশী। ইহার উপর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বার্ষিক দান আছেই। ছাত্রদের বেতন থেকে কলেজের মোট খরচের এক-চতুর্থাংশের বেশি পাওয়া যায় না।

কলেজ থেকে দূরে হয়তো কোন কোন জায়গায় ছাত্রসংখ্যা কম এবং তাহাদের পক্ষে কলেজে নিয়মিত হাজির হওয়ার অসুবিধা আছে। সেই সব জায়গা কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক সপ্তাহে এক বা

একাধিক বার নিয়া লেকচার দেন। এই লেকচারকে Extension Lecture বলে। নিয়মিত ছাত্রদের পড়াশুনা ও পরীক্ষার সাথে, সেই সব ছাত্রদের পড়াশুনা ও পরীক্ষার কোন পার্থক্য নাই। বলা বাহুল্য, কলেজই Extension Lecture এর ব্যবস্থা করে।

কলেজগুলির মধ্যে রেষারেষি নাই। এক কলেজে হয়তো কোন বই বা সাময়িক পত্রিকা নাই, তাহা অন্য কলেজে আছে। তখন প্রথম কলেজ দ্বিতীয় কলেজ থেকে ধার করিতে পারে। এই ব্যবস্থার নাম Intrr-College অথবা, Inter-University Library Loan System। ছাত্রদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা। ইহাতে ছাত্রদের কোন খরচ নাই। কিন্তু যে সব কলেজে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি সে সব কলেজ এই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক সময় আসিতে চায় না। যে কোন সময় এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে যাইয়া (অবশ্য, নূতন term বা semester-এর আরম্ভে) ভর্তি হওয়া যায়। এজন্য কোন Migration Fee নাই।

স্কুল, কলেজ, অফিস, সপ্তাহে পাঁচ দিন বসে, শনি রবি দুই দিন ছুটি। আর পরবের তিনদিন বাদ দিলে সারা বৎসরে দুই সপ্তাহের বেশি ছুটি থাকে না। কলেজে শনিবারেও দুই চারিটি ক্লাস হয়। যে সব ছাত্র সপ্তাহে পুরা সময় কাজ করে তাহাদের সুবিধার জন্য রাত্রে এবং শনিবারে ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত ছাত্রও সে সব ক্লাসে প্রয়োজন মুবিধা সুবিধা অনুযায়ী course নিয়া পড়িতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশ চল্লিশ মাইল, কখনো বা আরও বেশি দূর থেকে মোটরে চড়িয়া ক্লাস করে। কোন কোন ছাত্রকে আশী নব্বই মাইল দূর থেকে আসিয়া ক্লাস করিতে দেখিয়াছি। দেশের লোক সংখ্যা সতের কোটি, কি তাহার কিছু বেশি। মোটর গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। সুতরাং গড়ে প্রতি তিনজনের একখানা গাড়ী আছে। পুরানো চালু গাড়ী এক শ ডলারেও কিনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলেই গাড়ী কেন কিনিতে পারা যায় তাহার কারণ এই যে সাধারণ কাজে প্রতি ঘণ্টা মজুরি পড়ে এক ডলার, —কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে দুই থেকে চার ডলারও আছে। টাকার প্রয়োজন বোধ হইলেই লোকে কঠিন কাজ করিতে ছোটে।

পাঠ্য বিষয়ঃ—এখন পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। আমাদের দেশের paper-এর পরিবর্তে সেখানে course-প্রথা প্রচলিত। ১০০ থেকে ১৯৯ পর্যন্ত, ২০০ থেকে ২৯৯, ৩০০ থেকে ৩৯৯, ৪০০ থেকে ৪৯৯, ৫০০ থেকে ৫৯৯, ৬০০ থেকে ৬৯৯, এইভাবে প্রতি course-এর আগে নম্বর দিয়া বুলেটীনে ছাপা থাকে। ১০০ নম্বরের course Freshman; ২০০ নম্বরের course, Sophomor ৩০০ নম্বরের course, junior; ৪০০ নম্বরের course, senior; ৫০০ থেকে ৬০০ নম্বরের course গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। কোথাও কোথাও junior ছাত্রগণ ৪০০ নম্বরের course লইতে পারে, কোথাও বা senior ছাত্রগণ ৫০০ নম্বরের course লইতে পারে। কোন কলেজে আবার ৬০০ নম্বরের course নাই। কোন গ্রাজুয়েট ছাত্র হয়ত ৪০০ নম্বরের course লইতে পারে। উচ্চতর সংখ্যার course ক্রমশঃ কঠিন। ১০০ নম্বরের course-এ ঐ কলেজের বিজ্ঞান, কলা ও অন্যান্য যাহা কিছু freshman পাঠের জন্য পাঠ্য, তাহার প্রতি বিষয়ের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে। তাহার প্রতি course-এর পূর্বে ইচ্ছামত নম্বর দিয়া নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। এইভাবে sophomor ও অন্যান্য ক্লাসেরও course-এ নম্বর দেওয়া হয়। হয়তো কোন ছাত্র senior ক্লাসে protestant reformation (৪১৮ নম্বরের course) পড়িবে। কিন্তু

তাহা পড়িবার আগে তাহার পরামর্শদাতা খোঁজ করিয়া দেখিবেন যে ঐ বিষয়ে freshman sophomor বা junior স্তরে ঐ protestant reformation এর সাথে জড়িত নিম্ন স্তরের কোন course ছাত্রটি পড়িয়াছিল কিনা; যদি পড়িয়া থাকে তবেই তাহাকে ঐ course পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সব বিষয়েই এই প্রকার ব্যবস্থা। তবে ছাত্রের কৃতিত্ব বিবেচনা করিয়া অবস্থা ভেদে প্রয়োজন মতে রেহাই দেওয়া হয়।

প্রতি কলেজের পাঠ্য তালিকা বড়ই ব্যাপক। কলেজ বড় হইলে পড়িবার বিষয়ের সংখ্যাও বেশি হয়। কাঠের কাজ, লোহার কাজ, মাটির কাজ, প্লাস্টির কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল কলেজে থাকে এবং তাহাতেও ডিগ্রী পাওয়া যায়। ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্য চার পাঁচ শ' বিভিন্ন বিষয়ের course থেকে পছন্দ মত এবং প্রয়োজনীয় course ছাত্রগণ বাছিয়া লইতে পারে। এত ঐচ্ছিক বিষয় আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না।

পড়িবার নিয়ম

Major ও minor এই দুইভাগে পাঠ্য বিষয় বিভক্ত। ভবিষ্যতে ছাত্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকসংখ্যক course পড়িতে হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে কম পড়িতে হয়। প্রধান পঠিতব্য বিষয়কে major ও অপ্রধান পঠিতব্য বিষয়গুলিকে minor বলে। ইতিহাস major লইয়া ব্যাচিলর ডিগ্রীর জন্য তাহাকে প্রয়োজনীয় points-এর তিন ভাগের একভাগ ইতিহাস লইতে হইবে। বাকী দুই অংশ রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ফরাসী, জার্মান, লাতিন, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা, দর্শন, অঙ্ক, শিক্ষা, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয় থেকে লইলে চলিবে। major ডিগ্রীতে কোন Minor না লইলেও চলে। আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের I. Sc.-র মতো যে সব পাঠ্য বিষয় আছে তাহাদিগকে Pre-law, Pre-medicine, Pre-engineering course বলা হয়। এই course-গুলি শেষ করিবার পর আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পড়িবার কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। এই কলেজগুলি সাধারণতঃ আমাদের দেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের affiliated কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত। বলিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি অঙ্গ, যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের law college। পৃথক স্বয়ং-সম্পূর্ণ কলেজও থাকিতে পারে। কোন স্বয়ং-সম্পূর্ণ মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বা অন্য কলেজ থাকিলে তাহার নিজস্ব ডিগ্রী দিবার ক্ষমতা থাকে।

ভাসাভাসা জ্ঞান লাভের জন্য এক প্রকার পড়িবার ব্যবস্থা আছে তাহাকে Audit বলে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বেতন না দিয়া (অথবা, নামমাত্র বেতন দিয়া) যে কোন বিষয় পড়া যায়। কিন্তু খাতায় ছাত্রের নাম থাকিবে না, তাহার পরীক্ষা হইবে না বা পরীক্ষা দিলেও তাহার কোন রেকর্ড থাকিবে না। ক্লাসে হাজির হওয়া বা না হওয়া ছাত্রের ইচ্ছাধীন। ছাত্রের কিছুটা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও এই প্রকার পড়িবার প্রয়োজন। কোন course পড়িবার জন্য ছাত্রের প্রস্তুতি যদি ভাল না থাকে তবে শিক্ষক ঐ সাথে জড়িত কোন নিম্ন স্তরের course এইভাবে পড়িতে বলিবেন।

ক্লাসে শিক্ষক লেকচার দিয়া যান, ছাত্ররা যতটা পারে কলম চালাইয়া লিখিয়া লয়। ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। এইজন্য প্রতিদিন লিখিবার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে। ফলে পরীক্ষার সময় উত্তর মনে পড়ে এবং কলম চালাইবার সঙ্গে শুদ্ধভাবে উত্তরটি লিখিত হইয়া যায়। Junior এবং Senior ক্লাসে প্রতি term বা semester-এর শেষে প্রতি course-এর আমাদের দেশের মতই পরীক্ষা হয়। কিন্তু ইহার উপর আবার Note

Cards, বা Term Paper, ও Book Report দাখিল করিতে হয়। টাইপ করা কুড়ি থেকে তিরিশ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ খাতার প্রবন্ধকে Term Paper বলে। বিভিন্ন বই ঘাটিয়া এই প্রবন্ধের মালমসলা পোষ্টকার্ড জাতীয় কার্ডে তুলিতে হয়—বিস্তৃত বিবরণ না লিখিয়া সংক্ষিপ্ত অপরিহার্য বিষয়বস্তুর সারাংশ কার্ডে তুলিতে হয়। পরে ঐ কার্ডগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া দেখিয়া দেখিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ বা Term Paper লেখা চলে। শিক্ষকের অনুমোদিত কোন বই পড়িবার পর ক্লাসে বসিয়া সমালোচনা লিখিতে হয়। এইগুলির সাথে কোন কোন শিক্ষক "সেমিনার" ক্লাস নিয়া থাকেন। course যদি ছোট হয়, দুই তিন term points-এর (hours) বেশি যদি না হয়, তবে Note Cards লিখিতে হয়; যদি বড় হয় তবে Term Paper লিখিতে হয়। এই সব বিষয়ে ধরা বাঁধা বেশি নিয়ম নাই। শিক্ষক ইচ্ছা করিলে এই সব নিয়মের ব্যতিক্রমও করিতে পারেন। Freshman এবং Sophomor ক্লাসে Term Paper লিখিতে হয় না; Note Cards প্রায়ই লিখতে হয় না। বিভিন্ন বইয়ের অংশ বিশেষ তুলিয়া-সাইক্লোসটাইল করিয়া কলেজ ছাত্রগণকে বিতরণ করে। ইহাতে যেমন বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় তেমনই পড়িবার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে।

পরীক্ষা:—পরীক্ষা নানা প্রকার। প্রতি term বা semester-এর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনবার পরীক্ষা। আমাদের দেশের মতই তিন ঘণ্টা পরীক্ষা চলে। পরীক্ষার সময় কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে না। কারণ, তাহা বড়ই অসম্মানের বিষয়। অত বড় ঘরে পরীক্ষার সময় হয়তো একজন শিক্ষক বসিয়াছেন, আমাদের দেশের মত invigillation নাই। পরীক্ষার আগে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা suggestion জানিতে যায় না বা পাশ করিবার জন্য কোন ছাত্র খোসামোদ করিবে না। ইহার কারণ নানাবিধ। একটা কারণ, ছাত্রদের আত্মসম্মান বোধ। আর একটা কারণ, যিনি শিক্ষক তিনিই পরীক্ষক। তাহার নিকটে চালাকী খাটে না। আর একটা কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল স্তরে পড়িতে হয়। সুতরাং বিষয়বস্তু আমাদের মত কঠিন মনে হয় না। স্কুল কলেজে সর্বত্র মোটা মোটা বই পড়িতে হয়। এইজন্য পড়িবার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে। আর একটা কারণ, শুধু লিখিত পরীক্ষায় পাশ করিলে চলে না; আরও অন্য প্রকার পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়, যেমন Book Report, Term Paper, Note Cards, ছাত্রের সাথে শিক্ষকের আলাপ ও ছাত্রের ক্ষমতার পরিচয় ইত্যাদি। পরীক্ষার এই সব নিয়ম সকল কলেজে সমান নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অবাধ স্বাধীনতা আছে। Book Report বা Term paper বা Note Cards থেকে কোন ছাত্রকে শিক্ষক রেহাই দিতে পারেন। পরীক্ষার নীচের ক্লাসে Objective Test এবং উপরের ক্লাসে রচনামূলক প্রশ্ন এবং ছোট ছোট উত্তরের প্রশ্ন বেশি থাকে।

ছাত্রের সকল প্রকার পরীক্ষার ফল বিচার করিয়া শিক্ষক তিনটি পরীক্ষার শেষে প্রতি course-এর শেষ Grade দিয়া থাকেন। Grade ও প্রতি course-এর point সংখ্যা কলেজের অফিসে বড় কার্ডে লিখিত হইয়া জমা থাকে। তাহা থেকে কোটা তুলিয়া প্রতি ছাত্রকে প্রতি term বা semester-এর শেষে Photostat Copy বিনামূল্যে দেওয়া হয়। অন্য কলেজে বা কোন প্রতিষ্ঠানে কলেজের পাঠ্য বিষয় এবং পরীক্ষার ফল দেখাইবার জন্য ঐ Photostat Copy বিনামূল্যে জমা দিয়া কলেজের অফিস থেকে সরাসরি পাঠাইতে হয়। বোধ হয়, যাহাতে জাল না হইতে পারে তাহার জন্য এই ব্যবস্থা। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি, ছাত্রের কোন

শিক্ষকের নিকট থেকে প্রয়োজন মতো সার্টিফিকেট লইতে হয় আমাদের দেশের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সার্টিফিকেট লইবার বা দাখিল করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার কারণ এই যে, যিনি ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবেন একমাত্র তিনিই ছাত্রের ক্ষমতা বা গুণ বিচার করিতে পারেন, আর কেহ নয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যাহারা M. A. বা M. S. (অর্থাৎ M. Sc.) এবং Ph. D. পরীক্ষা দিবেন, তাহাদিগকে অবশ্যই থীসিস দাখিল করিতে হইবে। M. S. ডিগ্রীর বিষয় বলিতে শুধু Chemistry, Physics, প্রভৃতি বিজ্ঞান বুঝায় না, Economics Education প্রভৃতিও বুঝায়। অনেক কলেজে Bachelor ডিগ্রীর জন্য Thesis লিখিতে হয়। M. A., B. A., না লিখিয়া কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে A. M., A. B., ডিগ্রী দেওয়া হয়।

M. A. বা Ph. D. পরীক্ষার জন্য থীসিসের মৌখিক পরীক্ষায় পাশ না করিলে পরীক্ষার্থী ডিগ্রী পাইবেন না। এই মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষকের সংখ্যা চার পাঁচ জন বা আরও বেশি হইতে পারে। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়া ছাত্রকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন বিভাগ থেকে আসেন। ছাত্র হয়তো ইতিহাসে থীসিস লিখিয়াছেন। মৌখিক পরীক্ষার সময় ইংরাজী বিভাগ থেকে একজন অধ্যাপক ঐ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। এই সময় অন্যান্য কোর্সের উপরও ইচ্ছা করিলে পরীক্ষার্থীর শিক্ষকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ছাত্রের জড়তা কাটাইবার জন্য এবং ছাত্র বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কোথাও কোথাও নিজেকে উঁহার আসনে ছাত্রকে বসাইয়া তিনি নিজে ছাত্রের আসনে বসেন। ছাত্র লিখিত Note Cards পড়িয়া যায়; শিক্ষক তখন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

My English Course. Book 1, by Abalya Chari, M. A. M. Ed (Illinois). Orient Longmans, 1960 Re 1. 15.

দিল্লীর পাঠক্রম অনুসারে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইংরাজী বিদেশী ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া, ইংরাজী ভাষার মোটামুটি গঠনের যাহাতে জ্ঞান লাভ করা যায় এই উদ্দেশ্যে পুস্তকের রচনা। মৌখিক অভ্যাস দ্বারা, অর্থাৎ কানের সাহায্য সর্বপ্রথম লইয়া, প্রথমে বলা, পরে চোখের সাহায্যে অর্থাৎ পড়া বা লেখা শেখানো হইয়াছে। নানা দ্রব্য চোখের সামনে রাখিয়া অর্থাৎ ছবি দিয়া শেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ সকল নীতিই প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

দিল্লীর পাঠক্রম। সুতরাং ছবি, মানুষের, ছেলে-মেয়েদের চেহারা ও পোষাকপরিচ্ছদ দিল্লী-মার্কা তো হইবেই। কিন্তু Sarla না হইয়া সরলা Saralo হইলেই ঠিক হইত না কি? তা ছাড়া সংকেতেরও একটা দীমা আছে—He's fat, It's a short pencil—ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রূপ কি প্রথম শিক্ষার্থীদের সামনে ধরা উচিত? এসব রূপ বহুদিন পরে না করিয়া আমাদের সময়ে ধরানো হইত না, এবং তাহা সঙ্গতই হইত বলিয়া এখনও মনে হয়। ১১পৃঃ (D) একটি মারাত্মক ভুল আছে, My tenth letter is o না হইয়া d হইবে। ৩৭ পাঠের সঙ্গে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি প্রকারে বা কোন যুক্তিতে দেওয়া হইল তাহা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই। শব্দতালিকা, অন্তত দুই জায়গায়, ঠিক বর্ণানুক্রমিক হয় নাই। has had have এবং window will দেখিতে বলি।

অথচ চিত্রবাহুল্যে ও মুদ্রণপারিপাট্যে বইখানি ভারি সুন্দর হইয়াছে। প্রচ্ছদপটও ভারি সুন্দর। বিদ্যালয়ে পড়াইবার মত বই, ছেলেমেয়েরা পড়িতে পড়িতে রং দিতেও পারে। প্রকাশকেরা লিখিয়াছেন, দুইশত বিরাশি খানি ছবি আছে। ইহা বড় সামান্য কথা নয়।

উপরে যে পাঁচ ছয়টি ত্রুটির উল্লেখ করিলাম, সামান্য মন দিলেই সেগুলি এড়ানো যাইত। তাহাতে পুস্তকখানির উপযোগিতাও বাড়িত।

CALCUTTA UNIVERSITY

শিক্ষা

মা হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬৭ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

শারদীয় উৎসব

এবার শারদোৎসব আশ্বিনের প্রথমভাগে আসিয়া পড়িল। বর্ষার বারিপাতে প্রকৃতি এখনও প্রচুর ভাবে স্নানান্তের পর স্নিগ্ধমূর্তি। শরতের ঝলমল সৌন্দর্য এখনও তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। সুজলা বসুন্ধরা এবার তবে শস্যশ্যামলা হইয়া জীবনদাত্রী হইবেন, অন্তরে কামনা করি। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তো আউসধান্য বিগত হইয়াছে এবং গত পনের বৎসরের মধ্যে এমন হয় নাই বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। অন্যান্য স্থানেরও কি এইরূপ সংবাদ শুনিতে পাইব না? অবশ্য ফলেন পরিচীয়তে—ধান পাকিবে, ফসল ঘামারে উঠিবে—ইহার মধ্যে মহামায়ার সদা প্রসন্ন রূপ দেখিতে পাইব, প্রার্থনা করি। অন্নের উপর অন্য সকল বস্তুর মত শিক্ষারও যে নির্ভর।

গ্রাহক ও পাঠকেরা যখন এই সংখ্যা পাইবেন তখন বিজয়া দশমীর সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা এবার নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ঠিক মাসে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি বলিয়া সানন্দচিত্তে সকলকে বিজয়াসম্ভাষণ জানাই।

"নিজেরা ভাবতে শেখ"

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্রাবাস-পূর্তি শাখা-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছাত্রদের উপদেশ দিয়া কিছু বলেন। গণতান্ত্রিক আদর্শে নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে গেলে নিজে নিজে ভাবিতে হইবে, দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতাদের বুকনিতে ভুলিলে চলিবে না। অনেক স্থলেই দেখা যায়, ছাত্রেরা ভারতবর্ষের উদার আদর্শের কথা ভুলিয়া শুধু এমন কাজ করিয়া চলে যাহার সহিত তাহাদের জাতীয় জীবনধারার কোন সম্পর্ক নাই। জনতার মধ্যে কোনও এক ছাত্রকে রাখিয়া দেখ, সে আর নিজে ভাবনা চিন্তা করিবে না। প্রাদেশিকতার বা খণ্ড স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিয়া ভারতের অখণ্ডতা উপলব্ধি করা চাই, এবং সেজন্য প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিও বিকশিত হওয়া চাই। নতুবা ভুয়া নেতাদের হাতে পড়িয়া অধোগতি অনিবার্য। তাই অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন তাঁহার দীর্ঘ

জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার বলে ছাত্রদের বলিয়াছেন, "নিজেরা ভাবতে শেখ।"

কলিকাতায় নিবেদিতা ঘাট স্ট্রীটে শ্যামবাজার বিদ্যালয়েও ইহার পূর্বদিন অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন এই কথাই বলিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রের কথাই ভাবিতে হইবে।

মনে পড়ে উপনিষদের সেই বাণী, যাহা সর্বদা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নব নব রূপে উচ্চারিত হইত—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'।

সংহতি—কিন্তু কোন পথে?

গত ১১ই সেপ্টেম্বর নূতন দিল্লীতে প্ল্যানিং-এর উপযোগী ধারা আহূত এক সম্মেলনে ঐ একই চিন্তা সকলের মনে, ভারতের সংহতি রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোন পথে? সকলেই চাহিতেছেন, শিক্ষককে বা শিক্ষাকে এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না, শিক্ষার মাধ্যমেই এই বোধ জাগ্রত করিতে হইবে। কি করিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা যায়, শিক্ষার সেই রূপায়ণের জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া সম্মেলনের সুচিন্তিত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিব।

যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্প

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক (বুনিয়াদি) ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পশিক্ষা নীতিগত-ভাবে স্থান পাইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা কার্যকরী করিতে হইলে শিক্ষাশিল্পের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং শিক্ষকের শিল্পজ্ঞান অর্জনের পথ ও বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষাশিল্পের প্রগতি সম্পর্কেও আলোচনা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের শিক্ষাশিল্পের প্রগতি সম্পর্কে এখানে সামান্য আলোচনা করা হইতেছে।

যুদ্ধোত্তর যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষাশিল্প সম্পর্কে যে সকল মতবাদ ও নীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহা যুদ্ধজনিত সংঘাতের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই পরিবর্তন কতখানি গভীর, তাহার বর্ণনা আমরা British Education নামক গ্রন্থে পাই:

In the United Kingdom profoundly important developments in every field of education took place or were set in motion as a result of the second world war. The need for increased food production greatly encouraged school gardening, and through keeping live-stock, the work of the numerous schools began to revolve around the school 'farm' which provided abundant matter for class-room study as well as outdoor activity. Children were released for limited perids to help farmers to prepare and harvest the crops. Evacuated children learned to launder and darn their clothes .....cook their meal, practise local handicrafts, make local surveys and study local life in all its aspects.—Dent.

যুক্তরাজ্য ডেমোক্রেটিক দেশ। সে দেশের অধিবাসী নিষ্ঠার সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করে, তাহা রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট; সেজন্য সে

দেশের দলীয় রাজনীতি কখনই সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করে না। সমাজের সকল ছেলেমেয়ে এক ধাঁচে গড়িয়া উঠুক, তাহা ইংলণ্ডের লোকেরা কখনই কামনা করে না। একনায়কত্বের কুফল সম্পর্কে সে দেশের অধিবাসী সদা জাগ্রত। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তির রুচি ও কর্মক্ষমতার স্বাধীন বিকাশ শিল্প-শিক্ষার মাধ্যমে হয়, পরবর্তী জীবনের কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের সহায়তা করে—এই সত্য অর্ধশতাব্দী পূর্বেই সে দেশের শিক্ষাবিদেরা বুঝিয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি একাধিকবার সে দেশের বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষাদান পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যুদ্ধের পরে ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'ফেলো'রূপে আবার সে দেশের বহু বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিশ্বাসী যুক্তরাজ্যে বহু প্রকার বে-সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টাও চলিতেছে।

রাষ্ট্রপরিচালিত সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুল, প্রামার স্কুল, আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একাধিক প্রকারের শিল্প শেখান হইয়া থাকে। শিল্পসমূহের মধ্যে কাঠের কাজ একটি বিশেষ স্থান জুড়িয়া আছে। কাঠের কাজ সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুলের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রামার স্কুলেও কাঠের কাজ শেখান হইয়া থাকে কিন্তু মডার্ণ স্কুলে শিল্প শিক্ষার জন্য যত সময় দেওয়া হয়, প্রামার স্কুলে ততখানি দেওয়া সম্ভব হয় না। উপরন্তু সে দেশে সেকেণ্ডারী টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে আর টেকনিক্যাল স্কুলের শিল্পশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও পৃথক, ছাত্রেরা সেখানে অনেকটা পেশাদারী শিল্প শিখিবার সুযোগ পায়। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে যে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শিক্ষামৌলিক। ছাত্রদের জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য।

আধুনিক ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শিক্ষাবিভাগ হইতে ঠিক করিয়া দেওয়া হয় না। যুদ্ধের পূর্বে শিক্ষা-শিল্প সম্পর্কে যে সকল সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে আজ অনেকেই সন্দিহান। এখন শুধু বিষয় (curriculium) স্থির করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি অন্যভাবে নির্ধারিত হয়, নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করা আর হয় না। শিক্ষক-সম্মিলনীর ও ইনস্‌পেক্টরদের সভায় শিল্প শিক্ষাদান সম্পর্কে ঘন ঘন আলোচনা করা হয় এবং এই সকল সভায় শিল্পশিক্ষানীতি ও পদ্ধতি স্থির করা হয়। এইভাবে শিক্ষাশিল্পকে প্রগতিশীল রাখা হয়।

এগার হইতে পনের বা ষোল বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের কাঠের কাজ শিক্ষা-পদ্ধতি উপরোক্ত উপায়ে স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু তাহা কার্যকরী করিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকে।

(ক) গৃহের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কাঠের কাজ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। বিদ্যালয়ে এরূপ কাজের চর্চার ফলে বিদ্যার্থীরা পরবর্তী জীবনে কারিগর হইতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়।

(খ) আসবাবপত্র ভিন্ন অন্য বহু রকমের কাঠের কাজও শেখান হয়। গৃহস্থালী ও ক্ষেতখামারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সম্ভবমত শেখান হয়।

(গ) তা ছাড়া বহুবিধ খেলনা, নৌকা, এরোপ্লেন জাহাজ প্রভৃতির প্রতিকৃতিও করান হইয়া থাকে।

কাঠের কাজের ক্লাশে শিল্পপ্রকরণগুলি অর্থাৎ কাজের টেকনিক সযত্নে শেখানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষকসাধারণ সকলেই একমত এবং কতকগুলি অনুশীলন বা পাঠের মাধ্যমে টেকনিক-গুলি প্রথমে শেখান হইয়া থাকে। কিন্তু সযত্নে টেকনিক শিখাইবার জন্য নির্দিষ্ট পাঠপ্রণালীর বিপরীত মত ও যুক্তি আছে—যেমন এভাবে প্রকরণ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সৃজন শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আবার অন্য পক্ষে বিচার্য এই যে, এগার বারো বৎসর বয়সে যখন বিদ্যার্থীরা

কাঠের কাজ শিখিতে আরম্ভ করে তখন প্রথমে যন্ত্র চালনা আয়ত্ত না করিয়া স্বাধীনভাবে কিছু করিতে গেলেই ব্যর্থতায় হয়। এই ব্যর্থতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রথমে অনুশীলন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। একবার যন্ত্র চালনা আয়ত্ত করিতে পারিলে ক্রমশঃ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ সার্থক হইয়া উঠে।

যে সকল বিদ্যার্থী শিল্পকাজে অপারগ, তাহাদের শিল্পশিক্ষার জন্য অবস্থানুসারে পৃথক শিক্ষার প্রোগ্রাম করা হয়। শিক্ষকেরাই সেই প্রোগ্রাম স্থির করেন, সেইভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন শিক্ষক পরীক্ষামূলক নূতন ধরণের প্রোগ্রাম করিলে তাঁহাকে এজন্য উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়া হয়। বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমার আলোচনা হইয়াছে, ফলে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে সাহসের সঙ্গে পরীক্ষামূলক প্রোগ্রাম করিতে পারেন, এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা খুব বেশী নহে।

আসবাব পত্রের কাজ শিখাইবার সময় ডিজাইন সম্পর্কে শিক্ষক সতর্ক থাকেন যাহাতে বিদ্যার্থীর আকারবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান বিকশিত হইতে পারে। শিল্পশিক্ষকের ডিজাইনের জ্ঞান থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মৌলিক ডিজাইনারের সংখ্যা কোন দেশেই অসংখ্য হয় না। বিদ্যার্থীরা নিজে মৌলিক ডিজাইন করিয়া তাহার রূপ দিবে তাহা আশা করা যায় না; সেজন্য ডিজাইন দেওয়া হয়। কিন্তু কেহ মৌলিক ডিজাইন করিতে সমর্থ হইলে শিক্ষক উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিভিন্ন ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্যবোধ যাহাতে বিদ্যার্থীর জন্মে সেজন্য উচ্চাঙ্গের শিল্প কাজ, ইহাদের ডিজাইন ও ছবি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু পনেরো বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ডিজাইন সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের দৃষ্টি খোলে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আজকাল বিশেষ খেয়াল রাখা হয়—যাহাতে শিল্প-চর্চায় বিদ্যার্থীদের আত্মনির্ভরশীলতা ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাইতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে শিল্পশিক্ষকগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষাকার্য পরিচালনা করিতেন এবং ক্লাশের কাজের ফল ভাল করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু অতিরিক্ত শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে পরে বিদ্যার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ করিতে সাহস পাইত না। এই ত্রুটি নিবারণ করে এখন শিল্পচর্চায় আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পূর্বে ড্রইং বা অঙ্কন সম্পর্কে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাও রূপান্তর লাভ করিয়াছে। প্রথমে অঙ্কন দেখিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অঙ্কন বুঝিতে পারিলে পরে অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে দেশে শিল্প কাজের রেকর্ড রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বর্তমানে ইংলণ্ডে শিল্পশিক্ষক ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা একরূপ। শিল্প যে অন্যান্য বিষয়ের মত শিক্ষণীয় এই সত্য সেই দেশের অধিবাসী ও শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণ স্বীকার করেন।

আদর্শ শিক্ষা

শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক

আজ একথা স্পষ্ট যে প্রাচীনের চিন্তাধারার সঙ্গে নবীনের চিন্তাধারার মিল হয় না। সামান্য একটি উদাহরণ দিই। আগের দিনের বধূরা ঘোমটা দিতেন, সন্ধ্যায় মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতেন। আজ নারী প্রগতির যুগে ঘোমটা দেওয়ার বা সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রণামের বালাই সহরে অন্ততঃ একরকম অজ্ঞাত।

এই যুগ পরিবর্তনের দিনে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে জাগে—নারীর, বিশেষতঃ বঙ্গনারীর, স্থান কোথায়? ঘরের কোণে, না কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে? স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি? এই নবীনের যুগে প্রাচীনের বৈশিষ্ট্য কি একেবারেই লুপ্ত করার প্রয়োজন আছে? সত্যকথা, বাংলার নারীর মনে আজ জাগরণ এসেছে, তার সুপ্ত চেতনাকে আজ বিকশিত করে তুলতে হবে, বঙ্গনারীকে আজ কেবল রান্না ঘরে ও সন্তান পালনের জন্য ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখা চলবে না। ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে এলেই যে নারীর দেহমনের শুচিতা নষ্ট হবে, এ ভ্রান্ত ধারণাও ত্যাগ করতে হবে। অন্যান্য দেশের নারীরা এগিয়ে গেছেন শুধু শিক্ষার জোরে; শিক্ষাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

তাই বাংলার মা-বোনেদের সকলের পক্ষে শিক্ষা যাতে সুগম হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে চাই চর্চা, অভ্যাস, সাধনা। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে যদি তার চর্চা না রাখা যায় তবে সে শিক্ষা হবে অপচয় অর্থাৎ বাতিল। ফলে মা নিজের সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারবেন না, আর পিতার সময়ের অভাবের জন্য রাখতে হবে গৃহশিক্ষক। এখনও দেশের শত শত বালিকার পক্ষে শিক্ষার এই অপচয়ের প্রশ্ন প্রযোজ্য। এতে ক্ষতি কার? দেশের ও দশের। জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি এর সঙ্গে জড়িত, আর সময়ের অপব্যবহার তো বটেই! তাই শিক্ষার রাখতে হবে চর্চা, করতে হবে জীবন ভরে সাধনা।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান তালে চলতে হলে বঙ্গনারীকে করতে হবে সাধনা। তবে বিদেশী সভ্যতার 'কু'-কে অনুকরণ করে নিজেকে শিক্ষিতা ভাবলে চলবে না—যে শিক্ষার ফল ঘরে বাইরে যথেচ্ছাচার, সে শিক্ষা আদর্শ শিক্ষা নয়।

বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীসারদা দেবী স্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বালিকাদের পক্ষে আদর্শ শিক্ষা কি, তা চিন্তা করার আমার আরও সুযোগ হয়েছে। বিদেশী শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুকরণে আমাদের প্রয়োজন নেই, তবে উচ্চ শিক্ষা ও দেশ কাল অনুযায়ী সৎ শিক্ষা পেলে সত্যিকারের জ্ঞানলাভ হবে, তখন শিক্ষার কলুষ সকল আপনা থেকেই দূর হবে। বিদেশী শিক্ষার মধ্যে সময়ের সদ্ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা বা discipline ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। কোন জাতি এ সকল শিক্ষা বিনা বড় হতে পারে না। নারী হোল সমাজের অর্ধাংশ, তাই নারীকে অশিক্ষিত রাখাও চলতে পারে না। "সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ" ইহা শাস্ত্রবাক্য, কিন্তু অশিক্ষিতা নারীর নিকট ধর্মের মন্ত্র-সকল অর্থহীন। অথচ এই দেশেই আর্যনারীর ছিল বেদপাঠে অধিকার, পরে অধিকার মাত্র তো সামান্য কথা, আর্যনারীরা যে সকল বেদ মন্ত্র রচনা করে গিয়েছেন তা আজও ধ্বনিত হচ্ছে, উচ্চারিত হচ্ছে পুণ্যকামীদের মুখে মুখে। এই ভারতের নারী

ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার দর্শন জ্যোতিষ রাজনীতি এমন কি যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন, দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছেন। এই সকল কীর্তিকাহিনী কি আমরা ভুলে যেতে বসেছি?

নারী বহুরূপিণী; সে ভার্যা, সে মাতা, সে ভগিনী, আবার সে কন্যা। সেবাব্রতা নারী কেবল গৃহ-সেবায় আত্মনিয়োগ না করে কর্মজগতেও স্থান করে নিয়েছে। আতিথ্য ও গৃহসেবার প্রাচীন সংস্কারটি বজায় রেখে যে রমণী দেশের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন তিনিই ধন্যা। প্রাচীন ও নবীনের এই যথার্থ সমাবেশেই আদর্শ শিক্ষার রূপ।

বঙ্কিমের যুগে স্ত্রীশিক্ষার যে অভাব ছিল তার প্রতিকারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে তারা বিধবা হবে এ ধারণা সেকালে ছিল, এখন গ্রামেও মেয়েদের অনেক স্কুল হয়েছে। সেকালে জমিদারদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভালই জানতেন। আহারান্তে কোন একটি বধূর রামায়ণ মহাভারত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের নানাবিধ সূচীশিল্পে সময় নিয়োগের প্রচলন অধিকাংশ ঘরেই ছিল। বাংলার রাণী ভবানী, ইন্দ্রী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামসুন্দরী ব্রাহ্মণীর দর্শন ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির কথা লিখিত সমাজের অপরিচিত নয়; তবু মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার প্রাধান্য অস্বীকার করলে চলবে না। নিরক্ষর হলেও সুন্দর সুন্দর কাঁথা তৈরী, নকশি, পোলা প্রভৃতি দিয়ে নানা রকম খেলনা, কুমড়া দিয়ে চাঁপা ফুল তৈরী, ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য মাখন বা ছানা দিয়ে মাছ হাঁস বা প্রজাপতি প্রভৃতি গড়া, সুতা কাটা, পৈতা তৈরী, বেতের চুপড়ি বোনা, সুন্দর সুন্দর আলপনা দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা, এই সব ছিল নারীর ধর্ম ও কর্ম। ঘরে মিলে ভাই ও স্বামী-পুত্রের শুভ কামনা করে মেয়েরা যে "ব্রত" পালন করতেন তা এনে দিত প্রাণে আনন্দ, মনে মাধুর্য। আলপনার মধ্যে যে শিল্পসৃষ্টির আনন্দ ছিল, তা ধর্ম-প্রবৃত্তির চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। বাংলার এই চিত্রের আর সঙ্গীতের, শিল্পের ও সহজ কবিত্বের জন্যই ছিল আদর্শ। এই ছড়া ও আলপনা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাংলার মা বোনেরা কি আজ এসব ভুলে যাবেন?

ভারতের নারীর সৌন্দর্য জ্ঞান, তার ধর্মজ্ঞান আজও বিশ্বের সামনে তাকে বরেণ্য করে রেখেছে, অথচ আজকের দিনের সমস্যা "স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সমীচীন কিনা"!

সেকালে বালিকারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়নি, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে, পোস্তোর রাজবাটীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, শিক্ষিকা ছিলেন সেই বৈষ্ণব ঠাকুরাণী। ক্রমশ অন্তঃপুরে পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত, ও বিদেশিনী মেম ইংরাজী শিক্ষার ভার পান। সেকালের সমাজে বিবাহাদি উপলক্ষে মৃতা গীতের চলন থাকলেও তা ছিল একান্তই অন্তঃপুরের বিষয়, আজকের দিনে সহরে সহরে মৃতা গীতের স্কুল দেখা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে শীলতা ও শোভনতা যুক্ত বেথুনের প্রতিও প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁর পুত্র-বধূ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মা, বোম্বাই থেকে গুর্জর মহিলার বেশ অনুকরণে দেশে ফিরলে মহর্ষির এ বিষয়ে ক্ষোভ মেটে। আজকের দিনে বিদেশীর অনুকরণের সাজসজ্জা থেকে সে যুগের সাজসজ্জার কত প্রভেদ।

সেকালে মিশনরীরা যখন মেয়েদের স্কুল খোলেন তখন বাংলা লেখাপড়া ও সেলাই শেখানো হতো, ক্রমশ বাইবেল পাঠ, অভিধান মুখস্থ ও গণিত, শিক্ষার অঙ্গ হল। স্কুলে জাতিভেদ ছিল না, সকলে এক সঙ্গে পড়ত, এমন কি একটি মিশন স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা এক সঙ্গে পরীক্ষাও দিয়েছে। বাংলার মাধ্যমে এবং অবৈতনিক শিক্ষাই তখনকার বালিকারা পেয়েছে, আর প্রাইজ পেয়েছে সিকি, আধুলি, বড়লোকের সাড়ী।

ক্রমশঃ নীতিকথা ও ভূগোল পাঠ্য হলেও ইংরাজির চলন হয়নি। অতএব মিশনরীদের কাছে আমরা বাংলা ভাষা প্রচারের জন্য ঋণী।

চিরকুমার বেথুন যখন উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদের জন্য স্কুল খুললেন, তখন ঐ স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে অনেকেরই আর আপত্তি রইল না। ব্রাহ্মসমাজের সেতা কেশবচন্দ্রও স্কুল খুললেন, আজ তারই নাম ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউসন। প্রায় এক শত বৎসর আগে ডফ্ সাহেব শিক্ষিকাদের ট্রেনিং-এর জন্য যে স্কুল খোলেন এখন তার নাম স্কটিশ কলেজ, আর রাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্যে মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার ব্যবস্থাও হয়। তথাপি যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষিকা ও লেডী ডাক্তারের অভাব এখনও রয়ে গেছে। শুনেছি ক্যালিফোর্নিয়াতে নাকি এম্ এ. পাশ না করলে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকাও হওয়া যায় না! এর তুলনায় এখনও আমরা কত পিছিয়ে আছি। একটি সুশিক্ষিতা বালিকা সমগ্র পরিবারের তথা জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে, এ নিশ্চিত। এখন সেই শিক্ষার কি আদর্শ হবে, তাই ভাববার কথা। ছাত্রীরা ছাত্রদের সমান সমান বিদ্যা শিখবে কিনা, স্কুলে রান্না ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা, বিবেচ্য। শিক্ষার মাধ্যমে কি হবে, শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন অতি গুরুতর হলে মাতাপিতার পক্ষে অর্থব্যয় কষ্টসাধ্য হবে, সকল বালিকার শিক্ষা-লাভের সুযোগ হবে কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয় সুচিন্তার দ্বারা স্থির করতে হবে। গত শতাব্দীতে যে সকল বঙ্গনারী সাহিত্যসেবা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন, তাঁদের সংখ্যা সামান্য। আজ বিংশ শতাব্দীতে বহু নারী যে সকল পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে কি আদর্শ রেখে যাবেন এ সবও ভেবে দেখার মতন কথা।

অধুনা দৈহিক প্রতিযোগিতায়, এমন কি ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ায়, বঙ্গনারী পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের প্রধান শিক্ষিকা রাখা চলবে না বলে সম্প্রতি বোর্ডে এক অভিযোগ দাখিল হয়েছে। প্রায় সব সভ্যদেশেই শিক্ষাবিভাগের অধিকাংশ পদ মেয়েদের দখলে, এদেশে কেন তার ব্যতিক্রম হবে? অবশ্য ঘরের কাজ বাতিল করে মেয়েরা যদি কেবল পুরুষের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলে, তাতে সমাজের অমঙ্গলই হবে। প্রকৃতিকে একেবারে অস্বীকার করলে তার ফল শুভ হয় না। নিত্য-নূতন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষিকাদেরও নূতনভাবে শিক্ষা লাভ করে প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। দেখা যায়, পাঠ্য-তালিকানুযায়ী শুধু স্কুলের পড়ানোতে পরীক্ষা পাশ করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ পাঠ্যতালিকা শেষ করতে গৃহ-শিক্ষক রাখা কয়জনের পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া সারাদিন খাটুনির পর সেই গৃহ-শিক্ষকেরা কতটুকু যত্ন করে শিক্ষা দিতে পারে? অতএব স্কুলেই যাতে ভালকরে সব বিষয়ে পড়ান হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থার মূলে আছে "স্কুল সিলেবাস"। একটি ক্লাস VI-এর ছাত্রীর ঘাড়ে যদি ৪টি ভাষা চাপান যায় যথা, ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী, তবে তার কি অবস্থা হয় ভাববার কথা। ৮।১০ বৎসর বয়সের বালিকার গ্রহণের ক্ষমতা কতটুকু? অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে ইংরাজী পাঠ্য-তালিকাভুক্ত বলে আর উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজি হওয়াতে পরীক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে যুক্তির চর্চা না করে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির পরীক্ষা দিত।

এই ভাবে মাতৃ ভাষার কদর গেল কমে, শিক্ষণীয় বিষয় হল দুর্বোধ্য। এত দিন পরে শিক্ষা বিভাগের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়েছে। ফলে নূতন ক্লাস XI-এর পাঠ্যবিষয় যুক্তি বিদ্যা বা ইংরাজী প্রকৃতির প্রশ্নের উত্তর যাতে পুঁথিগত না হয় তার চেষ্টা চলেছে। বাইরের খবরাখবর রাখা অপরিহার্য হয়েছে। চাকরী পেতে হলে, সম্প্রতি একটি যেমন ঘটনা ঘটেছে, যথা "নেপালের রাজধানী কি?" তার

উত্তর 'তুপাস'—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান ভবিষ্যতে আশা করা যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এর ফল শুভ হবে নিশ্চয়। জাতির বেকার সমস্যা দূর করতে হাতে কলমে শিক্ষা বা বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ যন্ত্রের যুগে যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মশিক্ষার কোন স্থান এতে রইল না। প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে এ যুগের বিরোধ ঘটেছে, মানুষ জড়জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। "আত্মানং বিদ্ধি"র নির্দেশ আমরা ভুলতে বসেছি, এও ভাববার বিষয়।

প্রাচীন 'অব্যবহৃত' ভাষাশিক্ষায় হয়তো শিক্ষার অপচয় হয়, পরবর্তী জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, প্রাচীন ভাষার দ্বারা তার সমাধানের সাহায্য হবে না; তবু এও সত্য যে কার্যকরী শিক্ষার ন্যায় সাহিত্যেরও মূল্য আছে, বিজ্ঞানের ন্যায় সাহিত্যের জ্ঞানও কল্পনা-শক্তি বাড়ায়। ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ভাল ফল দেখালেও দেহগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অস্বীকার করা চলে না। তাই পাঠ্য বিষয়ে পার্থক্য বিজ্ঞান, সেবা-শুশ্রূষা, ও শিল্প, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি থাকা উচিত। সুখের বিষয় বর্তমানে ছাত্রীরা Class XI পরীক্ষায় Home Science বা ঐচ্ছিক গণিত ইচ্ছামত নিতে পারে। ইহাতে ছাত্রীদের সুবিধা হয়েছে। বর্তমানে Hobby Clubs ও Excursions প্রভৃতির দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ছাত্রীদের শরীরে নেই শক্তি, মনে নেই উৎসাহ আর বাপ মায়ের নেই যথেষ্ট অর্থ, তাদের পক্ষে এ সবে কি হবে? অবশ্য Hobby ও Excursion-এ সরকারী সাহায্য কিছু পাওয়া যায়। আর অভিনয়, বাগান করা, আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা Hobby আর আশ-পাশের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখানোর ব্যবস্থা করে Excursion-এর আয়োজন করা সব স্কুলের পক্ষেই সম্ভব।

ছাত্রীরা পাঠ্যবিষয় দ্বারা যেন ভারাক্রান্ত না হয় আর শিক্ষণীয় বিষয় যেন চিত্তাকর্ষক হয় এই লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ রচনা করতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব, তাই ছাত্রীরা পরস্পরে ভাববিনিময়ের দ্বারা যাতে লাভবান হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার ফলে জীবন হবে ব্যাপকতর, গভীরতর, অন্যের দৃষ্টিকোণ বুঝবার ক্ষমতা হবে, এই হোল শিক্ষার আদর্শ। বিভিন্নতার বিরোধ মিটিয়ে এক যোগসূত্রে সকলে কাজ করবে। অপরের যা উত্তম তা গ্রহণ করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করবে। ছেলে-বেলায় শিখেছি, The good retain, the better follow. কর্মই মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই কর্ম যাতে উদ্দেশ্যহীন না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কর্মের দ্বারা হবে আত্মিক উন্নতি; ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টি শিক্ষা দিতে হবে কর্মের মাধ্যমে। স্বাস্থ্যবিধি দ্বারা দৈহিক শুভভাবনা ইত্যাদি দূর করে মানসিক স্বাস্থ্য, সত্য কথা বলা, কথা রক্ষা করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা, প্রভৃতি উপায়ে ছাত্রীদের নৈতিক উন্নতি করাতে হবে। সর্বোপরি যাতে আত্মবিশ্বাস জন্মে তা দেখতে হবে। এই ভাবে দেহ ও মনের সুস্থতা বিধানই শিক্ষার মূল কথা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, অথবা জীবন-যাত্রার পূর্ণতা সাধনে সহায়তা দান। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আদর্শ। আর এও সত্য যে মানুষ বহুলাংশে অপরের প্রেরণায় নিজের জীবনের আদর্শ গঠন করলেও, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা জন্মে না; তখন অপরের প্রেরণার প্রয়োজন, এইখানেই আদর্শ শিক্ষা হবে কার্যকরী। পরিবার ও স্কুল এই দুই হোল চরিত্র গঠনের প্রধান সহায়ক। চরিত্রের উচ্চতর দিক ফুটিয়ে তোলাই সুশিক্ষার কাজ। আজকাল রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, শিল্পকলায় বহু নরনারীর বিস্ময়কর দান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সবই নির্ভর করে অর্জিত শক্তির

উপর, আর শক্তি অর্জিত হয় জ্ঞানের পথে। রাজনীতিতে যোগ দিলেও তার সঙ্গে থাকবে সংযম ও শৃঙ্খলা। উত্তেজনা বশে ছাত্রীদের 'ধর্মঘটে' যোগ দেওয়া কর্তব্য নয়।

শরীর, স্বাস্থ্য ও জীবনের অপচয় সম্বন্ধে এখনও আমরা খুব সচেতন নই। অথচ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশই এ বিষয়ে আজ সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যে দেশের লোকের জীবনী শক্তি কম, সে দেশ বড় হবে কোন শক্তি নিয়ে? নারী সাধ্যমত তার বিচারবুদ্ধি নিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করবে, দেশের ও দশের কাজের মধ্যেও স্বজন সেবা ভুলবে না—এই আদর্শই জগতের কল্যাণ সাধন করবে। মানুষের সাধনা ও চেষ্টার যে লক্ষ্য তারই নাম "আদর্শ", চরিত্র গঠনের জন্য ভারতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখে, বিদেশের ভাবধারার ভালটুকু গ্রহণ করে যে শিক্ষা আমরা দিতে এবং গ্রহণ করতে পারবো, সেই শিক্ষাই হলো "আদর্শ শিক্ষা"।

সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীজ্ঞানান্বেষী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছাত্রদের বেতন ও আর্থিক সমস্যা—দুই একটি রাষ্ট্র ব্যতীত প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অন্ততঃ একটি সরকার পরিচালিত কলেজ আছে এবং তাহাতে সকল বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। বেতন অপেক্ষাকৃত কম। আবার, সরকারী কলেজগুলিতে সেই রাষ্ট্রের বাসিন্দার জন্য যে বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে, ভিন্ন রাষ্ট্রের বা দেশের বাসিন্দার জন্য তাহার দ্বিগুণ বেতন দিতে হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলিনয় রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের জন্য বার্ষিক সেড়শ ডলার, কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের বাসিন্দার জন্য তিনশ ডলার। (এখন বোধ হয় ব্যয়াধিক্যের জন্য সকলেরই বেতন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।) বেসরকারি কলেজগুলিতে বার্ষিক বেতন হাজার বারশ' ডলার পর্যন্ত হয়। অনেক ছোট ছোট কলেজে বার্ষিক বেতন ছয়শ ডলার হয়। অনেক ছাত্র সেই রাষ্ট্রের সরকারি বড় কলেজে অল্প বেতন না দিয়া নিকটবর্তী ছোট কলেজে বেশি বেতন দিয়া পড়ে। কারণ বাড়ী থেকে নিকটবর্তী কলেজে যাতায়াত করিলে খাইবার ও থাকিবার জন্য পৃথক খরচ করিতে হয় না, বাড়ীর খরচেই চলে। বার্ষিক বেতন বলিতে কিন্তু নয় মাস বুঝায়। গরমের তিন মাসের জন্য পৃথক বেতন দিতে হয়। কোথাও কোথাও points-এর সংখ্যা অনুযায়ী বেতন ব্যবস্থা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি point-এ বেতন ২৪ ডলার (১৯৫৩)। একটি course-এ যদি তিন points থাকে তবে তাহার জন্য ৭২ ডলার বেতন দিতে হইবে। আমাদের দেশে Intermediate, Bachelor, Master প্রভৃতি Degree-র জন্য এবং বিজ্ঞান ও কলা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শিক্ষার বার্ষিক বেতনের হার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং পরীক্ষার ফী পৃথক দিতে হয়। সে দেশে তাহা নয়। কলেজের সকল বিষয়ের সকল ক্লাসে প্রথম এবং শেষ পর্যন্ত বেতনের হার একই। তবে বিভিন্ন কলেজের হার পৃথক পৃথক। বার্ষিক বেতন দিলেই চলে, পরীক্ষার ফী আর পৃথক দিতে হয় না। বেতন কিন্তু বার্ষিক হার

অনুযায়ী প্রত্যেক term (১২ সপ্তাহ) বা প্রত্যেক semester-এর (১৮ সপ্তাহ) প্রথমেই দিতে হয়, বাকী চলে না, বা মাসে মাসে দিবার নিয়ম নাই। যাহারা গরীব তাহারা শুধু গরীব বলিয়াই অব্যাহতি পাইবে না। তুমি গরীব আছ কিন্তু পড়িবার সাথে খাটিয়া টাকা আয় কর, এবং বেতন দাও, এই কথাই প্রত্যেক কলেজ বলিবে। সব জায়গায় আংশিক সময় কাজ দিবার ও পাইবার ব্যবস্থা আছে। বাসন ধোয়া, রাস্তা ঝাড় দেওয়া, লাইব্রেরীতে বই দেওয়া নেওয়া, ঘরের মেঝে ঝাড় দেওয়া, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখা, মা বাবা বাহিরে গেলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে কয়েক ঘন্টার জন্য পাহারা দেওয়া (এই কাজ যে করে তাহাকে baby sitter বলে), এই প্রকার বহু কাজ কলেজ সীমানার মধ্যে ও বাহিরে পাওয়া যায়। যাহারা ভাল ছেলে তাহাদের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বেতন বিনায় জন্য প্রায় প্রত্যেক কলেজেই বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার ফল দেখিয়াই এই বৃত্তি হয়। কখনও কখনও কোনও কোনও বৃত্তির পরিমাণ কিছু বেশি থাকে, তাহা থেকে বেতন দিয়া কিছু টাকা বাঁচিতেও পারে। যাহারা Bachelor Degreeর পরীক্ষায় ভাল ফল দেখায়, গ্র্যাজুয়েট স্টাডির জন্য তাহাদিগকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া সাহায্য করা হয়। এই বৃত্তির নাম Fellowship ও Assistantship—এই বৃত্তি পাইলে ছাত্রদের নিজের খাওয়া, থাকা, পড়া, কলেজের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় খরচ কুলায়। Fellowship বৃত্তিতে ছাত্রকে কোন প্রকার কাজ করিতে হয় না, কিন্তু Assistantship-এর জন্য ছাত্রকে কলেজের কিছু কিছু কাজ করিতে হয়। কোথাও বা কেরাণীগিরি করিতে হয়, কোথাও বা Freshmen এবং Sophomor ক্লাসে পড়াইতে হয়, কোথাওবা কোন অধ্যাপক গবেষণা করিতেছেন তাঁহার জন্য কোন কোন তথ্য বই ঘাঁটিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অসমর্থ ছাত্রগণ গরমের তিনমাস কল-কারখানায় খাটিয়া ও অন্যসময় নৈশিক দুই এক ঘন্টা খাটিয়া যে উপার্জন করেন তাহাতে তাহাদের প্রায় সব খরচই চলিয়া যায়। আমি যে কারখানায় কাজ করিতাম সেই কারখানায় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার অভিলাষী একটি তরুণকে দেখিলাম। তাহার বাবা যাকে তাকাত দিয়া অন্য বিবাহে করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ছাত্রার ডলার সাহায্য করিবেন। তিনি ঠাকুরদাদার সংসারে থাকেন। ঠাকুরদাদা তিনশ ডলার সাহায্য করিবেন। মোট বাইশশ ডলার বার্ষিক খরচ। এই জন্য বাকীটা গরমের বন্ধে আয় করিতেছেন। জুন জুলাইয়ে salesman-এর কাজ করিয়াছেন; আর আগষ্টে ছুটা প্যাক [illegible] কারখানায় কেমিষ্টের কাজ করিতেছেন। ইহাতেই তাহার চলিয়া যাইবে। দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করাই ছাত্রদের পক্ষে স্বাভাবিক; না করাই অস্বাভাবিক। ইহাতে মর্যাদাহানির কোন প্রশ্ন নাই।

বই: ছাত্ররা প্রায়ই বই কেনে না। প্রতি কলেজে একটা Bookstore আছে। সেখানে নামমাত্র ভাড়ায় বই পাওয়া যায়। term বা semester এর প্রথম দিন থেকে পড়া আরম্ভ হয় এবং পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত চলে। অধিকাংশ জায়গায় term বা semester আরম্ভ হইবার আগেই ভর্তি শেষ হয়; কোথাও কোথাও শুধু প্রথম দিন মাত্র ভর্তির কাজ চলে। সুতরাং পড়াশুনা আগাগোড়া সমান ভাবে চলে। বইয়ের অভাবে পড়াবন্ধ থাকে না 'বা শিক্ষক গল্প করেন না' বা পুরানো পড়া আলোচনা করেন না।

লাইব্রেরী সকাল আটটায় খোলে এবং রাত্রি আটটা, কোথাও বা দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানে পড়িবার ব্যবস্থা সুন্দর। ছাত্র ক্যাটালগ দেখিয়া ইচ্ছামত বইয়ের নাম ও নম্বর কার্ডে লিখিয়া কাউন্টারে রাখিলে শীঘ্রই বই পাইবার ব্যবস্থা আছে।

লাইব্রেরী থেকে রেফারেন্সের বই বার নিয়া বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা আছে ; কোথাও পনের দিন কোথাও একমাস রাখা যায়। কিন্তু কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মামেকয়া বেশরকারি বড় কলেজে দুই একদিনের বেশী রাখা যায় না। অধিকাংশ জায়গায় রবিবারেও লাইব্রেরী খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরীর বিশ্রাম নাই।

আমাদের দেশে হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশ করিবার জন্ত কলেজ ছুটি দেওয়া হয়, বড়লোকের মৃত্যু সংবাদ বা কোন পদস্থ ব্যক্তির আগমনে কলেজ বন্ধ দেওয়া হয়। কোন কারণেই সেখানে খোলা কলেজ বন্ধ দেওয়া হয় না। ইলিনয় রাষ্ট্রের গভর্ণর ছিলেন ষ্টিভেনসন। তিনি আমাদের কলেজ দেখিতে আসিলেন ; তাহা খাস সরকারী কলেজ। সঙ্গে কোন পুলিশ দেখিলাম না। গভর্ণিং বডির সভাপতি ডঃ মরিসের সঙ্গে তিনি কলেজ ঘুরিয়া দেখিলেন। ছুটির কথা কেহ প্রস্তাবই করিল না। তবে যদি কোন বিশেষ জরুরী ঘটনা ঘটে, তবে সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এক পিরিয়ড (৬০ মিনিট) ক্লাসের কাজ স্থগিত থাকে। ঐ সময় Auditorium-এ সভা করা হয়। তখন এক বা একাধিক লোক বক্তৃতা দেন।

গ্রীষ্মের ছুটি তিন মাস, বড় দিনের ছুটি দুই সপ্তাহ এবং অন্যান্য ছুটি পাঁচ ছয় দিনের বেশি নাই।

ছাত্র কলেজে হাজির থাকিলে সে ক্লাসে নিশ্চয়ই হাজির থাকিবে, বাড়ীর বা নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্ত ছুটি লইবে না। অপরিহার্য না হইলে সে অনুপস্থিত থাকিবে না, কারণ তাহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতি।

শৃঙ্খলা : কলেজে ধর্মঘট নাই। ছাত্র যদি মনে করে যে শিক্ষক তাহার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা তাহাকে সুনজরে দেখেন না, তবে সে তাঁহার ক্লাস করে না। কিন্তু সেজন্ত ধর্মঘট বা সভাসমিতি করিয়া প্রতিবাদ জানাইবার নিয়ম নাই। শিক্ষককে না জানাইয়া যদি কেহ ক্লাসে হাজির না থাকে তবে কোথাও কোথাও শিক্ষক তাহার নাম কাটিয়া দেন ; শিক্ষকের কোন কাজের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে কোনই আন্দোলন হইবে না। গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকার প্রত্যেক উপরিওয়ালা এক একজন ক্ষুদ্র ডিকটেটর। কোন প্রকার প্রাকার্ড দেওয়ালে লাগান হয় না—কারণ, লাগাইবার প্রথা নাই। ইহার মধ্যে আবার সৌন্দর্য এবং সুরুচির প্রশ্নও আছে

ছাত্রদের সময়ানুবর্তিতার জ্ঞান খুব বেশি। warning বা সতর্কীকরণের ঘণ্টা বাজিবার প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে চুকিবেই ; কিছুতেই দেরী করিবে না। হয়ত কোন বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে। শিক্ষকের সঙ্গে ঠিক হইল সে দুপুর বেলা বা বিকাল সাড়ে তিনটার সময় তাহার বিভাগের (department) ঘরে গিয়া ছাত্র দেখা করিবে। ছাত্র বেলা বা সাড়ে তিনটা বাজিবার পাঁচ মিনিট আগে যাইবে তো পাঁচ মিনিট পরে যাইবে না। অন্যথা না পড়িলে কেহ ক্লাস কামাই করে না। যেহেতু শিক্ষক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষক এবং তিনি যাহা পড়ান প্রশ্ন তাহার মধ্যেই থাকে, সেহেতু গরহাজির থাকিলে ছাত্রের নিজের ক্ষতি। শিক্ষকও সময়মত হাজির থাকেন। ব্যক্তিগত কাজ বা বাড়ীর কাজের জন্ত দেরীতে ক্লাসে আসেন না বা অনুপস্থিত থাকেন না।

খেলাধুলা : প্রতি কলেজে auditorium আছে। বড় বড় সভা সেখানেই বসে। হাজার দুই হাজার পর্যন্ত লোক বসিতে পারে। বসিবার জন্ত শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার। উঠিয়া যাইতে, আসিতে বসিতে, কোন প্রকার অসুবিধা নাই। Gymnasium-ও আছে, সেখানে বহুলোক একত্রে ব্যায়াম করিতে পারে। সেখানেও কয়েক শত লোক গিয়া বসিয়া খেলা দেখিতে পারে, প্রবেশও ঢালা থাকে। খেলিবার মাঠও বিরাট ; মাঠের পাশে উঁচু গ্যালারী

থাকে। সেখানেও আরোহ করিয়া বসিয়া খেলা দেখা যাইতে পারে। ইহার উপর আবার প্রত্যেক কলেজে ব্যাণ্ড, অর্কেষ্ট্রা, ও গান-বাজনার এবং নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ কলেজে সাংবাদিকতার ক্লাস দ্বারা সাপ্তাহিক, বা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। নানা বিষয়ের নোটিশ বা সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, নোটিশ বোর্ডে টানাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। স্থায়ী নিয়ম কানুন prospectus-এ ছাপান থাকে। আমেরিকায় ইহাকে bulletin বলে।

সংযুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র আশা করি কেহ জড়াইয়া ফেলিবেন না। United States ও United Kingdom—বলিতে আমরা সহজে পার্থক্য বুঝি। এখানে আমরা আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র U. S. A.-এর কথাই বলিতেছি। একথা আশা করি কাহাকেও বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

থাকিবার ব্যবস্থা : ছাত্ররা কলেজের Dormitory-তে থাকিতে পারে। Dormitory আমাদের দেশের Hostel. তবে খাইবার ব্যবস্থা অন্যত্র। আমাদের দেশে হোটেল এবং হোষ্টেল বলিতে থাকিবার সাথে খাইবার ব্যবস্থাও বুঝায় এবং খাওয়াটা বাধ্যতামূলক। আমেরিকায় তাহা নয়। Hotel বা Dormitory-তে সব সময় খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না; থাকিলেও খাওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। ছাত্রেরা বাহিরে গৃহস্থবাড়ীতে ঘর ভাড়া করিয়াও থাকিতে পারে। একঘরে এক-জনও থাকে, আবার চারজনও থাকে। পয়সা বাঁচাইবার একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করা হইয়াছে। একখানা চৌকির উপর আর একখানা চৌকি রাখিলে যেমন উপর নীচে দুইজন শোয়া যাইতে পারে, তেমনি দ্বিতল চৌকি থাকে। এইপ্রকার দুইখানা থাকিলে চারজন একটি ছোট ঘরে শুইতে পারে। মধ্যবিত্ত এবং গরীবের বাড়ীতে এই প্রকার দ্বিতল চৌকি দেখিতে পাওয়া যায়। Dormitory-তে যাহারা কম পয়সায় থাকিতে চায়, তাহাদের জন্য এই প্রকার ব্যবস্থাও আছে। আর, বেশি পয়সা খরচ করিলে একজন একটা ঘরে বা দুইটা ঘরে থাকিতে পারে। যে ঘরে রাঁধিবার ব্যবস্থা আছে, ইচ্ছা করিলে ছাত্র সেখানে রাঁধিয়া খাইতে পারে। ইলেকট্রিক বা গ্যাসের উননের দুই বা তিন বা চারটা মুখ থাকে। আধঘণ্টার মধ্যে চার ভাগ রান্না হইয়া যায়। নিজে রাঁধিয়া খাইলে সর্বসাকুল্যে মাসে ২৫।৩০ ডলারেই চলিয়া যায়।

কম খরচায় থাকিবার জন্য কয়েকজন ছাত্র একত্রে বাড়ী ভাড়া করে। সেখানে তাহারা পালা করিয়া হাটবাজার, রান্না, ঘর ঝাড় দেওয়া ইত্যাদি সব কাজ করে। ইহাকে Sorority বা Fraternity বলে। ইহাতে খরচ খুবই কম পড়ে। আমি প্রায় এক বৎসর নিজে পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া একা রান্না করিয়া খাইয়াছিলাম। নিম্নতম খরচ পঁচিশ ডলার, আর উর্ধ্বতম খরচ পয়ত্রিশ ডলার পড়িয়াছিল। কাফেটেরিয়ায় খাইলে ইহার দ্বিগুণ খরচ পড়িত। "Paying Guest" প্রথা আমেরিকায় নাই। ঘর ভাড়া করিলে বা ছাত্রাবাসে থাকিলে পৃথক খাইয়া নগদ দাম দিতে হয়। বাড়ী যদি ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে হয় তবে বহু ছাত্র গাড়ীতে দৈনিক যাতায়াত করে। তাহাতে খরচ বড়ই কম পড়ে।

কলেজ জীবন : ছাত্রদের সখ চরিতার্থ করিবার জন্য এবং যে বিষয়ে তাহাদের ঝোঁক আছে তাহা মিটাইবার জন্য নানাবিধ ক্লাব আছে, যথা, International club, Foreign Students' Club, Home Economics Club, ইত্যাদি। ধর্মচর্চার জন্য পৃথক ক্লাব থাকে। ইহার উপর ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পৃথক ব্যবস্থা আছে। প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টানরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বড়ই কম। এত কম যে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের গীর্জায় যে

কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। তবে রোমান ক্যাথলিকদের সবই পৃথক—এমন কি, ধর্মশিক্ষাও।

কলেজ জীবন বড়ই আনন্দে কাটে। বইয়ের অভাব নাই, পড়া কড়ির অনটন নাই (কারণ, অভিভাবকের সনগ্রহ না হইয়া ইচ্ছামত আংশিক সময়, তিন, ছয়, নয় মাস কাজ করিয়া আয় করিয়া, কয়েক মাস পড়িয়া, points সংগ্রহ করা যায়), একঘেয়েমী নাই, কঠিন প্রশ্ন নাই, ধর্মঘট নাই, সংসারের চিন্তা ভাবনা নাই। কলেজ জীবনে বৈচিত্র্য আছে, আনন্দ আছে, জানিবার শিখিবার পড়িবার বহুবিধ সুযোগ সুবিধা আছে।

শিক্ষক : কলেজের প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে। পদমর্যাদার পর্যায়ক্রমে এইরূপ ভাগ করা হয় : Professor, Associate professor, Lecturer, Instructor. কোথাও কোথাও Associate professor-এর পরিবর্তে Assistant professor নামের পদ আছে। যিনি ব্যক্তিগত ডিগ্রী পাইয়া আরও পড়িতেছেন বা গবেষণা করিতেছেন, অথবা M. A পাশ করিয়া পড়াইতেছেন তিনি Instructor. যিনি M. A. পাশ তিনি Lecturer-ও হইতে পারেন। ডক্টরেট না পাইলে ইহার উপরের পদ পাওয়া যাইবে না। M. D. ডিগ্রী ধারী হয় সাত হাজার ডলার পাইয়া থাকেন। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরও অনেক বেশি পান। যিনি যত বেশি প্রবন্ধ ও বই লিখিবেন, তিনি তত বেশি বেতন পাইবেন। নামকরা কলেজগুলিতে কেহ কেহ পঁচিশ হাজার ডলার বেতন পান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক সারা জীবন দশ লক্ষ ডলারের বেশি বেতন পাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে Milion Dollar professor বলা হয়। অবশ্য, এই সব বার্ষিক বেতন, মাসিক নয়। বৎসরের বাকী তিন মাস (গরম কাল) তিনি অন্যত্র যে কোন কাজ করিতে পারেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। তিনি যদি ঐ কলেজেই নয় মাসের বেশি কাজ করেন তবে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইবেন। গরমের ছুটিতে প্রায় প্রত্যেক কলেজেই Summer Session চলে। ঐ জন্য অনেক সময় অন্য কলেজ থেকে নাম করা শিক্ষকেরা পড়াইতে আসেন। নিয়মিত ছাত্ররাও অন্য কলেজে পড়িতে যায়। আমি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৩ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে ঐ প্রকার Summer Session-এ ছয় সপ্তাহ পড়িয়াছিলাম। তখন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কম নয়। আমরা যেমন বায়ু পরিবর্তন করি, অনেক ছাত্র তেমনই বায়ু পরিবর্তন করিতে আসিয়া কলেজে ছয় সপ্তাহ পড়িয়াছিলেন। এ যেন এক সাথে রথ দেখা কলা বেচা। এই প্রকার ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুলের শিক্ষক। যোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার জন্য গরমের মধ্যে তাঁহারা পড়াশুনা করিয়া কিছু points সংগ্রহ করেন। M. A. বা M. D. ডিগ্রী পাইবার উদ্দেশ্যও থাকে।

শিক্ষকের রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে। তিনি ক্লাসে তাহা প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন কি, তিনি বিরুদ্ধ দলের কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে পারেন। তাহাতে ছাত্র বা কর্তৃপক্ষ কেহই আপত্তি করিবে না। কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ সমর্থন করিতে পারিবেন না।

শিক্ষকের যদি ডক্টরেট ডিগ্রী না থাকে তবে তিনি Senior বা তাহার উপরের কোন ক্লাসে পড়াইতে পারিবেন না। শিক্ষকের যোগ্যতা যে স্তরেই হোক না কেন তিনি ছাত্রের সাথে যে ব্যবহার করিবেন তাহাই চূড়ান্ত।

শিক্ষক প্রাইভেট টুইশনি করেন না—তাহা করিবার নিয়ম নাই। এই জিনিসটি আমেরিকায় অজ্ঞাত। তবে ছাত্রের কিছু বুঝিবার প্রয়োজন

হইলে তাঁহার বিভাগের ঘরে দেখা করিয়া বুঝিবার জন্য ছাত্রকে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তিনি ঠিক সময়ে তাঁহার ঘরে অবশ্যই থাকিবেন।

বর্ণ বিদ্বেষ :

উত্তর অঞ্চলের কলেজগুলিতে নিগ্রোদের কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে আছে। সেখানে অনেক কলেজে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। তাহাদের নিজস্ব কিছু কিছু কলেজ আছে। আজকাল বর্ণ বৈষম্য উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু উত্তর অঞ্চলেও খুব কম গোরা ছাত্র নিগ্রোদের সাথে মেলামেশা করে। বিদেশীরা আমাদের ছুঁৎমার্গের নিন্দা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে নিম্নতম বর্ণের ছাত্ররাও উচ্চতম বর্ণের সাথে এক বেঞ্চে পড়াশুনা করে। বড় বড় সহরে একই মেস, বোর্ডিং হাউসে থাকে, একই হোটেলে খায়। তাহারা সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চতম কাজও করিতে পারে। আমেরিকায় তাহার অভাব। কোন অঞ্চলে কলেজ সীমানার মধ্যে খাবার দোকানে নিগ্রোরা গিয়া খাইতে পারে, কিন্তু সহরে গিয়া খাইতে পারিবে না। বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে, "We reserve our right to entertain." তাহা দেখিয়াই নিগ্রোরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকে বসিয়া খাইতে দেওয়া হইবে না। ইচ্ছা করিলে খাবার কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে। নিগ্রোরা যেখানে সংখ্যায় বেশি সেখানে তাহারাও ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া রাখে। ইহা inferiority complex-এর চিহ্ন। তবুও নিগ্রোরা বিজ্ঞাপন ঝুলাইয়া গায়ের ঝাল মেটায়। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট নিগ্রোদের উচ্চতম শিক্ষা দিবার জন্য Washington, D. C.-তে একটা খুব ভাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে গোরারাও পড়িতে পারে। তবে দক্ষিণ অঞ্চলে Graduate School-এ (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কলেজে M. A., M. S., Ph. D. পড়ানো হয়) নিগ্রোরাও পড়িতে পারে। আমার মনে করাইয়া দিতেছি, দেশের সর্বত্র বর্ণ বৈষম্য ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে।

উপসংহার :

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমার এই ধারণা যে ইহা মানুষের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। তিনমাস বা সাড়ে তিনমাস অন্তর পরীক্ষায় পাশকরা, নিজের পূর্বজ্ঞান ও ক্ষমতা বুঝিয়া বিষয় নির্বাচন, প্রথম থেকেই বই পাইবার ব্যবস্থা, Book Report, Term Paper ও Thesis-এর সাহায্যে জ্ঞান আহরণ, গ্রীষ্মের ছুটিতে এবং কলেজে আংশিক সময় কাজ করিয়া ব্যয় নির্বাহ, অভিভাবকের গলগ্রহ না হইয়া স্বাবলম্বী হওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। আমাদের দেশে নোটবই পড়িয়া M. A. পরীক্ষায় পাশ করা যায়। ইহার উপর অধ্যাপক মহাশয়ের নিজস্ব নোটস, আছেই, ফলে বিষয়বস্তুতে অধিকাংশ ছাত্রই অপক্ক থাকিয়া যায়; স্বাধীন চিন্তা ও কাজ করিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পারে না। কিন্তু আমেরিকার Course প্রথার জন্য ছাত্রগণ পড়াশুনায় ফাঁকি দেয় না।

নোটবই কি তাহারা জানে না। Self-help দেখে বলিয়া কেহ কাহারও গলগ্রহ হয় না। সময়ের মূল্য বুঝে, অযথা কালহরণ করে না। পরচর্চা, পরনিন্দা করিবার সময় নাই। তাহার ফলে সময়ের অভাব হয় না। রাত্রি জাগিয়া পড়া কি, তাহারা জানে না। তাহাদের একটা সুবিধা এই যে মাতৃভাষার মারফত উচ্চতম শিক্ষা লাভ করে এবং যিনি শিক্ষক তিনিই শেষ পরীক্ষক। আমরা তো এখন মাতৃভাষায় ব্যাচিলর ডিগ্রী পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারি, কিন্তু তবুও বহু ছাত্র ফেল করে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, সময়ের মূল্য না জানা, ও লেখার অভ্যাস না হওয়া। ইচ্ছা থাকিলে ও থাকিতে চাহিলে যে কোন ছাত্র আমেরিকার উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিতে পারে। পুঁজিবাদী হইয়াও আমেরিকানরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাম্য আনিয়াছে, অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে তাহা দুর্লভ। পাঠকগণকে আবার মনে করাইয়া দিতেছি, দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা এক ছাঁচের নয়। যাহা লিখিলাম, তাহারও ব্যতিক্রম আছে। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতাও প্রায় এক দশক আগেকার।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীশিবরঞ্জন সেন

Read and Learn. Book Three. By Bhandari, Hinkley and Ram. Orient Longmans. Calcutta. April, 1960. Ninety naya paise.

Read and Learn গ্রন্থমালার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা বিশেষ একটি পরিকল্পনা অনুসারে রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটিতে চার হইতে পাঁচ শ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উদ্দেশ্য ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণ যে কি ভাবে বাক্যকে রচনা করিয়া আসিতেছে তাহার সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত করা। বিদেশী ভাষা পড়ানো, শোনানো, মুখে মুখে বলানো—ইহাই হইল উদ্দেশ্য, এবং এইভাবে অগ্রসর হইলে আর পরবর্তীকালে কোনও অসুবিধা হইবে না বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু যে সব পাঠ দেওয়া হইয়াছে তাহা ইঙ্গিত মাত্র, তাহাদের মাধ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং পাঠ প্রস্তুতের ভার শিক্ষকেরই উপর। যে সব পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে সেগুলি বিশেষ বিশেষ পাঠকের অথবা বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কথা মনে রাখিয়াই করা হইয়াছে। বিদেশী বেলাধুলা, বিশেষ বিশেষ গৃহপালিত জন্তু—যাহাদের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ, সে সব বিবেচনা করিয়া পুস্তকটি লিখিত হইয়াছে।

বিচিত্র ধরণের এবং সংখ্যায় অনেকগুলি ছবি, ঝরঝরে টাইপ, গ্রন্থশেষে অক্ষরানুক্রমিক শব্দসূচি পুস্তক খানির মর্যাদা ও উপযোগিতা বাড়াইয়াছে।

শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞান :

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা ১৩। প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৬০। দাম—তিনটাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

খাদি আমাদের দেশে জনগণের মনে দাগ কাটিয়া বসে নাই, এবং এখন যে আমাদের খাদিকর্মীরা খাদির চাহিদা দেখিয়া উল্লসিত হইতেছেন তাহার ভিত্তি বালুকার উপরে, একথা কষ্ট করিয়া বলার দরকার নাই। খাদি ধুতি শাড়ির প্রচলন যতক্ষণ বহুল সংখ্যায় না হইতেছে, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে ততক্ষণ খাদি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শিল্পের মর্যাদা সংখ্যালঘু খাদি-প্রেমীর মধ্যে নয়। অন্য শিল্পের সঙ্গে বহুজনের মধ্যে ইহার আদর বাড়িলে তবেই খাদি শিল্প হিসাবে সার্থক হইবে।

তথাপি ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে শিক্ষাশিল্প হিসাবে। এখনও আমরা মুখে মুখে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কথা বলি, নতুবার হিসাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, কোণঠাসা হইয়াও শিক্ষাশিল্প হিসাবে খাদি আমাদের দেশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছে। ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীনিকেতনের সার্থক কর্মী লক্ষ্মীশ্বরবাবু এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি যেমন উৎকৃষ্ট, খাদিনীতিতে বিশ্বাসও তেমনি সুদৃঢ়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়ের আদর্শে পুষ্ট তাঁহার চিন্ত খাদিশিল্প ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর আশা সঞ্চার করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই পুস্তক পড়িয়া পাঠক লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষায়, এমন একটি পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। ইহাতে পরিমাপ ও কাটা সুতার শক্তি নির্ণয় কি করিয়া করিতে হয়, কার্পাস শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, চরকার বিবর্তন, সকলই বিশদভাবে চিত্র দিয়া বিবৃত হইয়াছে। বুনিয়াদি শিক্ষাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিতে এই পুস্তক অবশ্যই সাহায্য করিবে। দশটি অধ্যায়ে সুপরিকল্পিত ও সুরচিত 'শিক্ষাশিল্প ও কার্পাসবিজ্ঞান' প্রত্যেক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শুধু পঠিত নয়, বিশেষ-ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে ইহাকে আশ্রয় করিয়া খাদির মত প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্প আমাদের শিক্ষাভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছাত্রজীবনকে প্রকৃতই সমৃদ্ধ করিতে পারে। হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় ইহার অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে ইহার উপযোগিতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইবে।

শিক্ষক ও গুরু

প্রমথ চৌধুরী

শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উদ্যমসাধক মাত্র। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে।

শিক্ষা

ম হি কল্যাণস্তৎ কস্তিদ্ ভুগক্তিং তাত গচ্ছতি

১৮শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৬৭ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিড়িক

আমরা পশ্চিম বাংলায় কলিকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, কল্যাণী—এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়া মনে মনে একটু হয়তো বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রাচীন ও অর্বাচীন বহু বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত বোধ করিতেছি।

ব্রিটিশ ইন্‌ডাস্ট্রিয়েল কনফেডারেশন দাবি করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ একটি পুস্তিকা মারফৎ পরবর্তী দশ বৎসরে অতিরিক্ত সত্তর হাজার ছাত্রের স্থান সংকুলানের জন্য ব্রিটেনে আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা চাই বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ১৯৭০ সালের কথা; কিন্তু ১৯৬৩ সালের মধ্যে স্থান নির্বাচন করা দরকার। শিক্ষার মানের অবনতি যাহাতে না ঘটে সেজন্য প্রস্তুত থাকা চাই বলিয়া তাঁহারা ব্যক্ত হইয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে আরও বিশ্ববিদ্যালয় চাওয়া নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়! তবে সর্বত্রই তো কোনও কর্মের জন্য প্রস্তুতি দেখিতেছি না। আমাদের দেশে হয়তো একটু বেশি। ইহাই কি যুগধর্ম?

আমেরিকাতেও শিক্ষা-সংকট

আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা কত? খুঁটিনাটি হিসাব বাদ দিলে মোটামুটি সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪ কোটি ৮০ লক্ষের মত, অর্থাৎ সমগ্র দেশের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী। এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াইবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ।

ছাত্রসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান রিপোর্টার আমেরিকার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যোগ্য শিক্ষক ও বিদ্যালয়ে স্থানাভাব। শিক্ষকের অভাব দূর করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যাপকভাবে নূতন শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং গত বসন্তকালে শিক্ষা শেষ করিয়া যে সব নূতন শিক্ষক আসিয়াছেন

তাঁহাদের সংখ্যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৮ জন বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপকভাবে স্কুল বাড়ী নির্মিত হইতে থাকে এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে যত সরকারী ভবন আছে তার শতকরা ২০টি স্কুল বাড়ী। যুদ্ধোত্তরকালে নির্মিত এই সব স্কুলে শীঘ্রই দেশের শতকরা ১০ টির অধিক কিশোরকে স্থান দেওয়া হইবে। যে সব সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার মধ্যে টেলিভিশন বা বেতার-বীক্ষণ একটা বিশেষ স্থান দখল করিয়াছে।

বছর দশেক আগে টেলিভিশনকে কি ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাইতে পারে সে সম্পর্কে মাত্র দু একটি জায়গায় হাতে-কলমে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। আর আজ সে জায়গায় ৫০টি কেন্দ্রে বেতার-বীক্ষণকে শিক্ষার কাজে লাগানো হইতেছে। সাম্প্রতিক এক হিসাবে প্রকাশ যে, প্রায় ৬ শত পাবলিক স্কুল ও শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বেতার-বীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকাতেও শিক্ষা-সংকট! সংকটের প্রকৃতিও আমাদের দেশেরই অনুরূপ! সমাধান এবং সমাধানের উপকরণ তো এখন সর্বত্র সাধারণ হওয়া উচিত। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসম্পদ আমাদের নাই। কম হয়তো করিতেই হইবে, তবু সন্ধানে থাকিতে হইবে, অন্যায়ে আমরা আমাদের মত কোনও সমাধান করিতে পারি কি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য

ডাক্তার সুবোধ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দুই কত সারাইয়া লোককে নীরোগ করিতে পারেন। কয় বৎসর ধরিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস আছে। সংবাদপত্রে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে তিনি প্রথমেই ছাত্রদের পড়াশোনা প্রভৃতি ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় সুস্থ সবল নীরোগ হইয়া ছাত্র অধ্যাপক কর্মী সকলেরই সাহায্যে জাতির কল্যাণকর শিক্ষা দান করিতে থাকিবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার শক্তি আর সংখ্যাধিক্যে ততটা ব্যাহত হইবে না, ঐতিহ্যের গৌরব রাখিয়া ইহা বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

গত ৭ই অক্টোবর নূতন নাইজিরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এসেম্বলি হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি নাইজিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ২৭০ জন ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকায় ইহাই প্রথম স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়—কোনও ব্রিটিশ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা হিসাবে ইহা কাজ করিবে না।

ইতিপূর্বে নাইজিরিয়ায় ১৯৪২ সালে এক বিশ্ববিদ্যালয়—নাইজিরিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় —ইবাদানে স্থাপিত হইয়াছিল। ইবাদানের কথা বাঙ্গালী পাঠক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখায় নিশ্চয় পড়িয়াছেন।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারত হইতেও কয়েকজন আছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে)

বৎসরান্তে

আমাদের গ্রাহক ও পাঠক সকলকেই বর্ষান্তে অভিবাদন জানাই। এ বৎসর নানা অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, আমরা সকল বাধাবিপত্তি পার হইয়া যথাসময়ে পত্রিকা বাহির করিতে পারিতেছি। সকলের শুভকামনাই আমাদের শক্তি। আশা করি, আগামী বৎসরে যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিব, তবে সেজন্যও আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরের শুভকামনা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ভরসা করি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না।

শিক্ষা সংস্কারে গান্ধীজী

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করেছে, সে কথা আজ কাউকে বিশদ-ভাবে বলার দরকার নাই। তিনি একাই জাতির প্রতিনিধি হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, নৈতিক সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর পিছনে জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছিল, সারা ভারত তখন হয়ে উঠেছিল চঞ্চল, অস্থির। সেদিন তাঁর একটা মূর্তি ছিল, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, রুদ্র মূর্তি। সেবার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর জীবনব্যাপী আচরণের দ্বারা সেবাধর্মের প্রকৃতি স্পষ্ট করে ধরেছিলেন। জীবনের সকল অবস্থায় মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন তার রক্ষাকবচ দিয়ে গিয়েছেন, পরিচিত দীনতম ব্যক্তির কথা মনে করা। স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেসের নাম ও কর্মপদ্ধতি তিনি বদলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেবাগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলনে দারুণ রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাত্র নিজে রুগ্ন পরচুরে শাস্ত্রীর রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেও এক মূর্তি। বিপ্লবী, লোকসেবক গান্ধীজীর আর এক মূর্তি শিক্ষকের মূর্তি। মানুষের মৌলিক পরিবর্তন সাধনে শিক্ষাই যে বড় কথা। জাতীয় সংগঠনে ব্রতী গান্ধীজী সে কথা বিবেচনা করে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলে শিক্ষাসমস্যা সমাধানের একটা উপায় নির্দেশ করে গেছেন, বলেছেন, নয়ী তালিম বা নব শিক্ষাই জাতির সেবায় তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ। একথা আজ স্মরণ করা দরকার।

গান্ধীজীর শিক্ষাবিষয়ক বিচার বা সিদ্ধান্ত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নয়। কার্যত তাঁকে শিক্ষা নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা করতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মে কয়েকটি পরিবার নিয়ে আশ্রম জীবন যখন তিনি যাপন করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর নিজের ছেলেদের শিক্ষার ভার তাঁকে নিতে হোল, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসী অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরও—তত্ত্বমূলক আলোচনা নিয়ে নয়, আপাতকরণীয় হিসাবে, অবশ্য-করণীয় রূপে। যখনি যখনি তিনি আশ্রমজীবন যাপন করেছেন, দাবরমতীর তীরে, সেবাগ্রামের মধ্যে, সর্বদাই তাঁকে শিক্ষার কথা ভাবতে হয়েছিল, বড়দের ও ছোটদের সকলের কথাই ভাবতে হয়েছিল। এই সময়েই তিনি নিজেও শিক্ষার দাদায় হাতের কাজ হিসাবে জুতো তৈরি করতে শিখেছিলেন। বাংলা দেশে আমাদের দোকানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিজের হাতে তৈরী এক জোড়া জুতো উপহারও দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যখন তিনি ছাত্রদের প্রচলিত বিদ্যালয়ের মামুলি শিক্ষা বর্জন ও জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করে জাতির সেবায় যোগ দিতে আহ্বান জানান, তখন তাঁকে রাজনৈতিকের আসনের সঙ্গে শিক্ষাসংস্কারকের আসনও গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের ত্রিপুরা অধিবেশনে যখন তিনি তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করেন, তখন তাঁর বহুদিনের পরীক্ষিত সত্যই এনেছিলেন। প্রচলিত পদ্ধতির পক্ষে বৈপ্লবিক ধারণার মতো মনে হলেও বাস্তবিক কিন্তু তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তাঁর পরিকল্পনা রাখা হোল প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ডক্টর জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে গঠিত এক কমিটির সামনে, কমিটি গান্ধীজীর সূত্রগুলি মোটামুটি পরীক্ষার পর

যেনে নিয়ে বিস্তৃত পাঠ্যসূচী প্রণয়নে লেগে গেল। প্রদেশে প্রদেশে তখন রাজ্যশাসনের দায়িত্ব খানিকটা দেশের লোকের হাতে এসে পড়েছিল। সুতরাং বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োগ আরম্ভ করতে সুবিধা হোল। এমন সময় এল 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের জীবনমরণ পণ—গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্মিগণ কারাবরণ করে নির্বাতন ভোগ করলেন, কিন্তু আন্দোলনের অধ্যায় শেষ করে গান্ধীজী যখন সেবাগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধন করেন, তখন তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও শোনালেন আশার বাণী—বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে যেটুকু পরীক্ষা করেছি, তাতে ওর প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে, এতো পাঁচ বৎসর সাত বৎসরের ব্যাপার নয়, এযে জীবনব্যাপী শিক্ষা। এতদিন আমরা নদী নালা উপসাগরে ছিলাম, আজ মহাসাগরে এসে পড়েছি। দুঃসাহসের পথে আমরা যাত্রী।

গান্ধীজীর নির্ভীক বলিষ্ঠ কণ্ঠ আজ নীরব। কিন্তু সেই পুরাতন বাণীই আমাদের ভরসা ও সম্বল। আজ নূতন করে স্পষ্ট করে কথাগুলি আমাদের স্মরণ করা দরকার।

প্রথম ও প্রধান কথা হোল, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। ইংরেজীর মাধ্যমে নয়। ইংরেজীর মাধ্যমে এই জন্য নয় যে তাতে শিক্ষার্থীর সময় ও শক্তির অপচয় হবে। তাই বলে ইংরেজী ভাষা বর্জন কখনই নয়। কাশীতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এ বিষয়ে তিনি অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা হিন্দীর মাধ্যমে নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমেই হবে, গুজরাট বিদ্যাপীঠে গুজরাটি ভাষার মাধ্যমের কথাই বলেছিলেন। ভাষার সহজগ্রাহ্যতার কথা ছেড়ে দিয়েও মাতৃভাষার প্রতি প্রেম এবং আত্মসম্মান-বোধের কথাও এর মধ্যে আছে। প্রসিদ্ধ বুয়র জেনারেল বোথার কথা তিনি উল্লেখ করতেন। বোথা ইংরেজী ভালই জানতেন। অথচ ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন ডাচ ভাষায় কথা বলেন, দোভাষীর সাহায্যে আলাপ হয়। ইংলণ্ডেশ্বর তাতে ক্ষুব্ধ হন নাই, বরং জেনারেলের মাতৃভাষার প্রতি প্রেম দেখে খুশি হন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার মান নেমে যাবে, মনে করার কোনও কারণ নাই, বরং বাড়বে, প্রকৃত শিক্ষার প্রসার গভীরতর হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই নূতন শিক্ষা হবে কাজের মধ্য দিয়ে, পুঁথি পড়ে শুধুটা নয়। শিক্ষাতো শুধু মাথার কাজ নয়। মাথার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়দেরও কাজ করা চাই, তাই এই শিক্ষা হাতের কোনও কাজের মাধ্যমে হওয়া চাই। সে কাজ কি রকম হবে? উৎপাদনের কাজ, সমাজের প্রয়োজনে লাগে এমন কিছু তৈরি করতে হবে, যা লোকে আগ্রহ করে নেবে, বাজারে যা বিক্রী হবে। মানুষের নিত্যকার অভাব—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, গৃহ চাই। গান্ধীজী বস্ত্র উৎপাদনের কাজই শিক্ষার মাধ্যম বলে গ্রহণ করলেন। কৃষিকাজ, সবজির চাষ, ছুতোরের কাজ—এসবও বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। বস্ত্র উৎপাদনের দুই ভাগ—সুতো কাটা ও কাপড় বোনা; দুইটির মধ্যে যে কোনও একটি প্রধান হাতের কাজ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে দুরকার মধ্যে সুতো কাটার মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার উপযোগিতা বা সম্ভাবনা অনেক বেশি। তুলো কি করে হয়, কোথা থেকে আসে, আমাদের দেশে কোথায় কোথায় হয়, কোন বস্তুতে উৎপাদন কম বেশি হয়, ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান গণিত এর মাধ্যমে সবই শিক্ষা দেওয়া যায়। বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে যে প্রাচীর নাই পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, সে কথাও শিক্ষার্থী ক্রমে বুঝতে পারবে। মনের সঙ্গে হাত চলবে, দেহের শ্রমও কিছু হবে, শিক্ষার দিক দিয়ে এগুলি সবই যে কাম্য। সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বইয়ের বোঝা

নয়, কেতাবি বুলি আওড়ান নয়। এরূপ শিক্ষা পেলে তবেই না মানুষ মেহনত করে খাবো, শরীর শ্রম করা স্বাভাবিক বলে মনে করবে। তখন একজন মানুষ দশজনকে খাটিয়ে নিজে পায়ের ওপর পা রেখে বসে খেতে পারবে না। শোষণহীন সমাজ, বিকেন্দ্রিত সমাজ, হবে সম্ভব।

তৃতীয় কথা, শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়া চাই—সমস্ত খরচের কথা নয়, কিছুটা তো বটে। শিক্ষার্থী নেবে সব, দেবে না কিছু—এমন হওয়া উচিত নয়। দিতেও তাকে হবে। সেই দেওয়ার শিক্ষা তাকে প্রথম থেকেই পেতে হবে। কিন্তু কতটা সে দেবে? অবশ্যই তার সাধ্যমত। ব্যয় নির্বাহের কথা নিয়ে, বুনিয়াদি শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে পারে কি না, সেই কথা নিয়ে অনেক বিচার বিতর্ক আলোচনা হয়েছে। পরীক্ষাও হয়েছে, বাংলা-দেশের বিদ্যালয়েও। দেখা গেছে, তাঁর কল্পনা বিলাসই আকাশকুসুম ছিল না। বুনিয়াদি সুতো কাটা কাপড়-বোনা—নীচের দিকে সুতো কাটা, ওপরের শ্রেণীতে কাপড় বোনা, মাসে কুড়ি দিন গড়পড়তায় কাজ ধরলে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের হাতের কাজের থেকে যা উপার্জন হবে তাতে শিক্ষকের বেতনটা এসে যাবে।

চতুর্থ কথা, এশিক্ষা সকলের জন্য হওয়া চাই—বিনা বেতনে হওয়া চাই এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে হওয়া চাই। যেমন গ্রামাঞ্চল তেমনি শিল্পপ্রধান অঞ্চল, যেমন গ্রাম তেমনি শহর সর্বত্র এর প্রবর্তন হওয়া চাই। এশিক্ষার কাল হবে সাত বছর। আর সাত বছর ধরে পাঠ্যসূচীর এই ক্রম ধরে চলা, তাও কঠিন বলে বোধ করছি, কিন্তু মনে রাখা চাই যে গান্ধীজী নব শিক্ষা বা নয়ী তালিমের কথায় সেবাগ্রামে ১৯৪৫ সালে বলেছিলেন, সাত বছর নয়, সারা জীবন হোল এই নবশিক্ষার ব্যাপ্তি। আমরা যদি প্রাথমিক সাত বছরের মধ্যে আমার দুইভাগ করি, এবং শিক্ষার্থী এতদিন যে ভিত্তিতে চার বছর শিক্ষা পেয়েছে সেই ভিত্তি উল্টে দিয়ে পরের তিন বৎসর অন্য ভিত্তিতে শিক্ষা দিই, তা হলে তো বুনিয়াদি শিক্ষার ঠিক ঠিক পরীক্ষা হবে না। আমরা সে পরীক্ষায় ফোল আনা সুফলও আশা করতে পারবো না। শিক্ষা সার্বজনীন ও আবশ্যিক হবে এবং বিনা বেতনে হবে—একথা আমরা মুখে মানছি বটে, কিন্তু মনে মানছি কি না জানি না। অন্তত তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কিছু করতে পারি নাই।

অন্য ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি, গান্ধীজীর পরামর্শমতে আমরা চলছি না বা চলতে চাইছি না। আমাদের মনের সংস্কার, নৈতিক অভ্যাস, আমাদের বর্তমান পরিবেশ আমাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়েছে। কিন্তু তবু আশা রাখবো। সংস্কার তো আমাদের দূর করতেই হবে, নইলে এ বাণী আমরা গ্রহণ করবো কি করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া, হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া, হাতের কাজ ও সামাজিক পরিবেশও প্রয়োজন বোধে দেওয়া, তার জন্য শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, সমস্তই চাই। যদি পরীক্ষা করে বিচার বিতর্ক আলোচনা করা যায়, তবে হয়তো আমরা আলো দেখতে পাব, এখন যে পথে শুধু অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি অনবরত অভিযোগ করে ব্যর্থতার কুজ্ঝটিকা আমাদের দৃষ্টিকে ঢেকে রেখেছে। সার্বজনীন শিক্ষা, অবৈতনিক শিক্ষা, সংঘত হতে শিক্ষা, সমাজের জন্য বিবেচনা—এসব কথা শুনতে ভাল, কিন্তু যদি বাস্তবের ভিত্তিতে আসতে হয়, যদি আজকে বাঁচতে হয়, সমাজকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করতে হয়, শিক্ষাকে করতে হয় মঙ্গলপ্রসূ, তবে গান্ধীজীর শিক্ষাসংস্কারের পথে চলতেই হবে। তাঁর জন্মদিনে এই সংস্কারের দিকটাও আমরা যেন না ভুলি—কারণ জাতিগঠনের দিক দিয়ে এর গুরুত্বই সব চেয়ে বেশি। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার

করতে হবে যে, রাজনীতি, সমাজসেবা ও শিক্ষা, তিনটি পৃথক পৃথক বিষয় নয়, গান্ধীজীর শিক্ষানীতির মধ্যে রাজনীতির দৃঢ়তা ও সমাজসেবার প্রেম এসে একত্র মিশেছে, তাই তাঁর মুক্তির আহ্বানের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ও আতুরের সেবা হরিজনসেবা সেদিন জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, সেবা ও রাজনীতিতে সত্যনিষ্ঠা তাঁর শিক্ষার আদর্শকেও অনুরঞ্জিত করেছিল।*

* এম ইণ্ডিয়া রেডিও মারফতে দেয়া অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে প্রচারিত ও সম্প্রতিক্রমে প্রকাশিত।

পরীক্ষার পরীক্ষা

শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল

জজ সাহেব আসামীর ফাঁসীর হুকুম দিলেন। কিন্তু সে আপীল করিয়া খালাস হইয়া গেল। দুইটির মধ্যে একটি বিচারে ভুল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই ভুলের জন্য বিচারককে দায়ী করা হয় না। কিন্তু আপীল না করিলে আসামীর ফাঁসী হইত।

আসন্নমৃত্যু রোগীকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অনেক পূর্বে) ঐ রোগীর চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদের বলিলেন, "ভুল করিয়া রোগীটিকে মারিয়া ফেলিলে? তোমরা মেয়াদী জ্বর বলিয়া চিকিৎসা করিয়াছ। কিন্তু রোগ মেয়াদী জ্বর নহে, টাইফয়েড। এ রোগীকে আর বাঁচান সম্ভব নহে।" এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। রোগী বাঁচে নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর জন্য ডাক্তারদিগকে দায়ী করা হয় নাই। তাঁহাদের দুর্নাম হইয়া থাকিতে পারে।

ফুটবলের মাঠে রেফারীর ভুল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রেফারীর নির্ভুল সিদ্ধান্তকেও দর্শকগণ ভুল করিয়া ভুল বলিয়া মনে করে। বলবত্তাবে রেফারীকে আক্রমণ করাও হয়। এখানে মানুষের সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও রেফারীর ভুল জজ সাহেব বা ডাক্তার বাবুদের ভুলের মত মারাত্মক নহে।

মানুষ নানা অসামঞ্জস্যের সমষ্টি।

ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না। নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টার মধ্যেও ব্যক্তিকেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে দেখা যায়। জ্ঞানমার্গে অহঙ্কার নাশের চেষ্টার মধ্যেও অহঙ্কারেরই খেলা।

আমাদের সকল কার্যেই ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। দুই শ্রেণীতে দুইজন সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক একই বিষয় পড়াইলেন। কিন্তু পড়ান এবং তাহার ফল একরকম হইল না। একই শিক্ষক এক শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে এক সঙ্গে বসাইয়া একই বিষয় পড়াইলেন। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্র ঐ পাঠকে স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত করিয়া গ্রহণ করিল। কেহ কেহ হয়ত উহা হইতে এমন কিছু শিখিল যাহা শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃত কমলাকান্তের দপ্তরের "মাতৃবৎ পরদারেষু—" শ্লোকের ব্যাখ্যা স্মরণ করা যাইতে পারে। উহা কাল্পনিক হইলেও বাস্তবের সহিত সম্বন্ধবর্জিত নহে।

একব্যক্তি তাঁহার সযত্নরচিত অতিপ্রিয় ফুলের বাগান দেখাইবার জন্য তাঁহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া

আসিয়াছিলেন। বন্ধু বাগান দেখার পর ফুল বা ফুলগাছের প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বেড়ার কাঁটা তারগুলি কি দরে কিসিলে?"

আমরা সকলেই—জজ সাহেব, আসামী, ডাক্তার, রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজন, রেকারী, দর্শক, ফুল বাগানের মালিক ও তাঁহার বন্ধু—সকলেই স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত। স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটাইয়া ওঠা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হইলেও প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষককে নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে —ইহাই পরীক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের মূল কথা। জজ সাহেবের রায়ে, ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ে, রেকারীর বাঁশীতে ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকে থাকুক। তাহা আমরা সহ্য করিব। কিন্তু পরীক্ষকের নম্বর দেওয়ায় ব্যক্তিত্বের নামগন্ধও থাকিতে পাইবে না। একখানি উত্তরপত্র যত জন ইচ্ছা পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হউক না কেন, নম্বরের পরিমাপ সমান হওয়া চাই। এইরূপ দাবী অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে।

যাঁহারা দীর্ঘকাল পরীক্ষার খাতা দেখার কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা "পরীক্ষার পরীক্ষা" নামক ইংরাজি পুস্তকে পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়া সম্বন্ধে যে বিপুল ব্যবধানের কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহার অধিকাংশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। বিভিন্ন পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত একই উত্তরপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও সুস্থ মস্তিষ্কে খাতা দেখিয়া একজন দিলেন ৩০ এবং অন্য এক জন দিলেন ৬০ বা ৭০—এরূপ হয় বলিয়া মানিয়া লওয়া শক্ত। এরূপ ঘটিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে শুধু ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন বস্তু পরীক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দীর্ঘকাল প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু ঐ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহাকে ভোজনের শেষে তাম্বূলের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জন নাই। সেইজন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রবর্তন করিয়াও রচনামূলক পরীক্ষা বাদ দিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বর্তমানে দেওয়া হইতেছে না।

রচনামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধ সমালোচনা নানা পত্রিকায় দেখা যায়। কিন্তু সমালোচকগণ বলিয়া যান যে মানুষ এখনও ইহা অপেক্ষা উন্নততর এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। যতদিন ঐরূপ কিছু উদ্ভাবিত না হইবে ততদিন আমাদিগকে এই ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষাপদ্ধতি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা রচনামূলক পরীক্ষার বিকল্প ত নহেই, বরঞ্চ ইহা অপেক্ষা অধিক ত্রুটিযুক্ত।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ঠিক উত্তরটির সঙ্গে কয়েকটি ভুল উত্তর মিশাইয়া দিয়া পরীক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করা হয়। ইহা সমীচীন নহে। আবার ভুল উত্তরগুলির সঙ্গে ঠিক উত্তরটিও থাকায় পরীক্ষার্থীর স্মরণশক্তিকে অন্যায়ভাবে কিছু সাহায্য করাও হয়। ছেলে কি শিখিয়াছে তাহা জানার জন্যই পরীক্ষা করা হয়। সে কি কি ভুল শিখিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। এই পরীক্ষায় যেরূপ দণ্ডও দেওয়া হয়, যদিও প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিদেরও অনেক ভুল ধারণা থাকে। এইরূপ দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় রচনামূলক পরীক্ষায় যে পরীক্ষার্থী ৮০ নম্বরের মধ্যে ৩৫ নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছে সে হয়ত ঐ বিষয়েই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ২০ নম্বরের মধ্যে ১০ পাইয়া

(মোটের উপর ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ পাইয়া) ফেল হইয়া যায়। আবার রচনামূলক পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের মধ্যে ১৫ নম্বর এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ২০ নম্বরের মধ্যে ১৬।১৭ নম্বর পাইয়া পাশও করে। উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর তথাকথিত বিকৃতি বিচার হয় না। প্রশ্নরচনার ত্রুটিও ইহার জন্য দায়ী হইতে পারে। কিন্তু ত্রুটিমুক্ত প্রশ্নরচনায় যোগ্যতাসম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নকর্তা আমাদের মধ্যে খুব বেশী নাই।

পূর্বে যখন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হইত তখন একজন পরীক্ষক তাঁহার প্রথম-ত্যাগ-করা শিশু পুত্রকে একখানি বাংলা প্রশ্নপত্র দিয়া বলিলেন, "এই কথাগুলির মধ্যে যে কোনটির নীচে দাগ দাও।" শিশু নিজের ইচ্ছামত অবিচারে দাগ দিল। তিনবার এইরূপ করান হইল। তিন বারই শিশুটি পাশের নম্বর পাইল, যদিও প্রশ্নের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান ছিল না। পরীক্ষাকে লটারির পর্যায়ে ফেলিলে অন্যায় হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রশ্নপত্র রচনার শ্রম ও মুদ্রণের ব্যয় দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রশ্নকর্তা নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত থাকিয়াই প্রশ্নপত্র রচনা করেন। তাহার ফলেও পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। রামবাবু রচিত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার যে ফল হয়, শ্যামবাবু ঐ বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করিলে ফল ঠিক সেইরূপ হইবে না। কোন ফলটি ঠিক কে বলিবে? এই পরীক্ষাপদ্ধতি কোনদিন এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে যে কেবলমাত্র ইহারই সাহায্যে সকল পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে—এরূপ আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব এই অবান্তর বিলাসকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানোই ভাল।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিন্তা করা উচিত, পরীক্ষা জিনিষটাকেই একেবারে বাদ দেওয়া যায় কি না। এরূপ করিতে পারিলে পাশ করার উৎকট আগ্রহ ও তদানুষঙ্গিক নানা অপচেষ্টার স্থলে ছাত্রদের মনে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ জাগরিত হইতে পারে।

এখন প্রায় সকল চাকুরিতেই লোক নিয়োগের পূর্বে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমাণপত্র এই সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া স্কুল ও কলেজ হইতে শতকরা অন্যূন পঁচাত্তরটি ক্লাসে উপস্থিত থাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং এই সকল সার্টিফিকেট এই সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করার যোগ্যতার প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, তাহাতে দোষ কি? যে সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত থাকিয়াও পড়াশুনা করিবে না তাহারা আপনিই প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে। এই অকৃতকার্যতার ভয়ে ছাত্রেরা হয় তো পড়াশুনাও করিবে এবং কিছু শিখিবেও। গার্ডকে প্রহার, চেয়ার টেবিল ভাঙা, প্রশ্নপত্র বিক্রয়, ঠোঙা তৈয়ারি প্রভৃতি লজ্জাকর গ্লানি বন্ধ হইবে।

স্কুলের সার্টিফিকেট বলে কলেজে ভর্তি করার সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করিয়া ভর্তি করিবেন। এই পরীক্ষা চাকুরিতে নিয়োগের সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মত হইবে। যাহারা বি. এ, এম্. এ প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতে চাহিবে তাহাদিগকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে এবং এই পরীক্ষায় এখনকার মত পাশের হার বাড়াইবার জন্য নানা বৈধ ও অবৈধ সুবিধা দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি ছাড়া কেহ উপাধিধারী হইতে পারিবে না।

ইংরেজ সরকার সর্বপ্রথম যে সাতজন বিশিষ্ট অধ্যাপককে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ ৺রাখালদাস

ন্যায়রত্ন ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে স্বর্গলোকবাসী হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণকে সরকারী পরীক্ষা না দেওয়ার শর্তে চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করিতেন। "তীর্থ উপাধির আকাঙ্ক্ষা থাকে ত অন্যত্র পড়গে। আমি পরীক্ষা পাশ করানোর জন্য পড়াই না। প্রকৃত পণ্ডিত সৃষ্টি করার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও এত কষ্ট করিয়া পড়াই। আমার বিচারে তুমি উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইলে আমিই উপাধি দিব।" এই ছিল তাঁহার কথা। তাঁহার ছাত্রেরা সকলেই তীর্থ উপাধি না থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন সমাজে বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। ৺শঙ্কর তর্করত্ন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ৺হরিহর শাস্ত্রী তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র। তিনিও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রবাসী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকায় ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে "আন্বীক্ষিকী" প্রভৃতি অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

তীর্থ পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশের সকল চতুষ্পাঠীতেই এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তাহাতে পঠন-পাঠনের কোন বিঘ্ন হয় নাই।

নয়ী তালিম কোন্ পথে ?

অধ্যাপক রামমূর্তি

ছয় মাস পূর্বের কথা। তখন আমি পাটনাতে ছিলাম। রাত দশটা, শুইতে যাইব এমন সময় জয়প্রকাশ বাবু খবর পাঠাইলেন, তখনই যেন গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। এত রাত্রে কি প্রয়োজন ভাবিতে ভাবিতে গিয়া পৌঁছিলাম। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর জয়প্রকাশ বাবু বলিলেন, "জান, আমার মনে বহুদিন হইতে একটা ইচ্ছা আছে—কখনও পূর্ণ হইবে কি না জানি না।" তাঁহার ব্যাকুলতা বাণী শুনিয়া একরকম স্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। কিছু পরে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনার সে ইচ্ছাটি কি?" তিনি শান্তভাবে বলিলেন—"এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা কি সম্ভব নয়, যাহার দরজায় লেখা থাকিবে, এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিবার শিক্ষা দেওয়া যাইবে না?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, একথা কখনও কল্পনাও করি নাই। আমি জানিতামই না যে ধূলিধূসরিত কলিকাতার পথে চলিতে চলিতে জয়প্রকাশ বাবুর মনের মধ্যে নয়ী তালিমের এই চিত্র প্রবেশ করিয়াছে। আমি সবিনয়ে জানাইলাম। "আপনি নয়ী তালিমের পূর্ণ বিকশিত রূপের কথা বলিতেছেন। আমি জানি, আপনি খুব বড় বড় বিদ্যালয়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের দেশে এরূপ শিক্ষার জন্য ছাত্রই বা কোথায় পাইবেন, শিক্ষকই বা কোথায় পাইবেন? প্রকৃত অবস্থা তো এই যে আজ দেশে স্বাবলম্বী শিক্ষার জন্য ছাত্রও প্রস্তুত নাই, শিক্ষকও প্রস্তুত নাই, সমাজও প্রস্তুত নয়।" "ভাবিয়া দেখা যাক" বলিয়া তিনি আলোচনা শেষ করিলেন।

নয়ী তালিম ও বুনিয়াদি শিক্ষা

সেই দিন হইতে জয়প্রকাশ বাবুর কথা বরাবর আমার মনে জাগিতেছিল, নয়ী তালিমের কর্মী আমি। বিশ বৎসরের বেশি হইল আমরা নয়ী তালিমের নাম শুনিয়া আসিতেছি। দেশের

অনেকানেক স্থানে নঈ তালিমের নামে প্রতিষ্ঠানও চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজও দেশের কোনও কোণেও নঈ তালিমের দান দেখা যায় না। কি করিয়া জয়প্রকাশ বাবুকে বলি, বাপুজীর কল্পনার নঈ তালিম আর প্রতিষ্ঠানের নঈ তালিম এক জিনিস নয়! প্রতিষ্ঠানের আবেষ্টনীতে বুনিয়াদী শিক্ষা চলিতে পারে, নঈ তালিম চলে না। লোকেরা যেখানে সামুদায়িক জীবন গ্রহণ করিয়াছে তাহা রক্ষণ পোষণ ও শিক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেখানেই নঈ তালিমের সার্থকতা। গান্ধীজী যখন একথা বলিয়াছিলেন যে নঈ তালিমের বিস্তার মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, তখন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহার কথা বলেন নাই। গ্রামই নঈ তালিমের পাঠগৃহ। ছোট বড়, স্ত্রী-পুরুষ, গ্রামের প্রত্যেকটি অধিবাসী নঈ তালিমের ছাত্র। প্রত্যেকের নিজের নিজের অভ্যাস আছে, তথাপি সবটা মিলাইয়া স্বাবলম্বী সহযোগিতার জীবন ও শিক্ষণ। বিচারের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর নঈ তালিমের স্বরূপ এই যুগেই লেখা গিয়াছিল, কিন্তু কার্যক্রমের দৃষ্টিতে এই বিচার বুনিয়াদি শিক্ষা পর্যন্তই যাইতে পারিয়াছিল। এই কারণেই আজ পর্যন্ত আমরা বুনিয়াদি শিক্ষা ও নঈ তালিম এক বলিয়া জানিতেছিলাম। আর মূলগত ঐ বিচারদৃষ্টির ভুলে জীবনপথে নানা প্রকারের সমস্যা দাঁড় করাইতেছিলাম। বুনিয়াদি শিক্ষা বা 'বেসিক এডুকেশনের' কল্পনা প্রচলিত ম্যাট্রিকুলেশনের বিকল্প বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল; এইভাবেই বাপুজী বুনিয়াদি শিক্ষাকে দেশের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা নঈ তালিমের সন্ধানে গিয়া ভুল বুঝিয়া বুনিয়াদি শিক্ষাকেই লোকের সম্মুখে ঠেলিয়া আনিতেছিলাম।

গ্রাম-স্বরাজ ও নঈ তালিম

সমাজ গঠনের যে চিত্র গান্ধীজীর সম্মুখে ছিল, তাহার সঙ্গে নঈ তালিমেরই সঙ্গতি আছে, বুনিয়াদি শিক্ষার নয়। ১৯৪১ সালে বিনোবাজী যখন ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন আরম্ভ করেন, আর দাবি করেন যে ঐ আন্দোলন বাপুজীর স্বরাজেরই পরিপন্থ রূপ, তখন অনেকের মনে চিন্তা হইয়াছিল। বিনোবাজী মালিকানা বিসর্জনই প্রকৃত স্বরাজের প্রথম শর্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন যে গ্রাম-স্বরাজই প্রকৃত স্বরাজ, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিলেন, "আমি সামাজিক বিপ্লবের দিকে যাহা কিছু করিতেছি তাহা নঈ তালিমেরই কাজ।" সত্য কথা, নঈ তালিম নূতন সমাজেরই কাজ; পুরাতন সমাজে যে তালিম চলিবে, তাহা পুরাতনই হইবে, তা তাহার অভ্যাসক্রম যাহাই হউক না কেন। এইরূপে বিনোবাজীর আন্দোলন নঈ তালিমের রূপ স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছে। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যদি নঈ তালিম চালাইতে হয়, তবে নূতন সমাজ গঠনের কাজ প্রথমে করিতে হইবে। কারণ নঈ তালিমের দুই মূল তত্ত্ব হইল স্বাবলম্বন ও সহজীবন। প্রচলিত সমাজে তাহাদের কোনও স্থান নাই। এইরূপে নঈ তালিমের সহজ অন্বয় সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে। যে উৎপাদন ও সামাজিক ব্যবস্থারূপ নঈ তালিমের মাধ্যম, তাহার সত্যরূপ সমাজে পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠানে নয়। সমাজ গতিশীল, আর গতিশীলতাই নঈ তালিমের প্রাণ, তাই বিনোবাজী নঈ তালিমের নাম দিয়াছেন, সিত্য নঈ তালিম।

এ পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা যে শিক্ষা দিয়া থাকি, তাহা বাস্তব রূপে বুনিয়াদি শিক্ষা, নঈ তালিমের প্রক্রিয়ার সন্ধান এখনও বাকি। নঈ তালিমের ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করে তাহাদের মধ্যে বীরেন ভাইয়ের খুবই স্নেহ আছে। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি কি করিতেছেন,' তবে তিনি উত্তর দেন, 'নঈ তালিমের প্রক্রিয়া সন্ধান করিতেছি।' তাঁহার এই উত্তর শুনিবার পর

বুঝিতে পারি না, নয়ী তালিমের এ কোন্ প্রক্রিয়া যাহা এত বৎসর পরেও এতখানি অজ্ঞাত! তিনি এখন বিহারে পূর্ণিয়া জেলার এক গ্রামে বাস করিতেছেন, এবং অনাশ্রিত ভাব লইয়া কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপই অবস্থা। নয়ী তালিমে কর্ম ও জ্ঞানের কি সম্পর্ক তাহার কিছু অনুভব তো হইয়াও গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তালিম ও বিপ্লবের কি সম্পর্ক তাহার কল্পনা ও প্রয়োগ বিনোবাজীর আন্দোলনের মত বৎসর পরেও তেমন ভাল করিয়া স্পষ্ট হয় নাই। এখন তাহা হইবার সময় আসিয়াছে। আমরা হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলি। অহিংসার হৃদয়-পরিবর্তন হইল শ্রেণী-সংঘর্ষের বিকল্প। হৃদয়ের পরিবর্তনের মূলতত্ত্ব চিন্তার পরিবর্তন, আর চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে তালিমের সম্বন্ধ। এই তত্ত্ব শ্রেণী সংঘর্ষের বিকল্প খুঁজিয়া বাহির করা, আর জনসাধারণকে সমন্বয়ের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, নয়ী তালিমের প্রথম কর্তব্য।

শিক্ষাই বিপ্লবের মাধ্যম

এ যুগের বিপ্লব হইল জীবনমূল্য লইয়া। এখন আর সে যুগ নাই, যখন সংঘর্ষকেই বিপ্লবের সাধন বলিয়া স্বীকার করা হইত, সংঘর্ষে জয়লাভ করিলেই বিপ্লব সফল হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিত। সংঘর্ষের সেই গুরু ছিলেন মার্কস্। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে বিপ্লবের জন্য চাপই pressure যথেষ্ট। বিনোবা বলিতেছেন, সমাজ তাহার বিকাশের পথে আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে চাপও নয়, অনুকরণ (persuasion) হইতেই কাজ হইবে। ইহারও পূর্বে একথা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল যে অহিংস বিপ্লবের প্রকৃত মাধ্যম হইল শিক্ষা। কিন্তু সে তালিম এমন হইবে যে সমাজে সমবায় বা সহযোগিতা শক্তির দ্বারা হৃদয় পোষণ ও বিকাশের ত্রিবিধ শক্তি এক সঙ্গে সৃষ্টি করিতে পারে। এই অর্থে বিনোবা বলেন যে, স্বামিত্ব বিসর্জন দ্বারাই নয়ী তালিম প্রকৃত অর্থে সক্রিয় হয়; এই অর্থেই বীরেন-ভাই তাঁহার বিতের কথায় বলেন—"আমি বিপ্লবী, তাই শিক্ষক; আমার পক্ষে বিপ্লব ও শিক্ষা একই।" স্পষ্টই দেখা গেল, এই নয়ী তালিমের প্রক্রিয়ার সন্ধান প্রতিষ্ঠানে হইতে পারে না, উহা সমাজেই হইতে পারে। প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম, তাহার বিপ্লবও হইবে কৃত্রিম। তালিমকে সেই স্থানে যাইতে হইবে যেখানে দোষগুণ লইয়া জীবন বাস্তব। অহিংস সমাজের গঠন আজকাল এ দেশে গ্রাম-স্বরাজের রূপে দেখা দিতেছে। সংঘোধনের বাণী হইল গ্রাম-স্বরাজ। নয়ী তালিম গ্রাম-স্বরাজের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিপ্লবের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রতিষ্ঠানের জীবন স্বাবলম্বন ও সহাবস্থানের অনুকূল নয়; কারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ছাত্র ও শিক্ষক, উহার স্বাভাবিক অধিবাসী নয়, নির্দিষ্টকালের জন্য সেখানে সমবেত, তাহাদের গৃহ অন্যত্র, দেশও অন্যত্র।

গ্রামবাসী গ্রামে নয়ী তালিমের প্রয়োগ

আজ নয়ী তালিমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সেই গ্রামে, যেখানে বিনোবাজীর আন্দোলনের প্রভাবে জমির সমবণ্টন বন্ধ হয়নি নাই। এইরূপ স্বাবলম্বী বা গ্রামসংকল্পী গ্রাম স্বাবলম্বন ও সহাবস্থানের দিকে বিপ্লবকারী পদে যে অগ্রগতি পাইয়াছে, তাহা পূর্ণ করা, দৃঢ় করা ও তাহার প্রসার সাধন করা হইল নয়ী তালিমের কাজ। ধন ও সম্পত্তির প্রচলিত মূল্যের উপরে উঠিয়া জনসাধারণকে নূতন মানবীয় মূল্যের চিত্র দেখাইতে পারে এক নয়ী তালিমই, এবং নয়ী তালিমই প্রয়োজন হইলে অহিংস প্রতিকারের সত্য পথও দেখাইতে পারে। যখন সমস্ত গ্রাম বিদ্যালয় হইয়া যায়, তখন গ্রামের প্রতিটি সমস্যা তালিমের বিষয় ও সমস্ত কাজ তালিমের কাজ হয়। নয়ী তালিমের এই বিরাট্ দৈনন্দিন, সমাজব্যাপী স্বরূপ

এখন সেই [illegible] দরকার। তাহা না হইলে আমরা মুখে বলিব নয়ী তালিমের কথা, কাজে করিব বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ।

তালিমের সমস্যা লইয়া আমাদের অনেক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার একটি কারণ হইল এই যে, আমরা নয়ী তালিমের কথা প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকার সহিত মিলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। স্বরাজের বিপ্লব ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব, সে বিপ্লবের ঘাঁহ রচনায় গান্ধীজী গঠনকর্ম ও জীবনের নূতন মূল্যের দ্বারা উৎপাদনের বিপ্লবতত্ত্ব রাখিয়াছিলেন, বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে তাহা অনুরিত হইতেছে। এ অবস্থায় উৎপাদন-কেন্দ্রিক নয়ী তালিমকে উৎপাদকের মধ্যে থাকিতে হইবে, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থাকিলে চলিবে না—প্রতিষ্ঠান উৎপাদকের বিপ্লবকেন্দ্র হইতে পারে না, উৎপাদনের শিক্ষার ক্ষেত্রও হইতে পারে না। গ্রাম-স্বরাজ আন্দোলন হইতে পৃথক থাকিয়া কোনও শিক্ষা শুধু থাকির নাম লইয়া এদেশে যশ অর্জন করিতে পারে না, যতক্ষণ না জনসাধারণ তাহা সমর্থন বা তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করে। আবার তো সরকারের ওপরেই জীবন ধারণ করিতে হইবে! এই কারণেই আজ আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের বুনিয়াদি ও উত্তর-বুনিয়াদি শিক্ষালয়ের স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য সরকারের সম্মুখে ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোনও বিপ্লবের কি সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়? সরকার কি নয়ী তালিমের জীবনমূল্য স্বীকার করেন? নয়ী তালিমের লক্ষ্য, শাসন হইতে মুক্তি। যতক্ষণ সরকার বল ও সম্পত্তির আধারে প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণ উভয়ের মিল কোথায়? আমরা বলিয়া থাকি, সরকারের স্বীকৃতির অভাবে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা চাকুরি পায় না, বা উচ্চতর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই আমরা সরকারের স্বীকৃতি চাই। অথচ এই যে আমাদের জন্য কোনও বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত? খুব বেশী হইলে দুই হাজার। যদি আমরা দেখি যে জনসাধারণ এখনও নয়ী তালিমের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে নাই তাহা হইলে বিপ্লবের ভূমিকায় ইহাই সত্য নির্ধারিত হইবে যে আমরা নিজেদের বিক্ষিপ্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দিই আর নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি গ্রাম-স্বরাজ আন্দোলনে লাগাই, আর সরকার যেমন যেমন চাহিবেন পরামর্শ দিয়া সন্তুষ্ট থাকি। এ কথা স্বীকার্য যে প্রকৃত বিপ্লব বলিয়া তালিমের বিশিষ্ট রূপে কাজ করিবার জন্য আমাদের আরও কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। নির্দিষ্ট কার্যক্রম চালাইবার পূর্বে নয়ী তালিমের মূল্য ও তত্ত্ব-বিষয়ে জনসাধারণের শিক্ষণ ও তাহাদের সম্মতি শুধু আবশ্যক নয়, অনিবার্য। সর্বোদয়ের বিপ্লব লোকসম্মতির বিপ্লব, সরকারি স্বীকৃতির নয়। আমরা লোকশক্তির আরাধনা করিবার জন্য বাহির হইয়াছি, সরকারের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য নয়। লোকমত অনুকূলে পাইলে সরকারের স্বীকৃতি হয় অনাবশ্যক হইবে, না হইলে আপনা আপনি পাওয়া যাইবে। গ্রাম-স্বরাজ ও নয়ী তালিম আন্দোলনের সফলতার প্রমাণ হইবে যখন লোকশক্তি সরকারকে তালিমের ক্ষেত্র হইতে তাহার অংকুশ ও নিয়ন্ত্রণ হটাইয়া লইতে বাধ্য করিবে, আর নয়ী তালিমকে বিকল্প শাসনমুক্ত প্রণালীতে বিকশিত হইতে সাহায্য করিবে। আমাদের এই মৌলিক স্বীকৃতি যে, সরকার হইতে মুক্ত হইয়াই শিক্ষা মানুষ গড়িবার শক্তি অর্জন করিতে পারে। এ অবস্থায় যদি আমাদের আজ বুনিয়াদি বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহা হাসিতে হাসিতে বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত। বিসর্জন হইতেই নূতন সৃষ্টি হইবে।

জয়প্রকাশ বাবুর ইচ্ছার মধ্যে সে রাত্রে বিপ্লবের ঝলক প্রকাশ পাইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দায়িত্বে

শিক্ষণ এক কথা, আর বৈপ্লবিক শিক্ষাপদ্ধতিকে সরকারি চাকুরির যাহানায় প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল বিপ্লবের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। আজ গান্ধী ভাবধারাই নিরাশ ভারতীয় জনগণের একমাত্র আশার আলো। সেই ভাবধারা আমাদের হাতে যাহাতে বিকৃত না হয়, এইটুকু তো করা উচিত।

বিপ্লবের ভূমিকায় নবী তালিম বুনিয়াদি শিক্ষালয় হইতে আরম্ভ না করিয়া গ্রাম বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ হইবে, আর তালিমের শক্তিই স্বাধীন জীবনে বিপ্লবের নেতৃত্ব করিবে। সেই নয়ী তালিম বুনিয়াদি শিক্ষা হইতে অনেকটা ভিন্ন। তাহার ব্যূহ-রচনা কিরূপ হইবে, সে কথা স্বতন্ত্র।

---

* ইত্তেহাদ-পত্র, ২৮ অক্টোবর তারিখের সাপ্তাহিক সংখ্যা হইতে অনূদিত।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দেশ বিদেশের শিক্ষা। শ্রীজ্ঞানাদেবী। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড। ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

বহুকাল পূর্বে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বাঙালী পাঠকদের দেশ বিদেশের নানা পরিচয় দিতেন। বঙ্গীয় পাঠকদের তাঁহার লেখা হইতে শিক্ষা করিবার অনেক কিছু থাকিত। তাঁহার বিবরণ যেমনই তথ্যপূর্ণ ছিল, রচনাও ছিল তেমনই প্রাঞ্জল।

আমাদের দেশের শিক্ষার দোষগুণ, তাহার ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে অন্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ তাহা জানিতে অবশ্যই আমাদের মন চায়। 'জ্ঞানাদেবী' অন্য জ্ঞানান্বেষীদের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "কৌতূহলী শিক্ষিতদের বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা জানিতে আগ্রহ আছে বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাংলাভাষায় ইহার জন্য কোন বই নাই।" এই কারণই যথেষ্ট। দ্বিতীয় কারণটি গৌণ—তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ষোলটি অধ্যায়ে লেখক ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বিবরণী বিস্তৃত, এবং লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত। আজকাল আমেরিকার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নানাকারণে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রচনা-রীতি সরল ও প্রাঞ্জল।

পুস্তকখানি আমাদের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য জ্ঞানান্বেষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করি।

পুস্তকের কোথাও কিন্তু কালের কোনও ইঙ্গিত পাইলাম না; না মুখবন্ধে, না ভূমিকায়, না অন্য কোথাও। কত সালে মুদ্রিত, বা রচিত, বা প্রকাশিত, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবত জ্ঞানান্বেষী, ইতিহাস অপেক্ষা দেশকালাতীত জ্ঞানের সন্ধানী। কিন্তু তাহাও তো সম্ভব নয়, তিনি যে দেশবিদেশের, মুখ্যত আধুনিক কালের, শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন!

যদি আজকার শিশুর মনে কল্যাণভাবনা না জাগে তবে অন্য সব কিছু হইলেও দেশ অগ্রসর হইবে না, দেশ উন্নত হইবে না। তাহার জন্য আমাদের দেশে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের জন্য আমাদের ত্যাগ করা দরকার. এইরূপ চিন্তা শিশু অবস্থায় মনে না জাগিলে অন্য সব কিছু হইলেও সমস্তই ব্যর্থ! খাওয়া লাওয়া, ফূর্ত্তি করা, উচ্চ শিক্ষা পাইয়া উচ্চ চাকুরী পাওয়া, যদি এরূপ ভাবতরঙ্গ শিশুদের মনে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে স্বরাজও চলিয়াগেল! কারণ তাহার অর্থ এই হইবে যে স্বরাজের ক্ষয় শুরু হইয়াছে। গান্ধীজীর দূরদৃষ্টি ছিল, তিনি বলিতেন যে স্বরাজের মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। এই মন্ত্র সকলের প্রেরণা জোগাইত। আজ তাহার প্রেরণা ফুরাইয়া গিয়াছে। ইহার পরে যদি দেশ অন্য কোন মন্ত্র না পায়, তাহা হইলে দেশের প্রাণ শুকাইয়া যাইবে। ধীরে ধীরে চিত্তের তীব্রতা কম হইয়া যাইবে, জীবন নীরস হইয়া পড়িবে। জীবনে মনুষ্যত্ব প্রাণতত্ত্বের মত কিছু পাইবে না। লোকে বাঁচিয়া থাকে, খায় দায়, সুখ দুঃখ ভোগ করে! দুঃখ আসিলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, আর যে দিন মৃত্যু আসিয়া ডাকে সেদিন চলিয়া যায়। এরূপ জীবন মানুষের জীবন নহে, ইহা তো সাধারণ প্রাণীর জীবন।

বিনোবা